বাংলাপিডিএফ
ফৌজিন্দিয়া দ্বীপ
আস্তানায় দস্যু বনহুর
রোমেনা আফাজ
দস্যু বনহুর
৩১-৩২
দুই খন্ড একত্রে
রনি

ফৌজিন্দিয়া দ্বীপ-৩১
আস্তানায় দস্যু বনহুর-৩২

দুই খণ্ড একত্রে

রোমেনা আফাজ

পরিবেশক

সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০।

বাদল ব্রাদার্স
৩৮/৪ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০।

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

নাসেরের দৃষ্টিদ্বয় হতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঠিকরে বের হচ্ছে। পিস্তল হস্তে যমদূতের মত এসে দাঁড়িয়েছে সে। পৈশাচিক নিষ্ঠুর মুখোভাব।

নীহার বনহুরকে আড়াল করে দ্রুত উঠে দাঁড়ালো, তীব্র কঠিন কণ্ঠে উচ্চারণ করলো—নাসের সাহেব, এতো বড় স্পর্ধা আপনার কি করে হলো?

মুখোভাব আরও কুৎসিত হয়ে উঠলো তার, দাঁত পিষে বললো—স্পর্ধা আমার, না ঐ ছোটলোকটার? সরে দাঁড়াও নীহার, এই মুহূর্তে ওকে আমি হত্যা করবো।

আমি ওকে হত্যা করতে দেবো না। দেখি আপনি কেমন করে ওকে হত্যা করেন।

ওঃ— এ তো দরদ! নীহার, একটা নাবিকের জন্য তুমি নিজকে বিপন্ন করতে চাও?

হাঁ, আমাকে হত্যা করে তারপর ওকে.....রাগে কণ্ঠরোধ হয়ে আসে নীহারের।

ব্যঙ্গপূর্ণ হাসি হাসে নাসের—ওর জন্য মরতেও রাজি আছো দেখছি। নীহার, মনে রেখো তোমাকে আমি হত্যা করবো না, কারণ তোমাকে হত্যা করলে আমার সব আশা-আকাঙ্ক্ষা মাঠে মারা যাবে। তোমাকে আমার প্রয়োজন।

বনহুর নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে, সরল-সহজভাবে দৃষ্টি শুধু স্থির হয়ে আছে নাসেরের মুখে।

নীহার তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললো—তোমার আকাঙ্ক্ষা কোনোদিনই পূর্ণ হবে না শয়তান।

শয়তান আমি না তোমার ঐ নাবিক বন্ধু?

নাসেরের কথা শেষ হতেই বনহুরের এক শটে ওর হাতের পিস্তলখানা ছিটকে পড়লো গিয়ে কেবিনের দেয়ালে, ধাক্কা খেয়ে সে পড়লো এসে মেঝেতে।

বনহুর বজ্রমুষ্ঠিতে চেপে ধরলো নাসেরের জামার কলার।

ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে উঠলো নাসেরের মুখ। মুহূর্তে এমন একটা পরাজয়ের কালিমা লেপন হবে তার মুখে, ভাবতেও পারেনি সে। প্রথমে হকচকিয়ে গেলো নাসের কিন্তু পরক্ষণেই নিজকে সামলিয়ে নিয়ে রুখে দাঁড়ালো।

নীহার তখন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

নাসের বনহুরের মাথা লক্ষ্য করে প্রচণ্ড এক ঘুষি চালালো।

সঙ্গে সঙ্গে বনহুর মাথাটা সরিয়ে নিলো, ঘুষিটা ব্যর্থ হলো তার। পরক্ষণেই বনহুরের দক্ষিণ হস্তটা গিয়ে পড়লো নাসেরের মুখে। একটা পাক খেয়ে ঘুরে পড়ে গেলো নাসের মেঝেতে।

এক চক্র দিয়ে উঠে দাঁড়ালো নাসের, পরক্ষণেই ঝাঁপিয়ে পড়লো বনহুরের উপর। বনহুর হুট করে ওর হাত ধরে মোচড় দিলো খুব জোরে।

নাসেরের মুখ কালো হয়ে উঠলো, দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে লাথি দিলো বনহুরের হাঁটুতে।

বনহুর তার আগেই ওর হাত ছেড়ে দিলো, সঙ্গে সঙ্গে দড়াম করে পড়ে গেলো নাসের।

বনহুর নাসেরের হাত থেকে ছিটকে-পড়া পিস্তলখানা আলগোছে তুলে নিলো হাতে। নাসের এবার কেঁচোর মত কুঁকড়ে গেলো যেন। কোনোরকমে উঠে দাঁড়িয়ে হাতের পিঠে নাকের মাথাটা একবার মুছে নিয়ে আড়চোখে তাকালো বনহুরের হস্তস্থিত তারই পিস্তলখানার দিকে।

নাসেরের দৃষ্টি এবার স্থির হলো বনহুরের চোখে, আজ যেন প্রথম দেখলো নাসের নাবিক আলমের নতুন রূপ।

বনহুর গম্ভীর দৃঢ়স্বরে বললো— বেরিয়ে যাও এই মুহূর্তে।

বনহুরের বজ্রকঠিন কণ্ঠস্বরে নাসেরের হৃৎপিন্ড কেঁপে উঠলো থর থর করে। আর এক দন্ড দাঁড়াবার সাহস হলো না তার। বেরিয়ে গেলো অনুগত ভৃত্যের মত পিছু হটে।

নাসের বেরিয়ে যেতেই ফিরে তাকালো বনহুর নীহারের দিকে।

রাজ্যের বিস্ময় যেন ঝরে পড়ছে ওর দু'চোখে। স্ফীত উজ্জ্বল দীপ্তময় নীহারের মুখমন্ডল। শুধু আশ্চর্যই হয়নি সে ওর শক্তির পরিচয়ে, তার প্রতি অনুরাগ আরও গভীরতম হয়ে উঠেছে।

কয়েক পা এগিয়ে আসে নীহার।

বনহুর হস্তস্থিত রিভলভারখানা বিছানার উপর ফেলে দিয়ে বসে পড়ে বিছানায়। আঙ্গুল দিয়ে নিজের এলোমেলো চুলগুলো সংযত করে নিয়ে বলে—মেমসাহেব, আপনি মাফ করবেন আমাকে। একজন নাবিক ছাড়া আমি কিছু নই। এখানে আসাটা আপনার মোটেই উচিত নয়।

আলম, তুমি আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছো?

না।

তবে অমন করে কথা বলছো কেন?

আপনি জানেন আমার ক্যাবিনে আসাটা আপনার জন্য সম্পূর্ণ অসঙ্গত। আমি অনুরোধ করছি, আপনি আমার ক্যাবিনে আর আসবেন না।

আলম!

হাঁ মেম সাহেব।

নাসেরের আগমনে তুমি আমাকে......

আমাকে মাফ করবেন মেম সাহেব, আমি অক্ষম....

নীহার নতমুখে বেরিয়ে যায় মন্থর গতিতে আলমের ক্যাবিন থেকে।

বনহুর শয্যায় বসেছিলো, উঠে পায়চারি শুরু করলো। মনটা বড় এলোমেলো লাগছে, নীহারের সঙ্গে একটু পূর্বে তার যে সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিলো, অশোভনীয় লাগছে এখন। তবে অসঙ্গত এমন কিছু নয় যা তার এবং নীহারের জীবনকে কলুষিত করেছে। নীহারকে 'তুমি' সম্বোধনটা খুশি করেছিলো যথেষ্ট এবং ওকে খুশি করবার জন্যই বলেছিলো সে। কিন্তু এতোটা নীচে নেমে আসা হয়তো তার পক্ষে সমীচীন হয়নি। নীহার এবং তার দু'জনার জন্যই অমঙ্গলজনক তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বনহুর যতই ভাবে ততই বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে.....নীহার আজকাল সব সময় তাকে ঘিরে রাখতে চায়। তার শরীরে যেন আঁচড় না লাগে। জানে বনহুর, নীহারের আশঙ্কা অহেতুক নয়। নাসের যেভাবে তার পিছু নিয়েছে তাতে নিজকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত মনে হয় না।

যত বেশি ভাবে বনহুর, নীহারের প্রতি একটা মায়াময় মনোভাব আচ্ছন্ন হয়ে আসে। দোষ কি ওর—আর তারই বা ক্রটি কোথায়? নীহার তাকে ভালবেসে তার মঙ্গলের জন্যই সে এতোটা করে জানে বনহুর। তাই আজ সে নীহারকে অনেকটা ঘনিষ্ঠ আপনজন মনে করে।

এরপর আর এলো না নীহার নাবিক আলমের কক্ষে।

কিন্তু নীহার না এলেও সবসময় সতর্ক দৃষ্টি রাখতো, তার বিশিষ্ট এক ভৃত্যের দ্বারা সন্ধান নিতো সে সর্বক্ষণ আলমের।

দুটো দিন কেটে গেলো।

জাহাজ ইরুইয়া বন্দরে নোঙ্গর করলো তৃতীয় দিনে।

আবু সাঈদ স্বয়ং কন্যাসহ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করার উদ্দেশ্যে ইরুইয়া বন্দরে অবতরণ করবেন জানালেন।

এ দুদিনের মধ্যে নাসের নানাভাবে যুক্তি-পরামর্শ করেও নাবিক আলমকে কাবু করার কোনো উপায় অবলম্বন করতে সক্ষম হলো না। যত রাগ-ক্ষোভ আর বিষপূর্ণ মনোভাব অন্তরে চেপে ফোঁস ফোঁস করতে লাগলো দারুণভাবে।

জলিল, শম্ভু আর জম্বুও সাহস পেলো না আলমকে সহসা আক্রমণ করতে।

ক'দিন বেশ নিশ্চিন্তেই কাটলো বনহুরের।

ডিউটির সময় ইঞ্জিন-ক্যাবিনে কাটে তার, অবসর তার বেশিক্ষণ নয়—সামান্য কয়েক ঘন্টা মাত্র। আজকাল সেই সময় টুকুই যেন কাটতে চায় না। যতক্ষণ ইঞ্জিনের কাজে ব্যস্ত থাকে ততক্ষণ বেশ থাকে, তারপর ছুটি হলেই একটা ক্লান্তি আর অবসাদ তার সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। নানা চিন্তা জট পাকায় এক সঙ্গে তার মনের গহনে।

❑

ইরুইয়া বন্দরে জাহাজ নঙ্গোর করার পর জাহাজের যাত্রিগণ সবাই বন্দরে অবতরণ-আশায় চঞ্চল হয়ে উঠলো। কয়েকটি দিন একটানা জাহাজে কাটিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছে যেন ওরা বেলুনের বদ্ধ হাওয়ার মত।

সবাই প্রস্তুত হয়ে নিলো বন্দরে নামবার জন্য।

ক্যাপ্টেন জানালেন, ইরুইয়া বন্দরে মাত্র একটি দিন তারা অপেক্ষা করবেন। এই কয়েক ঘন্টার মধ্যে তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সব সংগ্রহ করে নিতে হবে।

বনহুরের নিজের জন্য কয়েক বান্ডিল সিগারেট ছাড়া আর কিছু প্রয়োজন নেই। বললো বনহুর এক সময় কেশবকে—কেশব, তোমার যদি কিছু দরকার মনে করো নিতে পারো ইরুইয়া থেকে।

কেশব মাথা চুলকালো—আপনি নামবেন না বাবু?

হাঁ, ইরুইয়া বন্দরটা দেখবার সখ আমার আছে, নামবো।

তাহলে চলুন না বাবু, মেম সাহেব আপনাকে যাওয়ার জন্য আমাকে বললেন।

ভ্রূ কুঁচকে তাকালো বনহুর—মেম সাহেব আমাকে যাওয়ার জন্য তোমাকে বলেছে?

হাঁ, তিনি বললেন আমাকে ডেকে—কেশব, তোমার বন্ধুকে বলো ইরুইয়া বন্দরে অবতরণকালে সে যেন আমার সঙ্গে যায়।

তার এ সখ কেন, জানতে চাইলে না?

বাবু.....কেশব কিছু বলতে চাইলো কিন্তু মুখ দিয়ে বের হলো না।

এমন সময় আবু সাঈদ এসে পড়লেন—পাশে নীহার। বললেন আবু সাঈদ—আলম, আমাদের সঙ্গে তোমাকেও যেতে হবে।

চোখ তুলে তাকালো বনহুর। আবু সাঈদের মুখ থেকে দৃষ্টিটা একবার ফসকে গেলো নীহারের নতমুখে। অনুমানে বুঝতে পারলো, পিতার ইচ্ছার পিছনে কন্যার একটা যোগাযোগ আছে। বললো—আমি বরং ইঞ্জিনের মেশিনগুলো ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখে নিই। কথাটা বলে আর একবার সে তাকালো নীহারের দিকে।

নীহারও সেই সময় চোখ দুটো তুলে তাকিয়েছিলো একবারের জন্য। বনহুরের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই পুনরায় মাথাটা নত করে নিলো।

আবু সাঈদ বললেন—ইঞ্জিন পরীক্ষার কাজ চালাবে ইঞ্জিনিয়ার, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতেই হবে আলম। কারণ নতুন এক জায়গায়, বিশেষ করে নীহার আমার সঙ্গে থাকবে কিনা, বুঝলে?

বনহুর বুঝতে পেরেছে প্রথম কথাতেই, এবার রাজি না হয়ে উপায় রইলো না কিছু। বললো—বেশ, যাবো।

তৈরি হয়ে নাও আলম, আমরা এক্ষুণি জাহাজ থেকে বন্দরে অবতরণ করবো।

বনহুর দেখলো, নীহারের মুখে একটা আনন্দের দ্যুতি খেলে গেলো। দীপ্ত চোখে তাকালো একবার ওর মুখের দিকে। মনোভাব—তুমি যদি আমার সঙ্গে থাকো, ভয় কিসে!

ওরা চলে গেলো।

বনহুর স্বাভাবিক নাগরিক ড্রেসে সজ্জিত হয়ে নিলো। কিন্তু সেদিনের নাসেরের গুলীভরা পিস্তলখানা প্যান্টের পকেটে গোপনে লুকিয়ে নিতে ত্রুটি করলো না।

আবু সাঈদ ও নীহারের সঙ্গে বনহুরও চললো।

অন্যান্য সবাই যার-যার ইচ্ছামত নেমে পড়ছে।

সিঁড়ি বেয়ে বন্দরে অবতরণ করছে সবাই। আবু সাঈদ এবং নীহার প্রধান সিঁড়ি দিয়ে এগুচ্ছেন। বনহুর আসছে তাদের পিছনে। সিঁড়িটা শূন্যের উপরে দুলছে, নীচে প্রচন্ড জলস্রোত। নীহার বড্ড ভয় পাচ্ছিলো। সিঁড়ির সঙ্গে দুলছে নীহারের কম্পিত দেহটা।

আবু সাঈদ বয়স্ক লোক; তিনি কন্যাকে এগিয়ে নেবেন কিন্তু তাঁরও সাহস হচ্ছিলো না যেন। নীহার তখন সিঁড়ির মাঝখানে এসে গেছে।

অসহায় ভীতি দৃষ্টি নিয়ে তাকালো নীহার বনহুরের দিকে। বনহুর তখনও সিঁড়ির উপরে পা রাখেনি, কারণ মালিক এবং মালিক-কন্যা পার হবার পর সে এগুবে। নীহারের করুণ অবস্থা দেখে বনহুর ভড়কে গেলো কিছুটা, হঠাৎ যদি পড়ে যায় তাহলে যে প্রখর স্রোত, নীচে ওকে খুঁজে পাওয়াই মুস্কিল হবে। হঠাৎ বনহুরের চোখের সম্মুখে লুসীর করুণ মুখখানা ভেসে উঠলো ক্ষণিকের জন্য। বনহুর দক্ষিণ হাতখানা বাড়িয়ে ধরে ফেললো ওকে, বললো—সাবধানে আমার হাত ধরে চলুন মেম সাহেব।

নীহার বনহুরের হাতখানা মুঠায় আঁকড়ে ধরলো। এই বিপদ মুহূর্তেও একটা তড়িৎ-প্রবাহ যেন বয়ে গেলো নীহারের শিরায় শিরায়। ভয়-ভীতি মুছে গেলো সঙ্গে সঙ্গে, গভীর জলতরঙ্গে পড়ে গেলেও আর সে মরবে না জানে।

বনহুরের সাহায্যে নীচে নেমে এলো নীহার।

আবু সাঈদ হেসে ফেললেন ফ্যাকাশে মুখে, কৃতজ্ঞতাপূর্ণ কণ্ঠে ধন্যবাদ জানালেন—সাধে কি মা মনি তোমাকে এতো সমীহ করে! দেখো দেখি, কত বড় উপকারটা হলো তোমার দ্বারা.....গদগদ হয়ে এলো আবু সাঈদের গলার স্বর।

নীহার চোখ তুললো, কোনো কথা না বললেও তার দৃষ্টির মধ্যে একটা কৃতজ্ঞতার ছাপ ফুটে উঠলো।

বনহুর ছোট্ট করে উচ্চারণ করলো—এমন কি আর করলাম!

আবু সাঈদ, নীহার আর নাবিক আলম যখন সিঁড়ির উপর এগুচ্ছিলো তখন নাসেরের দল ডেকের অদূরে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করছিলো। বনহুর যখন নীহারের হাত ধরে সিঁড়ি পার করে নিচ্ছিলো তখন নাসের বললো—দেবো নাকি শেষ করে দুটোকে?

জলিল ক্ষিপ্রহস্তে নাসেরের পিস্তলের মুখটা নীচু করে দিয়ে বললো—প্রকাশ্যে এ কাজ করলে সব ফাঁস হয়ে যাবে। আমও যাবে, বস্তাও যাবে। সবুর করেন ছোট স্যার, সব ঠিক করে নেবো।

জম্মু দাঁত পিষে বললো—সেদিন আমার হাঁটুতে যেভাবে শট্ করেছিলো, আজও ভাল করে হাঁটতে পারি না। সুযোগ পেলে দেখাবো না মজাটা কেমন?

জলিল পেটের দক্ষিণ দিকটা টিপে ধরে মুখটা কালো করে বলে—খেলে এখনও পেটে ব্যথা করে। ভাগ্যিস, পেটের নাড়ী ছিঁড়ে যায়নি সেদিন, তাই রক্ষা।

এতোক্ষণ শম্ভু তার ভীমকায় দেহ নিয়ে পান চিবুচ্ছিলো, বললো—আমাকেও কম আছড়ে দেয়নি বেটা। যতদিন বেঁচে থাকবো মনে থাকবে। দাঁতটা আজও নড়ছে, তবে রক্ত পড়ে না, এই যা।

রক্ত পড়ে না বলেই ছেড়ে দেবে নাকি ওকে?

ছেড়ে দেবো মানে? এই দাহ দিয়ে ওর বুকের রক্ত শুষে নেবো না?

জলিল বললো—দেখা যাবে কে কতটুকু বাহাদুর।

বললো নাসের—শয়তানটা এতো শক্তি পেলো কোথায়? ওকে সাধারণ মানুষ বলে মনে হয় না। জানো ওর এক একটা ঘুষির ওজন কতো?

জানি ছোট স্যার, জানি। কিন্তু জলিলের কাছে সব মিছে হয়ে যাবে। জলিল যখন কৌশল প্রয়োগ করবে তখন আলম কেন, আলমের বাবা এলেও পারবে না মনে রাখবেন। জলিল এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে এক খিলি পান মুখে গুঁজে দিলো।

নাসের বললো—চলো এবার। আমরাও নেমে পড়ি, কিন্তু মনে রেখো ওদের পূর্বেই আমরা জাহাজে ফিরবো এবং যে সিঁড়ি দিয়ে ওরা জাহাজে ফিরে আসবে সেই সিঁড়ির একটা দিক নষ্ট করে দিতে হবে।

ঠিক বলেছেন ছোট স্যার, একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

নাসেরের সঙ্গে হাত মিলালো জলিলের দল।

জলিলের দলের একজন লাঠিয়াল—নাম তার ফুলমিয়া, এতোক্ষণ ওদের পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলো। যদিও সে ওদের লোক কিন্তু তার মন এতোখানি হীন নয়। অন্তরে তার মায়া-দয়া সব আছে, আছে বিবেক-বিবেচনা। এদের কথাবার্তা মোটেই তার যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হয় না। বিশেষ করে নাবিক আলম সম্পূর্ণ নিরপরাধ, কিন্তু তাকে হত্যার জন্য কিই না ষড়যন্ত্র চলেছে দিবারাত্রি!

ফুলমিয়া এতোদিন ধৈর্য ধরে এদের অন্যায় মেনে নিয়েছে নীরবে। শুনে গেছে কিন্তু কোনো জবাব সে দেয়নি কোনোদিন, জানতো, বলে কোনো ফল হবে না। হয়তো তাকেও সন্দেহ করে বসবে ওরা রীতিমত।

আজ ফুলমিয়া সহ্য করতে পারে না জলিলদের কুৎসিত নির্মম পরামর্শ। একটা নিষ্পাপ মানুষকে এরা সাগরবক্ষে প্রচন্ড জলস্রোতে ডুবিয়ে মারবে, এতোবড় অন্যায় হতে দেবে না সে।

ফুলমিয়া আস্তে সরে গেলো সেখান হতে। বড় ইচ্ছা ছিলো ইরুইয়া বন্দরে অবতরণ করে বন্দরটা একবার দেখবে ঘুরেফিরে কিন্তু সব বাসনা মুছে ফেললো সে মন থেকে, চিরদিন ওদের দলে থেকে ওদের কুৎসিত সংস্পর্শে অনেক কুকর্ম করেছে সে। হঠাৎ আজ ফুলমিয়ার মন ফিরে যায়, মনে মনে শপথ করে—আর লোকের মন্দ সে কোনোদিনই করবে না। বরং যদি জীবন দিয়ে কারো উপকার করতে পারে তবেই সার্থক হবে এ পৃথিবীতে আসা তার।

কাজেই ফুলমিয়া বন্দরে অবতরণ না করে একটা ক্যাবিনের আড়ালে লুকিয়ে রইলো, দেখবে কি করে সিঁড়ির মুখ ওরা নষ্ট করে। প্রকাশ্যে কিছু বলতে বা করতে পারবে না ফুলমিয়া, কারণ জানে, কতবড় হৃদয়হীন নরপিশাচ তার দলের লোক। এতোটুকু যদি টের পায় তার মনোভাব তাহলে তাকে হত্যা করবে সর্বপ্রথমে। যেমন নাবিক মকবুলকে হত্যা করা হয়েছে। তার চেয়ে নিশ্চুপ থেকে যদি কিছু করা যায়!

ফুলমিয়া আসলেই গরীবের ছেলে ছিলো না। মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান সে। যদিও প্রচুর অর্থ বা ঐশ্বর্য ছিলো না কিন্তু মন ছিলো বড়। পরের জন্য যতটুকু পারে করতো সে মন দিয়ে। ছোটবেলায় ফুলমিয়া লেখাপড়াও শিখেছিলো কিছুটা। তবে সংসারে মা না থাকায় এবং পিতা বৃদ্ধ হওয়ায় তাকেই সংসারের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয়েছিলো। কাজেই বেশি লেখাপড়া করা তার ভাগ্যে ঘটে ওঠেনি।

বৃদ্ধ পিতা এবং ছোট-ছোট ভাই-বোনদের অন্ন-সংস্থানের জন্য ফুলমিয়াকে চাকরীর সন্ধানে ফিরতে হয় এখানে-সেখানে। অল্প লেখাপড়া এবং ভাল ব্যাকিং না থাকার জন্য কোথাও কোন চাকরি মেলে না। এদিকে সংসারের অভাবের তাড়নায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে—এমন দিনে বাপ মারা যায়। মাঝখানে বিয়েও করে নিয়েছিলো সে। ছোট-ছোট ভাই-বোন এবং নতুন বৌ-এর খাওয়া-পরা নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়লো ফুলমিয়া।

এমন দিনে জলিলের সঙ্গে পরিচয় ঘটলো কোনো এক মুহূর্তে। ফুলমিয়ার বলিষ্ঠ চেহারা দেখে পছন্দ করে নিলো তাকে। তারপর হতে ফুলমিয়া জলিলের দলে লাঠিয়ালের কাজ করে।

যদিও লাঠিয়াল জীবন তার কাছে ভাল লাগে না তবু বাধ্য হয় সে এ কাজ করতে। জলিলের আদেশে তাকে অনেক কু-কর্ম করতে হয়। নিরীহ কত মানুষের মাথায় আঘাত করেছে সে ঐ জলিলের নির্দেশে। কত অসহায়

মানুষের সর্বনাশ করতে হয়েছে তাকে। অবশ্য এসব করার পর অনুশোচনায় মন তার ভরে উঠেছে, কিন্তু কি করবে—এ কাজ না করেও কোনো উপায় নেই। বাধ্য হয়েই সে আজও টিকে আছে জলিলের দলে।

জলিলের আদেশে কু-কর্ম করলেও মন তার কোনোদিন সায় দেয়নি একান্তে। তবুও তাকে করতে হয়েছে, না হলে সংসার চলবে না। কিন্তু আজ তার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠে। একজন নিরপরাধ ব্যক্তির জীবননাশ করতে এতো তৎপরতা কেন তাদের। মিথ্যা নয়—কেন যেন নাবিক আলমকে ওর ভাল লাগে। ওর সান্নিধ্য লাভের কামনা জাগে মনে। কিন্তু মনের ইচ্ছা প্রকাশের কোনো উপায় নেই। তাদের দলের সবাই ঈর্ষা করে ওকে। যদি কোনোক্রমে প্রকাশ পায় ফুলমিয়া নাবিক আলমকে মনে মনে সমীহ করে—তাহলে নির্ঘাত মৃত্যু তাতে কোনো ভুল নেই।

ফুলমিয়া অন্তরের কথা কোনোদিন ব্যক্ত করে না এসব কারণেই। মনের বাসনা গোপনে চেপে নিশ্চুপ থাকে সে। কিন্তু আজ আর যেন সহ্য হয় না, বিবেক মাথাচাড়া দিয়ে উঠে তার মধ্যে।

ফুলমিয়া আড়ালে লুকিয়ে পড়ে, দেখবে সে—কি করে জলিল আর তার দলবল। কেমন করে ঝুলন্ত সিঁড়ির মুখ নষ্ট করে দেয়। দেবে না ফুলমিয়া এতোবড় একটা হৃদয়হীন অন্যায় করতে।

অনেকক্ষণ হয় চলে গেছেন আবু সাঈদ নীহার আর আলম সহ। জাহাজের প্রায় সবাই নেমে গেছে।

কয়েকজন জাহাজে আছে, এখনও তারা ইঞ্জিন পরিস্কারে ব্যস্ত। আর আছে জলিলের দলবল, কয়েকজন অবশ্য নেমে গেছে যদিও, তবুও ফুলমিয়া যায়নি।

ফুলমিয়া আড়ালে আত্নগোপন করে দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চুপ।

কিছুক্ষণ কেটে যায়—হঠাৎ ফুলমিয়ার নজর পড়ে তাদের দলেরই একজন একটা হাতুড়ি এবং বাটাল নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সিঁড়িটার দিকে। এ দুটো জিনিস গোপনে কাপড়ের তলায় লুকিয়ে নিয়েছে লোকটা। জলিল, শম্ভু, ও জম্বুও এলো, ওরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে চারদিকে লক্ষ্য করছে সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে।

আশেপাশে কেউ নেই।

জলিল লোকটাকে ইংগিত করলো এবার কাজ শুরু করতে—কারণ এইতো সুযোগ। ধূর্ত শিয়ালের মতই সে ইশারা করতে লাগলো—সেইভাবে কাজ করে চললো বাদল। বাটাল আর হাতুড়িওয়ালা লোকটার নাম ছিলো বাদল।

জলিল জানে, হঠাৎ যদি কেউ দেখে ফেলে বা কারো নজরে পড়ে যায় তাহলে বাদলকে খুব করে ধমকে দেবে সে এই কাজের জন্য। সে সম্পূর্ণ নির্দোষ থেকে যাবে এ ব্যাপারে।

বাদল সিঁড়ির মুখ এমনভাবে নষ্ট করে দিলো যে, সিঁড়িতে পা দিতেই সিঁড়ি খসে পড়বে সাগরবক্ষে।

কাজ শেষ করে চলে গেলো বাদল।

জলিল আর তার অন্যান্য অনুচর খুশি হলো, কারণ এ সিঁড়িতে শুধু আবু সাঈদ, নীহার আর আলমই উঠে আসবে। বিপদ ঘটবে ওদেরই।

ফুলমিয়া আলগোছে সরে পড়লো। দ্বিতীয় সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো বন্দরে। যেমন করে হোক প্রথম সিঁড়িতে ওরা যেন না আসে সেই কাজ তাকে করতে হবে।

নিজের দলের প্রতি একটা বিতৃষ্ণা এসে গেছে তার। এমন নিষ্ঠুর হৃদয়হীন কাজ তার সহ্য হবে না কিছুতেই। বিদ্রোহী মন নিয়ে সে এগিয়ে চললো কিন্তু ইরুইয়া বন্দর ছোটখাট নয়—কোথায় খুঁজে ফিরবে সে ক্যাপ্টেন আবু সাঈদ, তার কন্যা নীহার এবং আলমকে। চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এগোয় ফুলমিয়া।

বন্দরের সংলগ্ন ইরুইয়া নগরী।

কৌশলী শিল্পীর নিপুণ হস্তের তুলিতে আঁকা ছবির মত সুবিস্তৃত ইরুইয়া। উচু-নীচু টিলা আর সমতলভূমির উপরে ছোট-বড় কাঠের ঘরগুলো ঠিক গুছিয়ে তৈরি না করলেও দেখতে প্রায় সবগুলোই এক সমান এবং একই ধরনের। কাঠের খুঁটি আর তক্তা দিয়ে মজবুত করে তৈরি এগুলো। তক্তার তৈরিই ছাদ। খাঁচ-কাটা সুন্দর নক্সা-করা ঘরের ধারগুলো দেখতে বেশ ঝালরের মত মনে হয়।

টিলা আর ঢিবির পাশ কেটে সরু পথ চলে গেছে আঁকা-বাঁকা হয়ে দূর হতে দূরে। পথের দু'ধারে দোকানপাট রয়েছে আর মাঝে মাঝে সরাইখানা। কোথাও বা ফলমূলের দোকান আছে। ফুল এবং ফুলের মালার দোকানও আছে এ শহরে।

জিনিসপত্র কেনার পর আবু সাঈদ, কন্যা নীহার ও আলম সহ ফিরে চললেন। হঠাৎ নীহারের দৃষ্টি গিয়ে পড়লো সামনে ফুল ওয়ালার দোকানে। গোলাপ আর বেল ফুলের সমারোহ নীহারকে মুগ্ধ করে ফেললো।

এগিয়ে গেলো নীহার একটা মালা ক্রয়ের উদ্দেশ্যে।

সেই সময় ফুল ওয়ালার দোকানে ইরুইয়ার রাজমন্ত্রী ফারহু তার দু'জন অনুচরসহ ফুলের মালা ক্রয় করছিলো। নীহারকে দেখামাত্রই ফারহুর দৃষ্টি ফুলের মালা হতে চলে এলো ওর উপর। ফারহু ছিলো ইরুইয়ার একজন অতি অসৎ কু-মনোবৃত্তিপূর্ণ লোক। নীহারকে দেখে হঠাৎ তার মধ্যে একটা লোলুপ লালসাপূর্ণ মনোভাব জেগে উঠলো।

নীহার বা তার পিতা আবু সাঈদ কোনো দিকে লক্ষ্য করেনি, তারা ফুল ওয়ালার দোকানের ভিতর প্রবেশ করে দেখছে কোন্ মালাটা ক্রয় করবে।

আবু সাঈদ এবং নীহার যখন ফুলের মালা পছন্দ নিয়ে মগ্ন হয়ে পড়েছেন, নাবিক আলম-বেশি দস্যু বনহুর তখন কিছুটা পিছন হতে লক্ষ্য

কথাগুলো। ফারহু'র পোশাক পরিচ্ছদ এবং তার দেহরক্ষীদ্বয়ের সাজসজ্জা দেখেই সে বুঝতে পেরেছিলো, এরা ইরুইয়ার কোনো রাজকর্মচারী। এক নজরেই অনুমান করে নিয়েছিলো তাদের মতলবটা, কাজেই বনহুর প্রস্তুত হয়ে ঠিক নীহারের পিছনে এসে দাঁড়ালো।

নীহার যখন একটি মালা হাতে তুলে নিয়েছে এবং নেড়েচেড়ে দেখছে সেই সময় রাজমন্ত্রী ফারহু খপ করে নীহারের হাতখানা চেপে ধরলো, মুখে তার বিদঘুটে কুৎসিত হাসি। ইরুইয়া ভাষায় বললো—সুন্দরী ফিরে চাও আমার দিকে......

ফারহু'র কথা শেষ হয় না, বনহুরের প্রচন্ড এক ঘুষি গিয়ে পড়ে তার চোয়ালে। ঘুরপাক খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে সোজা হয়ে দাঁড়ায় ফারহু। দু'চোখে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঠিকরে পড়ে।

সঙ্গে সঙ্গে ফারহু'র দেহরক্ষীদ্বয় ধরে ফেলে বনহুরকে।

বনহুর এক ঝটকায় নিজকে ওদের হাত থেকে মুক্ত করে নেয়।

আবু সাঈদ এবং নীহার থ'মেরে গেছে। হঠাৎ এমন একটা ব্যাপার ঘটবে কল্পনাও করতে পারেনি তারা।

ফারুহ্ দাঁত পিষে নিজ ভাষায় বললো—জানো আমি কে?

বনহুর ইরুইয়া ভাষা না জানলেও অনুমানে কতকটা বুঝে নিলো তার কথা বলার ভঙ্গী দেখে। শুদ্ধ ইংরেজীতে বললো বনহুর—তোমার ব্যবহারেই আমি তোমার পরিচয় পেয়েছি।

নাবিক আলমকে সুন্দর ইংরেজী বলতে দেখে আবু সাঈদ মুগ্ধ হলেন। আরও বেশি বিমুগ্ধ হয়েছেন তিনি আজ তার শক্তির চাক্ষুস পরিচয় পেয়ে।

বনহুর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কথাটা বলে একটি ঝুড়ি কাঁধে তুলে নিলো, যেন তার কিছু হয়নি, বললো—চলুন।

এতক্ষণ অদূরে দাঁড়িয়ে ফুলমিয়া সব লক্ষ্য করছিলো। খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ দেখা পেয়েছিলো আবু সাঈদ, নীহার এবং আলমের। কিন্তু এমন সময় সন্ধান পেলো সে, যখন আলম রাজমন্ত্রীর চোয়ালে মুষ্ঠিঘাত করে ফেলেছে।

স্তব্ধ হয়ে দেখছিলো ফুলমিয়া নাবিক আলমের অদ্ভুত রূপ। শ্রদ্ধায় মাথাটা নত হয়ে আসছিলো ওর। সে আরও লক্ষ্য করলো, আলম ঘুষি চালানোর পর দেহরক্ষীদ্বয় যখন তাকে ধরে ফেললো তখন এক ঝটকায় ওদের কবল থেকে নিজকে অতি সহজে মুক্ত করে নিলো আলম। কিন্তু এরপর বিপক্ষদল আর যেন ওকে ঘাটতে সাহসী হলো না। বৃথা আস্ফালন করে ক্রুদ্ধভাব প্রকাশ করতে লাগলো রাজমন্ত্রী এবং তার সঙ্গীদ্বয়।

বনহুর বোঝাটা তুলে নিয়ে সচ্ছভাবে অগ্রসর হলো। তার চলার ভঙ্গী দেখে মনে হলো কিছু যেন হয়নি।

ফুলমিয়া এবার সামনে এসে দাঁড়ালো, আলমকে লক্ষ্য করে বললো—ভাই, বোঝাটা আমাকে দাও, আমি তো খালি হাতে যাচ্ছি।

বনহুর ফুলমিয়াকে চিনতো, ও-যে লাঠিয়াল জলিলের একজন—তাও জানতো, বললো বনহুর—আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

ফুলমিয়া নাছোড়বান্দা—সে জেদ ধরে বললো, সে খালি হাতে যাচ্ছে অথচ আলম বোঝা বয়ে নিয়ে যাবে এটা বড় অশোভনীয়।

আবু সাঈদ বললেন—আলম, বোঝাটা ওকে দাও।

অগত্যা বাধ্য হলো বনহুর নিজের বোঝাটা ওকে দিতে।

আবু সাঈদ, নীহার আর বনহুর এগিয়ে চললো।

ফারহু ইংগিৎ করলো তার সঙ্গীদ্বয়কে ওদের অনুসরণ করতে। তৎক্ষণাৎ গোপনে রাজকর্মচারীদ্বয় অনুসরণ করে চললো।

সিঁড়ির মুখে এসে বুকটা কেঁপে উঠলো ফুলমিয়ার। বহু চিন্তা করে সে মনস্থির করে নিয়েছে, নিজের জীবন দিয়েও রক্ষা করবে আলম এবং মালিক আবু সাঈদ ও তাঁর কন্যা নীহারকে। সিঁড়ির মুখ নষ্ট করার কথা এদের কাছে বললে জলিলের দল তাকে ক্ষমা করবে না। উত্তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা তার চক্ষুদ্বয় অন্ধ করে দেওয়া হবে। কারণ সে জানে, তাদের দলের কেউ অবিশ্বাসী কাজ করলে তার এই শাস্তিই দেওয়া হয়ে থাকে। নৃশংস পরিণতির চেয়ে স্বাভাবিক মৃত্যু তার কাছে অনেক শ্রেয়ঃ। মরতে হয় এদের বাঁচিয়ে তবে মরবে।

ফুলমিয়া বোঝাটা নিয়ে পথ চলতে চলতে এ কথাই ভাবছিলো—মন বলছিলো, কি হবে অন্যের জন্য নিজকে বিসর্জন দিয়ে? বিবেক মাথাচাড়া দিয়ে মনকে দাবিয়ে দিচ্ছিলো, একটি জীবন দিয়ে যদি তিনটি জীবন রক্ষা করতে পারো তাহলে তুমি নশ্বর পৃথিবীর বুকে একটা কাজের মত কাজ করে যাবে। মরতে তোমাকে হবেই একদিন, তবু যদি পারো মানুষের কিছু উপকার করে যাও। ফুলমিয়ার মন পরাজয় স্বীকার করেছিলো তার বিবেকের কাছে।

ফুলমিয়া বোঝাটা কাঁধে নিয়ে তাকালো সিঁড়ির নীচে সাগরের উচ্ছল জলরাশির দিকে। কি প্রচন্ডভাবে ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে সরে যাচ্ছে জলরাশি। একবার পড়ে গেলে আর তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ফুলমিয়া ইচ্ছা করলে দ্বিতীয় সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতে পারতো বা ওদের সেইভাবে যেতে বলতে পারতো কিন্তু সে জানে, আজ জলিলের দল নিতান্ত মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করে চলেছে, কোনোরকম চালাকি তার চলবে না। ইচ্ছা করলে এদের বাঁচাতে পারে কিন্তু তাকে নির্মমভাবে প্রাণ দিতে হবে, তার চেয়ে সাগরের জলে জীবন দেওয়া অনেক শ্রেয়ঃ।

ফুলমিয়া বোঝাটা মাথায় খোদার নাম স্মরণ করে ঝুলন্ত সিঁড়ির ধাপে পা রাখলো।

সঙ্গে সঙ্গে ফুলমিয়া এবং বোঝাটাসহ সিঁড়িটা ঝপাং করে খসে পড়লো সাগরবক্ষে।

আর্তচীৎকার করে উঠলো আবু সাঈদ এবং নীহার।

বনহুর কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলো না, মুহূর্তে দেহ থেকে কোটটা খুলে ফেলে ঝাঁপিয়ে পড়লো জলতরঙ্গের মধ্যে।

জাহাজের উপর থেকে সব লক্ষ্য করছিলো নাসেরের দল। ভেবেছিলো এক, হলো আলাদা। ফুলমিয়া সাগরবক্ষে নিমজ্জিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই জলিল তার লোকদের আদেশ দিলো শীঘ্র জাহাজে বিপদসংকেত ধ্বনি করতে এবং কয়েকখানা বোট পানিতে নামিয়ে নিতে। ব্যস্ত হয়ে পড়লো জলিলের দল, কারণ ফুলমিয়া তাদের দলের লোক, ফুলমিয়ার এ অবস্থার জন্য জলিল বেশ ঘাবড়ে গেলো। অবশ্য জলিল জানে না ফুলমিয়ার মনের কথা তাই, না হলে ওকে বাঁচানোর জন্য ওরা এমন ব্যস্ত হয়ে পড়তো না।

নীহার তো পিতার জামার আস্তিনে নিজের দু'চোখ ঢেকে ফেলে রোদন করে উঠলো—আব্বা একি হলো? সর্বনাশ হলো যে! ফুলমিয়ার সঙ্গে আলমও যে মারা পড়লো।

আবু সাঈদও ব্যস্তভাবে বন্দরে ছুটাছুটি করতে লাগলেন আর চিৎকার শুরু করলেন—শীঘ্র বোট নামাও....শীঘ্র বোট নামাও......

নীহার মন-প্রাণে খোদাকে স্মরণ করছে। তার নারী-হৃদয় একেবারে ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়েছে। কি ভয়ঙ্কর মর্মান্তিক অবস্থা!

নীহার নিজকে কিছুতেই স্থির রাখতে পারছিলো না, সে অবিরত রোদন করে চলেছে।

ওদিকে জলিলের দল এবং জাহাজের অন্যান্য নাবিক জাহাজের পিছনে এবং সম্মুখভাগে কয়েকখানা বোট নামিয়ে নিয়েছে। দু'জন সাঁতারুও বোটে চেপে সাগরবক্ষে অবতরণ করেছে।

বনহুর কিন্তু ফুলমিয়াকে অনেক কষ্টে আঁকড়ে ধরে রেখেছিলো। ফুলমিয়া যেন জাহাজের চাকার ফাঁকে আটকে না যায় সেজন্য সে আপ্রাণ চেষ্টায় চাকার বিপরীত দিকে সাঁতার কাটছিলো।

প্রচণ্ড জলস্রোতে ফুলমিয়ার মত একজন বলিষ্ঠ জোয়ান লোককে ধরে নিয়ে সাঁতার কাটা কম কথা নয়। যদিও বনহুর হাঁপিয়ে পড়ছিলো তবু কিছুতেই ওকে মুক্ত করে দেয়নি।

ততক্ষণে বোটসহ উদ্ধারকারিগণ জাহাজের চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছিলো। নানাভাবে জলতরঙ্গ ভেদ করে সন্ধান করে ফিরছিলো ওরা নাবিক আলম আর ফুলমিয়ার।

নীহার এবং আবু সাঈদ বন্দরের জেটিতে দাঁড়িয়ে ব্যাকুল আগ্রহে তাকিয়ে দেখছিলো, বুকের মধ্য ঢিপ্ ঢিপ্ করছিলো তাদের। জেটিতে ডেকের উপর আশেপাশে লোকজনে ভীড় জমে উঠেছে। সকলের চোখেমুখেই ভীতিকর আশঙ্কাভরা ভাব।

দু'খানা জাহাজ ইতিমধ্যে বন্দর ত্যাগ করবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। জাহাজ 'পর্টিন' থেকে বিপদসঙ্কেত ধ্বনি প্রচার হবার সঙ্গে সঙ্গে সে জাহাজ দুটি স্থির হয়ে পড়েছে।

দিনের আলো বলেই রক্ষা, উদ্ধারকারী বোটগুলো অল্পক্ষণেই ফুলমিয়াসহ বনহুরকে উদ্ধার করে বন্দরে নিয়ে এলো।

সর্বপ্রথমে নীহার সব ভুলে বনহুরের অর্ধ-সংজ্ঞাহীন দেহটার উপর ঝুঁকে পড়লো—আলম, এখন কেমন বোধ করছো?

বনহুর একেবারে জ্ঞান হারায়নি, সে ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালো, বললো—আমি ভাল আছি, ফুলমিয়া কেমন আছে?

অদূরে সংজ্ঞাহীন ফুলমিয়াকে তখন ডাক্তার চিকিৎসা করছেন। আবু সাঈদ একবার আলম, একবার ফুলমিয়ার কাছে ছুটছেন। ডাক্তার ফুলমিয়ার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানালেন। তিনি নাবিক আলমের প্রশংসা করে বললেন—ফুলমিয়াকে কিছুতেই রক্ষা সম্ভব হতো না যদি আলম তাকে ঠিকভাবে ধরে রাখতে সক্ষম না হতো। ফুলমিয়া অনেক আগেই সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিলো, নাবিক আলম তাকে কঠিন-মজবুত হস্তে ধরে রেখেছিলো বলেই উদ্ধারকারিগণ তাকে উদ্ধার করতে পেরেছে।

বনহুর অল্পক্ষণ মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠলো।

ফুলমিয়ার তখনও জ্ঞান ফিরে আসেনি। তাকে অজ্ঞান অবস্থাতেই জাহাজ 'পর্যটনে' উঠিয়ে নেওয়া হলো।

জাহাজে গমন করেই আবু সাঈদ খেয়াল করলেন সিঁড়ির মুখ হঠাৎ কি করে নষ্ট হলো—ভাগ্যিস, নীহার বা তিনি যদি সিঁড়ির ধাপে পা রাখতেন তাহলে কি ভয়ঙ্কর অবস্থা হতো—কিছুতেই বাঁচতেন না। শিউরে উঠলেন আবু সাঈদ সাহেব। তৎক্ষণাৎ গভীরভাবে অনুসন্ধান শুরু করলেন।

সিঁড়ির মুখ পরীক্ষা করে বিস্মিতই শুধু হলেন না তিনি, স্তম্ভিত হলেন। বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারলেন—কে বা কারা সিঁড়ির মুখ বাটাল বা ঐ ধরনের অস্ত্র দ্বারা নষ্ট করে দিয়েছিলো। সেই স্থানে ছিলো নাসের এবং জলিলের দল। নাসের ভীড় ঠেলে সম্মুখে এসে বললো—স্যার, নিশ্চয়ই আপনাকে হত্যা করতে চেয়েছিলো সেই নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করার জন্য ফুলমিয়াকে উদ্ধারের উদ্দেশ্য নিয়ে সাগরবক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো....

নাসের নাম ধরে না বললেও চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো,—সিঁড়ির মুখ নষ্ট করেছে আলম।

আবু সাঈদ ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন—খবরদার, অমন কথা বলো না। আলম প্রথম থেকেই আমাদের সঙ্গে ছিলো, তাছাড়া সে তেমন লোক নয়।

অনেক সন্ধান করেও আবু সাঈদ সিঁড়ির মুখ নষ্টকারিগণকে আবিষ্কারে সক্ষম হলেন না। তিনি ইরুইয়া বন্দর ত্যাগ করার জন্য জাহাজের নাবিকগণকে আদেশ দিলেন।

জাহাজ 'পর্যটন' ইরুইয়া বন্দর ত্যাগ করে ফৌজিন্দিয়া দ্বীপের দিকে রওয়ানা দিলো। জাহাজে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলেও আবু সাঈদের মন সচ্ছ হলো না। পর পর একটার পর একটা দুর্ঘটনা তাঁকে বেশ উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। এবারের মত কোনোবার তাঁর জীবনে এমন বিপর্যয় আসেনি বা

ঘটেনি। এবার যেন কেমন একটা এলোমেলো ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে তাঁর 'পর্যটনে'।

ফুলমিয়া ক্রমে সংজ্ঞা লাভ করে।

একটু সুস্থ হয়েই সে জানতে পারে, নাবিক আলম নিজের প্রাণ বিপন্ন করে তাঁকে সাগরবক্ষ হতে উদ্ধার করেছে। অনাবিল এক আনন্দে আপ্লুত হয় ফুলমিয়ার মন। নাবিক আলমের প্রতি তার হৃদয়তা আরও গভীর হতে গভীরতম হয়ে উঠে।

ফুলমিয়া আরোগ্য লাভ করলো।

আবু সাঈদ আর নীহার সবচেয়ে খুশি হয়েছে। দিন দিন আলমের প্রতি পিতা এবং পুত্রীর অনুরাগ আরও বেশি নিগূঢ় হয়ে উঠেছে। আলম যেন তাদের অতি আপন জন একটি মুহূর্ত ওকে না হলে তাদের যেন চলবে না।

ফুলমিয়াকে মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার করার জন্য আবু সাঈদ নাবিক আলমের কাছে কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলেন। সেই বিপদকালে নিজের জীবন বিপন্ন করে কেউ সাহসী হতো না ভীষণ জলতরঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়তে। কত বড় মহান আর হৃদয়বান হলে সে এমন কাজ করতে পারে—ভেবে আবু সাঈদ অবাক হলেন।

নীহারও কম বিস্মিত হয়নি। দিন যতই গড়িয়ে যাচ্ছে ততই যেন আলমের আত্মপরিচয়ে সে আশ্চর্যের পর আশ্চর্য হচ্ছে। নাবিক আলম মানুষ না অন্য কিছু।

সাধারণ মানুষের মধ্যে তো এমন অদ্ভুত গুণ পরিলক্ষিত হয় না! আলম সম্বন্ধে নীহার যত ভাবে ততই ওর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, আরও গভীরভাবে ভাবতে যেন ইচ্ছা করে ওর কথা। নীহারের জীবনে আলম যেন এক জ্যোতির্ময় দ্যুতি এনে দিয়েছে। একটি মুহূর্ত যেন ওকে না দেখে থাকতে পারে না সে।

নীহার আলমের কথা যতই ভাবুক, যতই ওকে পাবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠুক, আলম ততই নীহারকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করে। সে বুঝতে পারে; নীহারের মনে সে দাগই শুধু কাটেনি, গভীরভাবে স্থান দখল করে নিয়েছে। কিন্তু সেকি তার অপরাধ? আলম নিজের মনকেই প্রশ্ন করে।

নীহারের সান্নিধ্য সে কোনোদিন কামনা করে না, তবে নীহার যখন তার পাশে এসে ঘনিষ্ঠভাবে দাঁড়ায় তখন পারে না সে তাকে নির্মমভাবে উপেক্ষা করতে। হয়তো এটা তার মনের সৎসাহস—দুর্বলতা নয়। কারণ তার জীবনে বহু নারী ধমনীতে প্রবাহিত হয়েছে উষ্ণ রক্তের ধারা, তবু সে সংযমচ্যুত হয়নি! কঠিন লৌহমানবের মত নিজকে শক্ত করে রেখেছে। আজ বনহুর নীহারের কাছে পরাজিত হবে না।

জাহাজ অবিরাম একটানা চলেছে।

রাত গভীর না হলেও বেশ রাত হয়েছে।

আকাশে আজ পূর্ণচন্দ্র।

জ্যোৎস্না-প্লাবিত সমস্ত পৃথিবী। উচ্ছল জলতরঙ্গের উপর জ্যোৎস্নার আলো পড়ে অপূর্ব লাগছিলো।

ডেকের রেলিং-এ ঠেশ দিয়ে সিগারেট পান করছিলো বনহুর। মনের মধ্যে নানা চিন্তার উদ্ভব হয়ে চলেছে। চিন্তাস্রোতে গা ভাসিয়ে আনমনা হয়ে পড়েছিলো সে।

এমন সময় চমকে উঠে বনহুর, ফিরে তাকিয়ে বলে—মেম সাহেব আপনি! সঙ্গে সঙ্গে সিগারেটটা নিক্ষেপ করে দূরে।

নীহারের সম্মুখে নাবিক আলম সিগারেট পান করতো না। কারণ সে তার মনিব-কন্যা, তাই আজও বনহুর নীহারের আগমনে অর্ধদগ্ধ সিগারেট দূরে নিক্ষেপ করলো। অসময়ে মালিক-কন্যাকে তার পাশে আসতে দেখে অবাক না হলেও সে বিব্রত হলো।

নীহার হঠাৎ এসে পড়েছে; সেও বেশি করে ভেবে দেখেনি—কেন সে এলো, কি চায় সে নাবিক আলমের কাছে। আলম যখন বললো, 'মেম সাহেব আপনি!'—তখন হঠাৎ নীহার জবাব দিতে পারলো না, মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। সেদিনের পর থেকে—যেদিন নীহার আলমের ক্যাবিন থেকে বিমুখ হয়ে ফিরে এসেছিলো, বলেছিলো আলম, 'মেম সাহেব, আমার ক্যাবিনে আপনি আর আসবেন না। এখানে আসাটা আপনার মোটেই উচিৎ নয়। আমাকে আপনি মাফ করবেন।'

নীহার অস্ফুট ধ্বনি করে উঠেছিলো, 'আলম, তুমি আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছো?'

জবাব দিয়েছিলো আলম, 'না।'

তবে অমন করে কথা বলছো কেন? বলেছিলো নীহার।

আপনি জানেন না, আমার ক্যাবিনে আসাটা আপনার জন্য সম্পূর্ণ অসঙ্গত। আমি অনুরোধ করছি, আপনি আমার ক্যাবিনে আর আসবেন না।'

❑

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেছিলো নীহার—'আলম!'

'হাঁ মেম সাহেব! আমাকে মাফ করবেন, আমি অক্ষম......

নীহার বেরিয়ে গিয়েছিলো আলমের ক্যাবিন থেকে। তারপর আর সে আসেনি আলমের পাশে। একটি ক্ষুব্ধ অভিমান গুমড়ে কেঁদে ফিরেছে সদা তার মনের গহনে। নিজের মনেই নিজে ছট্ফট্ করে মরেছে তবু নাবিক আলমের কাছে সে যেতে পারেনি। কিন্তু ইরুইয়া বন্দরে ফুলওয়ালার দোকানে আলম যখন তাকে শয়তান ফারহু'র কবল থেকে উদ্ধার করে নিলো তখন সমস্ত মান-অভিমান ভুলে গিয়েছিলো নীহার। একটা অভূতপূর্ব অনুভূতি উপলব্ধি করেছিলো সে মনে—আলম তাকে নিশ্চয়ই ভালবাসে।

সেই আত্মবিশ্বাসেই নীহার আজ আবার তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আলম যখন কথা বললো তখন নীহার চট্ করে কোনো সাড়া দিতে পারলো না। নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলো পুতুলের মত মাথা নত করে।

মৃদু হাসলো বনহুর, নীহারের অন্তরের কথা সে জানে। এ ক'দিন নীহার ক্যাবিনে না এলেও তার শ্যেনদৃষ্টি থেকে রেহাই পায়নি সে। লক্ষ্য করেছে বনহুর—গভীর রাতে কার যেন পদশব্দ তার ক্যাবিনের আশেপাশে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। কার নিশ্বাসের শব্দ শুনেছে তার শিয়রে। কোনোদিন আচমকা ঘুম ভেংগে গেছে কোনো এক কোমল হস্তের স্পর্শে, কে যেন আলগোছে হস্তসঞ্চার করেছে তার কেশে। চমকে চোখ মেলেছে বনহুর, কাউকে দেখতে পায়নি। দেখতে না পেলেও বুঝতে পেরেছে—নীহার ছাড়া এ কেউ নয়। নীহারের অন্তরের বেদনা উপলব্ধি করে ম্লান হাসি হেসেছে, নির্বোধ যুবতী নীহার; জানে না সে—কোনোদিন তার কামনা পূর্ণ হবার নয়। প্রেম-প্রীতি-স্নেহ-ভালবাসা কোনোদিন জোর করে আদায় করা যায় না।

একটু নড়ে দাঁড়ালো বনহুর, নিজেকে সচ্ছ করে নেবার জন্যই সে এমনভাবে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, বললো শান্তকণ্ঠে—নীহার, আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেবে?

বনহুরের স্বাভাবিক শান্ত কণ্ঠস্বর নীহারকে আশ্চর্য করলো। একজন সাধারণ নাবিকের গলায় এমন সুর বের হবার কথা নয়। সম্মুখে অবাক হবার মত কিছু দেখলে মানুষ যেমন করে তাকায় তেমনি দৃষ্টি নিয়ে তাকালো নীহার নাবিক আলমের মুখে, হঠাৎ কোনো শব্দ বের হলো না তার ঠোঁট দুটির ফাঁকে।

বনহুর তার বলিষ্ঠ বাহু দুটি বুকের উপর রেখে তাকালো জ্যোৎস্না-প্লাবিত সীমাহীন জলরাশির দিকে। কিছুক্ষণ মৌন থেকে কি যেন ভাবলো, তারপর বললো—এই সুন্দর পৃথিবীতে মানুষ কি চায়? কিসের মোহে মানুষ বাঁচতে চায় বলতে পার?

নীহারের বিস্ময় চরমে উঠে—কি বলতে চায় আলম তাকে? কি-ই বা জবাব দেবে সে আলমের প্রশ্নে! নীহার ঢোক গিললো, সাধারণ এক নাবিক যুবকের কাছে আজ সে বাকহীন হয়ে পড়েছে যেন।

বনহুর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে বললো—মানুষ চায় প্রেম-প্রীতি-স্নেহ-ভালবাসা আর সেই মোহেই আকৃষ্ট হয়ে পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকতে চায়.....থামলো সে।

নীহার নিষ্পলক নয়নে তাকিয়ে আছে বনহুরের দীপ্ত মুখ-মন্ডলের দিকে—তার সমস্ত অনুভূতি যেন লুপ্ত হয়ে গেছে, নির্বাক হয়ে শুনছে ওর কথাগুলো।

বলে চলেছে বনহুর—এসবের কিছু নেই আমার মধ্যে। নীহার, আমি একটা শুষ্ক নারিকেলের ছোবড়ার মতই উচ্ছিষ্ট।

এবার অস্ফুট ধ্বনি করে নীহার—আলম!

হাঁ, জানো না বলেই তো তুমি আমাকে তোমার মনের কোণে স্থান দিয়েছো। যদি আমার ভিতরের কথাটা জানতে.....

না না, আমি কোনো কথা তোমার জানতে চাই না আলম.....নীহার বনহুরের মুখে হাতচাপা দেয়। তারপর বলে—মিথ্যা কথা! মিথ্যা কথা বলছো তুমি। প্রেম-প্রীতি-স্নেহ-ভালবাসা ছাড়া মানুষ কোনোদিন পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারে না। এসব যদি তোমার মধ্যে না থাকবে তাহলে তুমি বেঁচে আছো কি করে?

সেই প্রশ্নই আমি তোমাকে করেছিলাম নীহার। তুমি জানো, আমি বেঁচে আছি কিন্তু আসলে আমি মৃতের চেয়েও অধম। অবাক হচ্ছো আমার কথা শুনে, তাই না?

নীহার নিষ্পলক নয়নে তাকিয়ে আছে, নাবিক আলম বলে কি?

বনহুর এবার রেলিং-এ ঠেশ দেয়—কেন মৃতের চেয়েও অধম জানো? সব বলবো তোমাকে। কারণ মানুষ হয়েও আমি মানুষ নই। মানুষ কোনোদিন পারে না মানুষকে পরিহার করে চলতে। আমি পারি.....বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে বনহুরের কণ্ঠ। নিজকে সংযত করে নেয় বনহুর, একটু কেশে নিয়ে বলে সে—মায়ের একমাত্র সন্তান হয়ে মাকে কোনোদিন সুখী করতে পারিনি। মায়ের চোখের পানি আমাকে কোনোদিন বিচলিত করতে সক্ষম হয়নি। মায়ের স্নেহ আমাকে পারেনি আবদ্ধ করতে। স্ত্রীর প্রেম আমাকে.....

অস্ফুট ধ্বনি করে নীহার—আলম, তুমি বিবাহিত!

হাঁ, আমি বিবাহিত। বিয়ে দিয়ে মা আমাকে গৃহকোণে আটকে রাখতে চেয়েছিলো কিন্তু পারেনি, স্ত্রীর প্রেম আমাকে আকৃষ্ট করতে পারলো না। শুধু তাই নয়, আমার সন্তান আছে। সন্তানের মায়াও আমাকে কোনোদিন চঞ্চল করেনি—নীহার, বলো আমি জীবিত না মৃত?

বনহুর তাকিয়ে দেখলো, নীহারের মুখ ফ্যাকাশে ছাই-এর মত বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। দুলছে নীহার, হয়তো এই মুহূর্তে পড়ে যাবে সে। বনহুর ধরে ফেললো সাবধানে ওকে।

অল্পক্ষণে নিজকে সামলে নিলো নীহার, গন্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রুধারা।

বনহুর বললো—তাই আমি পারি না কাউকে ভালবাসতে বা কারো ভালবাসা গ্রহণ করতে.....

নীহার মাতালের মত টলতে টলতে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, কোনোরকম উক্তিই আর তার মুখ দিয়ে বের হলো না, এগুলো সম্মুখের দিকে।

বনহুর বললো—চলো, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

না, লাগবে না! কথাটা বলে নীহার কোনোরকমে দ্রুত চলে গেলো সেখান থেকে।

বনহুর প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেট-কেস্‌টা বের করে একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলো, তারপর চললো নিজের ক্যাবিনের দিকে।

বনহুর ক্যাবিনের দিকে পা বাড়াতেই আড়াল থেকে সরে গেলো একজন, সে এতোক্ষণ বনহুর আর নীহারের সব কথাবার্তা শুনছিলো। বনহুর ক্যাবিনে প্রবেশ করবার পূর্বেই সে শয়ন করলো নিজ বিছানায়।

বনহুরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে সে আত্মগোপন করতে পারলো না, ক্যাবিনে প্রবেশ করেই বুঝতে পারলো, কেশব এতোক্ষণ কক্ষে ছিলো না, সে এইমাত্র শয্যা গ্রহণ করলো।

বনহুর সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে ডিমলাইট জ্বেলে ফেললো, তারপর শয়ন করে বললো—কেশব, এতোক্ষণ ঘুমাওনি কেন?

নড়ে উঠলো কেশব, ঘুমের ভান করে রইলেও সে ঘুমায়নি জানতে পেরেছেন বাবু; সে নড়েচড়ে বললো—বড্ড গরম বাবু.....

ওঃ তাই ডেকে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলে?

আমতা আমতা করে বললো কেশব—না বাবু, ক্যাবিনের বাইরে যাইনি।

কেশব, আমার চোখে তুমি ধূলো দিতে চাও?

বাবু!

তুমি আড়ালে দাঁড়িয়ে নীহার আর আমার কথাবার্তা শুনছিলে না?

বাবু, আপনার জন্য আমার সব সময় আশঙ্কা, তাই......

পাহারা দিচ্ছিলে আমাকে, তাই না?

ঠিক পাহারা নয় বাবু, দেখছিলাম হঠাৎ কেউ.....

আক্রমণ করে কিনা?

কেশব কোনো কথা বলে না, নিশ্চুপ থাকে। অবশ্য সে কথা মিথ্যা নয়। এ জাহাজে আসার পর বাবু কতবার যে কতরকম বিপদে পড়েছে তার ঠিক নেই। আবার কখন কোন্ বিপদ যে তার জন্য কোথায় ওৎ পেতে আছে তাই বা কে জানে। কেশবের সদা ভয় তার বাবুকে নিয়ে। বোন ফুলকে হারিয়েছে—এখন একমাত্র বাবু তার সম্বল। এ জাহাজে আর কে আছে তার----

কেশব!

বনহুরের ডাকে সম্বিৎ ফিরে আসে কেশবের। ধমমড় করে বিছানায় উঠে বসে বলে—বাবু!

কেশব, তুমি আমাকে অত্যন্ত ভালবাস জানি, কিন্তু আমি বড্ড অপদার্থ, তার প্রতিদানে তোমাকে কিছুই দিতে পারলাম না।

কেশব উঠে এসে বনহুরের হাত দু'খানা চেপে ধরে—বাবু, আপনি যা দিয়েছেন তা আমাকে মানুষ হিসেবে অনেক উপরে তুলে দিয়েছে। আপনি আমাকে কোনোদিন দূরে সরিয়ে দেবেন না।

বনহুর কেশবের কথায় মুগ্ধ হলো বললো—পারবে আমার সঙ্গে দিন কাটাতে?

পারবো।

অনেক কষ্ট হবে আমার সঙ্গে থাকলে।

হোক, সব কষ্ট আমি সহ্য করতে পারবো বাবু।

বেশ, যদি তাই মনে করো থেকো আমার সঙ্গে।

কেশবের মুখ দীপ্তময় হয়ে উঠলো, বললো—বাবু, আজ আমি শান্তি পেলাম!

❑

নীহার একেবারে যেন মুষড়ে পড়েছে। সেই জ্যোৎস্না প্লাবিত রাত্রির কথাগুলো তাকে যেন দুঃস্বপ্নের মতই চঞ্চল করে তোলে। সর্বক্ষণ কি যেন ভাবে, নির্জন ক্যাবিন ছেড়ে বাইরেই আসে না সে আর। নাবিক আলমকে সে নিজের অজ্ঞাতে ভালবেসে ফেলেছিলো, শুধু ভালই বাসেনি, মনের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলো ওকে। কত আকাশ-কুসুম স্বপ্ন যে দেখেছিলো তাকে নিয়ে। কিন্তু কালবৈশাখীর ঝড়ের মত এক নিমিষে সেই রাতে তার মনের সাজানো সৌধ ভেংগে চুরমার হয়ে গেছে।

আবু সাঈদ কন্যাকে হঠাৎ এমন বিমর্ষ আনমনা হয়ে যেতে দেখে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। নীহার এমন তো কোনোদিন ছিলো না। কন্যার মনে আনন্দ ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন।

প্রথমেই বলেছি, আবু সাঈদ সাহেব তাঁর পর্যটনে সব কিছুরই ব্যবস্থা রেখেছিলেন। খেলাধুলো, গান-বাজনা করার জন্য নিপুণ ব্যবস্থা ছিলো। লাইব্রেরীতে ছিলো সবরকম বই পুস্তক, যার যার ইচ্ছামত পড়াশোনা করতে পারতো। টেলিভিশনও ছিলো সন্ধ্যায় ভীড় জমাতো সবাই টেলিভিশন ক্যাবিনে। জাহাজ পর্যটনে আবু সাঈদের সঙ্গিগণের কোনো রকম অসুবিধা যেন না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি ছিলো তাঁর।

নীহার আবু সাঈদের চঞ্চলা কন্যা, ইচ্ছামত সে সমস্ত জাহাজে বিচরণ করে ফিরতো। খেলাধুলো, গান-বাজনায় দক্ষ ছিলো সে। পড়াশুনাও করতো সে যখন ইচ্ছা তখন লাইব্রেরী ক্যাবিনে বসে। সন্ধ্যায় সবার পূর্বে এসে বসতো সে টেলিভিশন ক্যাবিনে।

সেদিনের পর থেকে নীহার এসব ছেড়ে দিয়েছে, সদা বিমর্ষ মনে নিজের ক্যাবিনের মুক্ত গবাক্ষে বসে তাকিয়ে থাকে ফেনিল জলরাশির দিকে।

বনহুর জাহাজের কাজে ব্যস্ত থাকলেও সে লক্ষ্য করেছে— নীহার সেদিনের পর হতে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে, কোনো রকম সাড়াশব্দ নেই তার মধ্যে। যতক্ষণ বনহুর তার ইঞ্জিনের কাজে ব্যস্ত থাকতো ততক্ষণ সে ভুলে থাকতো, তেমন করে কোনো-কিছু ভাববার সময় হতো না। যখনই সে অবসর পেতো তখন মনটা আনচান করতো, কেমন যেন একটা উদাস

ভাব এসে আচ্ছন্ন করে ফেলতো তাকে। মাঝে মাঝে বনহুর টেলিভিশন ক্যাবিনে এসে বসতো বা দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতো। দেশ-বিদেশের সংবাদ পেতো রেডিও আর টেলিভিশনের মাধ্যমে।

আজকাল বনহুর খেলাধুলোর জায়গায় বা লাইব্রেরী ক্যাবিনে কিংবা টেলিভিশন কেবিনে কোথাও নীহারকে দেখতে পেতো না। আবু সাঈদ বা জাহাজের কেউ নীহারের এই নীরবতার কারণ না জানলেও জানতো একমাত্র বনহুর।

কখনও কখনও বনহুর ব্যথিত হতো, নীহারকে সেদিন ওভাবে কথাগুলো না বললেও চলতো, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হতো, বলে সে ভালই করেছে কারণ নীহার ক্রমান্বয়ে তাকে যেভাবে নিবিড়তম আকর্ষণে আকৃষ্ট করে চলেছিলো তাতে অমঙ্গলের আশঙ্কা কম ছিলো না। এখন বনহুর নিশ্চিন্ত মনে কাজ করে চলে, সময়-অসময়ে এসে নীহার তাকে আনমনা করে তোলে না।

ইরুইয়া বন্দর ত্যাগ করার দু'দিন পরই জাহাজ 'পর্যটন' ফৌজিন্দিয়া দ্বীপে পৌঁছানোর কথা ছিলো, কিন্তু হঠাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন এবং রেডিও আবহাওয়া সংবাদে বিপদ-সংকেত জানা যাওয়ায় আবু সাঈদ সাহেব সম্মুখে ছোটখাটো যে-কোন এক বন্দরে জাহাজ নোঙর করার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন। এসব কারণেই পথে কয়েকদিন বিলম্ব ঘটে গেলো।

এখন জাহাজ সোজা ফৌজিন্দিয়া মুখে অগ্রসর হচ্ছে। আকাশ স্বচ্ছ—মেঘমুক্ত। দ্বাদশীর চাঁদ ডুবে গেছে অনেকক্ষণ!

রাত গভীর।

হঠাৎ তীব্র একটা শব্দ সমস্ত জাহাজের আরোহিগণকে সজাগ করে তুললো। শব্দটা যেন দূর দূরান্ত থেকে শোনা যাচ্ছে। ঠিক যেন ট্রেনের ইঞ্জিনের হুইসেলের শব্দ।

যারা জেগে ছিলো তারা ঘুমন্ত জনকে জাগিয়ে দিলো। সবাই কান পেতে শুনতে লাগলো শব্দটা। যদিও বহুদূর হতে ভেসে আসছে তবু তীক্ষ্ণ ছুরিফলার মতই মনে হচ্ছে আওয়াজটাকে।

আবু সাঈদ বুঝতে পারলেন তাঁরা ফৌজিন্দিয়া দ্বীপের অনতি দূরে পৌঁছে গেছেন। তাঁর মুখমন্ডল দীপ্ত হয়ে উঠলো বটে কিন্তু মনের মধ্যে একটা ভীতি ভাব উঁকি দিলো তার সঙ্গে।

পিতার সঙ্গে নীহারও জেগে উঠেছিলো, ভয়-বিহ্বল কণ্ঠে বললো—আব্বা, তোমার সেই শব্দ না?

হাঁ মা, আমরা ফৌজিন্দিয়া দ্বীপের নিকট এসে পড়েছি।

আব্বা, শব্দটা শুনে আমার কেমন ভয় হচ্ছে।

ছিঃ মা ভয় কি! ঐ শব্দটা কিসের জানার জন্যই তো আমাদের আগমন। চলো আমরা ডেকে গিয়ে দাঁড়াই নিশ্চয়ই দ্বীপের সেই অজ্ঞাত আলোকরশ্মি দেখতে পাবো।

সেই মুহূর্তে নাসের ছুটে এলো দূরবীক্ষণ হস্তে, আবু সাঈদ এবং নীহারকে লক্ষ্য করে বললো—আপনারা আসুন, দেখবেন আসুন, দূরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোর টুকরা দেখা যাচ্ছে।

আবু সাঈদ ওভারকোটটা গায়ে জড়িয়ে বললেন—নীহার, চল মা দেখিগে।

নীহারের বুকের মধ্যেও দুরু দুরু করে কম্পন শুরু হয়েছে, ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে তার মুখ; পিতার কথায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্লিপিং গাউনটা গায়ে দিয়ে বললো— চলো আব্বা।

আবু সাঈদ ডেকে এসে দাঁড়ালেন, হুইসেলের শব্দটা একটানা শোনা যাচ্ছে। গভীর রাত্রির নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ভেদ করে কেমন যেন এক ভয়ঙ্কর আতঙ্কময় শব্দ। জাহাজের পর্যটক দল প্রায় সবাই এসে আবু সাঈদের চারপাশ ঘিরে দাঁড়িয়েছেন। যেমন তাঁরা সাহসী তেমনি উৎসাহী কিন্তু সকলের মুখেই যেন একটা ভীতিকর ভাব ফুটে উঠেছে। কেউ কেউ দূরবীক্ষণ চোখে লাগিয়ে দেখছেন। প্রায় সকলেরই ইচ্ছা, জাহাজ আর অগ্রসর না করাই শ্রেয়।

আবু সাঈদ দূরবীক্ষণ চোখে লাগিয়ে দেখলেন—সত্যিই দূরে বহু দূরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোকবিন্দু যেন ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। কখনও বা জ্বলছে কখনও নিভছে। কখনও একেবারে আলোর বিন্দুগুলো মিশে গিয়ে শুধু গাঢ় অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে সব।

আবু সাঈদ বন্ধুর মুখে যা শুনেছিলেন এ যে একেবারে খাঁটি সত্য। তিনি বিস্ময়কর ঘটনা উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে ডেকে পাঠালেন নাবিক আলমকে। আবু সাঈদের দক্ষিণ বাহু যেন ঐ নাবিক আলম। জাহাজে সে না থাকলে তিনি যেন বিব্রত হয়ে পড়তেন।

অন্যদিন হলে নীহার আপত্তি তুলে বসতো, হয়তো বলতো, থাক না আব্বা আলমকে না হলে কি তোমার চলে না? কিন্তু আজ সে নিশ্চুপ রইলো বরং আলমকে না হলে এ বিপদ যেন কাটবে না। অন্ধকারে আলম যেন একটি উজ্জ্বল আলো।

বনহুর জাহাজের ইঞ্জিন-ক্যাবিনে ছিলো, কাজেই সে এই অদ্ভুত শব্দ শুনতে পায়নি এবং আলোকরশ্মি সম্বন্ধেও জানতে পারেনি। ইঞ্জিন-ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে আসতেই এই তীব্র শব্দটা সে শুনতে পেয়ে অবাক হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো, কয়েক মিনিট কান পেতে শুনেওছিলো বনহুর স্তব্ধ হয়ে।

আবু সাঈদের পাশে আসতেই তিনি ব্যস্তকণ্ঠে বললেন— আলম, শুনতে পাচ্ছো?

হাঁ স্যার, শুনতে পাচ্ছি।

তোমার কি মনে হয়?

হঠাৎ বলে উঠে নাসের—আপনি একজন অভিজ্ঞ পর্যটক হয়ে একটা অজ্ঞ নাবিককে জিজ্ঞাসা করছেন এসব কথা? ওকি জানে যে বলবে? আমি বলছি---

নীহার নাসেরের কথায় ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে, রাগতঃ কণ্ঠে বলে—নাসের সাহেব, আপনাকে তো কোনো কথা জিজ্ঞাসা করা হয়নি?

থেমে যায় নাসের, ডেকে অন্ধকারে তাকায় সে নীহারের মুখে ক্রুদ্ধভাবে।

বনহুর বলে—স্যার, আমার মনে হয় শব্দটা কোনো যন্ত্রের নয়।

বলে উঠে নাসের—দেখলেন তো কেমন নিরেট মূর্খ। এমন তীব্র শব্দ তবে কি কোনো মানুষ বাঁশী মুখে নিয়ে ফুঁ দিয়ে করছে?

আবু সাঈদ বললেন—মানুষ তো নয়ই, কিসের শব্দ জানার জন্যই আমাদের আগমন।

বনহুর বললো—স্যার, আমার মতে জাহাজ আজ রাতে এখানেই নোঙর করা উচিত। কাল দিনের আলোতে অগ্রসর হলেই চলবে। কারণ আমরা ফৌজিন্দিয়া দ্বীপের প্রায় নিকটে এসে পড়েছি।

নাসের মনে মনে কম ভীত হয়নি, তবু মুখে সাহস টেনে বললো—স্যার, এতো দূর অগ্রসর হয়ে মাঝপথে থেমে পড়া মোটেই উচিৎ নয়। আমরা কাপুরুষ নই যে ভয়ে মুষড়ে পড়বো।

নাসেরের বীরত্বপূর্ণ কথায় মৃদু হাসলো বনহুর।

আবু সাঈদ নাসেরের কথায় কান না দিয়ে বললেন—আলম, দূরবীক্ষণ চোখে লাগিয়ে দেখো আমাদের আর অগ্রসর হওয়া চলবে কি না? দূরবীক্ষণ যন্ত্রটা বনহুরের হাতে দেন আবু সাঈদ।

আলম আবু সাঈদের হাত হতে দূরবীক্ষণ যন্ত্রটা হাতে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে দেখলো তারপর বললো—স্যার, এক্ষুণি জাহাজ নোঙর করতে হবে। কারণ সম্মুখে আমাদের জন্য নানারকম বিপদ ওৎ পেতে থাকতে পারে।

হাঁ, তোমার কথাই শ্রেয় আলম, জাহাজ নোঙর করতে বলো। নাসের কোনো কথা না বলে চলে গেলো সেখান হতে। বনহুর একবার নীহারের মুখে তাকিয়ে দেখলো তারপর চলে গেলো সে জাহাজে, ইঞ্জিন-ক্যাবিনের দিকে।

জাহাজ 'পর্যটন' মাঝ-সাগরে নোঙর করলো।

রাত্রির অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না তাদের অবস্থান-জায়গা হতে ফৌজিন্দিয়া দ্বীপ কত দূর। এখন সেই তীব্র হুইসেলধ্বনি সম্পূর্ণরূপে থেমে গেছে। কিন্তু দূরে বহু দূরে আলোক রশ্মির টুকরোগুলো তখনও অসংখ্য তারার মত ছুটাছুটি করে ফিরছে। জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে অনেকেই দেখছে এই অদ্ভুত আলোর খেলা।

কিন্তু কতক্ষণ সবাই জেগে কাটাতে পারে, এক সময় যে-যার ক্যাবিনে গিয়ে শুয়ে পড়লো।

একটা নিভৃত কামরায় তখনও চলেছে নাসের আর জলিলের দলের গোপন আলোচনা। যতক্ষণ আলমকে তারা এই জাহাজ থেকে সরাতে না পেরেছে ততক্ষণ তাদের কোনো শান্তি নেই বা নেই কোনো কাজে কৃতিত্ব। মালিক সব সময় সব কাজে শুধু ঐ বেটা নাবিক আলমটাকেই ডাকবেন। একেবারে এ ব্যাপারটা অসহ্যনীয় তাদের কাছে। কাজেই ফৌজিন্দিয়া দ্বীপের বিস্ময়কর এই রহস্য উদ্ঘাটনের পূর্বেই সরাতে হবে ওকে, নাহলে কোনো কৃতিত্বই তাদের হবে না, সব সুনাম দখল করে নেবে ঐ বেটা নাবিক।

রাত গভীর হতে গভীরতম হয়ে আসে।

জাহাজের সবাই নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছে। শুধু গোপন সলা-পরামর্শ চলেছে নাসেরের গোপন কামরায়।

নীচের ক্যাবিনে বনহুর আর কেশব ঘুমিয়ে পড়েছে। তবে বনহুরের নিদ্রা খুব গাঢ় হয়নি, সে একটু তন্দ্রামত হয়ে পড়েছিলো।

আবু সাঈদ কিছুতেই ঘুমাতে পারছেন না, তাঁর মনে নানা-রকম চিন্তার উদ্ভব হচ্ছে। তিনি ঐ শব্দ এবং আলোকরশ্মি নিয়ে গভীরভাবে ভাবছিলেন।

সমস্ত জাহাজ নিস্তব্ধ।

জমাট অন্ধকারে আচ্ছন্ন চারিদিক।

ডেকের উপর কয়েকজন খালাসী শুয়ে আছে কম্বলমুড়ি দিয়ে। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। এমন সময় হঠাৎ একটা তীব্র আর্তনাদ ভেসে এলো জাহাজের ডেক থেকে। রাত্রির জমাট অন্ধকার যেন সে শব্দে ভেঙ্গে পড়লো খান খান হয়ে।

যে যেদিক থেকে পারলো ছুটে এলো ডেকে, আর্তনাদের শব্দটা যেখান হতে ভেসে এসেছিলো সেই জায়গায় এসে দাঁড়ালো, সকলের চোখেমুখেই আতঙ্ক—ব্যাপার কি?

আবু সাঈদ এবং নীহার এসেছেন—আবু সাঈদের হস্তে পিস্তল।

ওদিক থেকে নাসের, জলিল এরাও গোপন সলা-পরামর্শ ভুলে লাঠি,শরকী বল্লম নিয়ে বীর পুরুষের মত হন্তদন্ত হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

বনহুর ও কেশব এসে দাঁড়ালো এক পাশে।

সবাই তাকিয়ে দেখলো, ডেকে যে কয়জন খালাসী শুয়েছিলো তারা থর থর করে কাঁপছে, সকলেরই চোখেমুখে ভয়ঙ্কর ভীতি-ভাব। আবু সাঈদ বললেন উদ্বিগ্ন কণ্ঠে—কি হয়েছে তোদের?

খালাসিগণ কেউ কোনো কথা বলতে পারছে না, কেমন যেন বোবার মত ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে।

ধমক দিলেন আবু সাঈদ—কে আর্তনাদ করেছে?

একজন কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালো, ভয়-বিহ্বল দৃষ্টি নিয়ে বার বার তাকাতে লাগলো ডেকের রেলিং পেরিয়ে সাগরের দিকে।

পুনরায় ধমক দিলেন আবু সাঈদ—ওদিকে কি দেখছিস্?

কাঁপতে কাঁপতে বললো খালাসিটা—হুজুর, হাতির মত মোটা একখানা হাত---

বিস্ময়ে অস্ফুট শব্দ করে উঠলো সবাই, হাতির পায়ের মত মোটা হাত'। সকলের মুখ ছাই-এর মত বিবর্ণ হলো। সবাই নড়েচড়ে সরে এলো ঘনিষ্ঠ হয়ে।

বললেন আবু সাঈদ —একি বলছিস্?

হাঁ হুজুর একটা হাতির পায়ের মত মোটা হাত অন্ধকারে সাগর-মধ্য থেকে উঠে এসে আমাদের একজনকে তুলে নিয়ে আবার ডুব মেরেছে--কথা শেষ না করে ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকে লোকটা।

বনহুর লোকটার কাঁধে হাত রাখে—তুমি সঠিক দেখেছো হাতটা?

হাঁ, দেখেছি। অন্ধকার হলেও আমি স্পষ্ট দেখেছি যে, ইয়া মোটা হাত; জমকালো ভূতের মত দেখতে---

এক দন্ডে জাহাজের ডেক ফাঁকা হয়ে গেলো।

কোথায় বা নাসের আর লাঠিয়াল সর্দার জলিল ও তার দলবল, সবাই যে-যার ক্যাবিনে লুকিয়ে পড়ে আত্মগোপন করলো। চাচা-আপন জান বাঁচা নীতি গ্রহণ করলো।

একটু পূর্বে যে নাসের আর জলিল বনহুরের হত্যার পরামর্শ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো এখন তাদের কারো মুখে কথা নেই। যে-যার ক্যাবিনে প্রবেশ করে খিল এঁটে দিলো।

বনহুর আবু সাঈদ ও নীহারকে ক্যাবিনে পৌঁছে দিয়ে এসে খালাসিদের বিভিন্ন ক্যাবিনে শোবার ব্যবস্থা করে দিলো, তারপর ফিরে গেলো সে নিজের ক্যাবিনে। কিন্তু বাকি রাতটা জাহাজের কারো ঘুম আর হলো না।

সকলের মনেই ভয় আর আতঙ্ক, সবার চোখের সামনে ভাসছে বিরাট মোটা জমকালো একটা হাত।

❑

পরদিন প্রভাতে সূর্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে 'পর্যটন' জেগে উঠলো। জেগে উঠলো পর্যটনের যাত্রিগণ, কিন্তু সকলেরই মুখ ভয়-বিহ্বল আতঙ্কগ্রস্ত। গত রাতের ব্যাপারটা সবাইকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছে।

আবু সাঈদ স্বয়ং সমস্ত রাত আর ঘুমাতে পারেননি। সবচেয়ে বেশি ভয় পেয়েছে নীহার, একেবারে কুঁকড়ে গেছে সে। এতোবড় বীর পালোয়ান লাঠিয়াল দল জলিল, শম্ভু, জম্বু এরাও ভয় পেয়েছে ভীষণভাবে।

জাহাজ 'পর্যটন' ফৌজিন্দিয়া দ্বীপে পৌঁছানোর পূর্বেই এমন অঘটন ঘটবে ভাবতে পারেননি আবু সাঈদ। বিশেষ করে খালাসিগণ মিথ্যা বলেনি, তারা দেখেছে—সত্যিই একটা বিরাট মোটা হাত সাগর-মধ্য হতে উঠে এসে জাহাজের ডেক থেকে একজন ঘুমন্ত খালাসিকে তুলে নিয়ে গেছে।

বনহুরও বাকি রাতটুকু ঘুমাতে পারেনি, গভীরভাবে চিন্তা করেছে—খালাসির ভয়-বিহ্বল কণ্ঠের কথাগুলো নিয়ে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করে দেখেছে। রাতের ঐ হাতখানা —কিসের হাত হতে পারে সেটা? আফ্রিকার জঙ্গলে বনহুর অনেক ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর জীবের কবলে পড়েছিলো। গরিলার লোমশ বাহুও খুব মোটা বটে, তাই বলে সাগরগর্ভে গরিলা বা কিং কং থাকতে পারে না। তবে কি অক্টোপাশের বাহু ছিলো সেটা? বনহুরকে একবার অক্টোপাশের সঙ্গেও যুদ্ধ করতে হয়েছে। সেদিনের কথা মনে পড়লে আজও তার সাহসী মন শিউরে উঠে। কি সাংঘাতিক কি ভয়ঙ্কর সেই নাগপাশের বন্ধন!

বনহুর আবু সাঈদের পাশে এসে দিনের আলোতে দূরবীক্ষণ চোখে লাগিয়ে তীক্ষ্ণভাবে দেখতে লাগলো। দূরে অনেক দূরে কচ্ছপের পিঠের মত উঁচু জমকালো বিরাট একটা কিছু নজরে পড়ছে। ঐ কচ্ছপের পিঠের মত জিনিসটাই হলো ফৌজিন্দিয়া দ্বীপ তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আবু সাঈদ যেখানে দাঁড়িয়ে দূরবীক্ষণ চোখে দেখছিলেন সেই স্থানে জাহাজের প্রায় সবাই এসে ভীড় জমিয়েছিলো—ব্যাকুল আগ্রহে সবাই দেখছে, সকলের মুখেই গভীর উদ্বিগ্নতার ছাপ।

এতো লোক থাকতে আবু সাঈদ নাবিক আলমকে লক্ষ্য করে বললেন—আলম, এখন কি আমাদের এগুনো চলে?

বনহুর বললো—হাঁ স্যার, দিনের আলোতে আমাদের ফৌজিন্দিয়া দ্বীপে অবতরণ করতে হবে।

তাহলে জাহাজ ছাড়ার জন্য বলো—

আচ্ছা স্যার।

হাঁ শোন আলম, তুমি কিন্তু সব সময় আমার সঙ্গে থাকবে, জাহাজের কাজে অন্যান্য নাবিককে লাগিয়ে দাও।

আবু সাঈদ যখন কথা বলছিলেন তখন বনহুরের দৃষ্টি একবার তার অজ্ঞাতেই চলে গেলো নীহারের মুখে, দেখলো নীহার ব্যাকুল আগ্রহে তাকিয়ে আছে তার দিকে। বললো বনহুর—আচ্ছা স্যার, তাই থাকবো।

জাহাজ এবার ফৌজিন্দিয়া দ্বীপ অভিমুখে অগ্রসর হলো। সম্মুখ ডেকে দাঁড়িয়ে স্বয়ং আবু সাঈদ এবং তাঁর পর্যটক সঙ্গিগণ। নাসেরও রয়েছে, সে সব সময় আবু সাঈদের নিকট ঘনিষ্ঠ হয়ে আলাপ-আলোচনা করছে। তার মনোভাব, ফৌজিন্দিয়া দ্বীপের নতুনত্ব আবিষ্কারের কৃতিত্বটা যেন তারই হয়।

আবু সাঈদ কিন্তু নাসেরকে তেমন করে গ্রাহ্যই করছিলেন না। তিনি তাঁর পর্যটকদলকে নিয়ে আলাপ-আলোচনার মধ্যে আলমকেই বার বার এটা-ওটা নিয়ে প্রশ্ন করছিলেন এবং তার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা চলছিলো।

এমন এক অবস্থাতেও আলমের প্রতি নাসেরের ঈর্ষা কমলো না বরং বেড়েই চললো অগ্নিশিখার মত। মুখে-প্রসন্ন থাকার চেষ্টা করলেও মনে মনে ফটমট করতে লাগলো হিংস্র শার্দুলের মত।

নীহার কিন্তু পিতার পাশে থেকে নীরবে সব লক্ষ্য করছিলো, যদিও সে আজকাল একেবারে নীরব হয়ে গেছে তবু পিতার সঙ্গ ছাড়া হয় না। কারণ কখন কি বিপদ এসে পড়ে কে জানে! আলমের সেদিনের কথার পর মন ভেঙ্গে গেলেও তার উপর ভরসা কম ছিলো না নীহারের। এ জাহাজে তাদের কোনো বিপদ ঘটলে এক খোদাতায়ালা আর ঐ আলম ছাড়া কেউ যেন রক্ষার নেই। ওকে দেখলেই নীহারের মন যেন স্ফীত হয়ে উঠে। হৃদয়ের নিভৃত কোণে উঁকি দেয় একটা আশার আলো। এ জাহাজে একমাত্র আলম ছাড়া তাদের আপন জন যেন কেউ নেই।

নীহার ভেবে পায় না, এতো জানার পরও কেন ওকে এতো বিশ্বাস হয়, কেন এত ভাল লাগে। কেনই বা আলমকে পাশে পাবার জন্য মন তার সদা উদগ্রীব থাকে। যতই সে আলমের সান্নিধ্য এড়িয়ে চলতে চায় ততই নিজের কাছে নিজেই পরাজিত হয়। একদিন সে মনের সঙ্গে অনেক তর্ক করেছে কিন্তু জয়ী হতে পারেনি। আলমের প্রতিচ্ছবি মন থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছে কিন্তু আরও গভীরভাবে দাগ কেটে বসেছে। ওকে একটিবার দেখার জন্য ক্যাবিনে ছট্ ফট্ করেছে কিন্তু জোর করে ধরে রেখেছে সে নিজকে।

কিন্তু গত রাতের ঘটনার পর আর পারেনি নীহার ক্যাবিনে আত্মগোপন থাকতে। একরকম বাধ্য হয়েই সে বেরিয়ে এসেছে আলমের সম্মুখে।

সম্মুখে এলেও নীহার কথা বলেনি একটিবারের জন্য আলমের সঙ্গে। ইচ্ছা থাকলেও বলতে পারেনি, একটি দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নীহারের গলা টিপে ধরে।

ঘন্টা কয়েকের মধ্যেই জাহাজ 'পর্যটন' ফৌজিন্দিয়া দ্বীপের সন্নিকটে পৌঁছে গেলো।

জাহাজ নোঙর করা হলো দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। ঐ জায়গাটা কিছু সমতল বলে মনে হলো। অবশ্য নাবিক আলমের মত অনুসারেই জাহাজ নোঙর করা হলো। আবু সাঈদ আলমের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-কৌশলের জন্য মুগ্ধ হলেন।

জাহাজ নোঙর করার পর সবাই ফৌজিন্দিয়া দ্বীপে অবতরণ করলো। রাতের অন্ধকারে দ্বীপটাকে কত ভয়ংকর একটা কিছু মনে হয়েছিলো—দিনের আলোতো সব ভয়-ভীতি দূর হয়ে গেলো। এক এক করে নেমে পড়লো সবাই।

আবু সাঈদ ক্যামেরাম্যান এবং পর্যটকদল সহ ব্যস্তভাবে নেমে পড়লেন, ভুলে গেলেন তখন নীহারের কথা। নীহারও ইচ্ছা করেই চুপচাপ রইলো নিজের ক্যাবিনে।

সবাই অবতরণে ব্যস্ত।

আবু সাঈদ দলবলসহ নেমে গেছেন।

সবাই ভুলে গেলেও বনহুর কিন্তু লক্ষ্য করেছিলো, আবু সাঈদের পাশে নীহার নেই। আলগোছে সে সরে পড়েছিলো কখন, টের পাননি আবু সাঈদ।

বনহুর সোজা নীহারের ক্যাবিনে এসে দাঁড়ালো।

নীহার চেয়ারে বসে তাকিয়েছিলো বাইরের দিকে, পদশব্দে ফিরে তাকালো কিন্তু বনহুরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই পুনরায় চোখ দুটোকে মুক্ত গবাক্ষে নিবদ্ধ করলো।

বনহুর আশে পাশে তাকিয়ে দেখলো কেউ নেই—এগিয়ে গেলো নীহারের নিকটে, কাঁধে হাত রাখলো—নীহার, যাবে না?

বনহুর আজ প্রথম তাকে এভাবে স্পর্শ করলো। উপেক্ষা করতে পারলো না নীহার তাকে, নিজের মাথাটা কাৎ করে ওর হাতের উপরে গন্ডটা রাখলো, তারপর বললো—না যাবো না।

আশ্চর্য কণ্ঠে বললো বনহুর—কেন?

নীহার কোনো কথা না বলে মাথা নীচু করলো।

বনহুর নীহারের চিবুকটা উঁচু করে বললো—একি, তুমি কাঁদছো? নীহারের চোখে পানি দেখে অবাক হলো সে।

নীহার উঠে দাঁড়ালো, নতদৃষ্টি তুলে ধরলো সে বনহুরের মুখে।

বনহুর পারলো না নিজকে সংযত রাখতে, নীহারের চোখের পানি নিজের হাত দিয়ে মুছিয়ে দিয়ে ডাকলো—নীহার।

নীহার হঠাৎ উচ্ছ্বসিতভাবে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বনহুরের বুকে মুখ লুকালো।

বনহুর কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইলো। একি এক সমস্যা তার জীবনে বিপর্যয় শুরু করলো। সে তো কোনো সময় নীহারকে প্রশ্রয় দেয়নি বা তার সান্নিধ্যে আসেনি, যতটুকু পেরেছে ওকে সে প্রথম থেকেই পরিহার করে চলেছে। তবু সে রেহাই পেলো না এই সমস্যা থেকে। বনহুর শান্ত কণ্ঠে বললো—তোমাকে ব্যথা দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। আমাকে ক্ষমা কর নীহার।

আলম---নীহারের ক্রন্দন যেন থামতে চায় না।

বলো? বনহুর স্থির কণ্ঠে বললো।

নীহার বনহুরের হাতের পিঠে নিজের গন্ড রেখে বললো—তোমার দেওয়া ব্যথা আমার জীবনের সম্বল হয়ে থাকবে।

ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরে শোনা যায় নাসেরের কণ্ঠস্বর —নীহার, নীহার--

নীহার দ্রুত হস্তে চোখের পানি মুছে ফেলে সরে দাঁড়ালো।

নাসের এসে দরজায় দাঁড়িয়েছে। নীহারের ক্যাবিনে আলমকে দেখে মুখমন্ডল তার গম্ভীর-কঠিন হয়ে উঠলো, চোখ দুটো দিয়ে যেন অগ্নিশিখা নির্গত হচ্ছে।

বনহুর একবার নাসেরের মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো—আসুন মেম সাহেব।

বনহুর নীহারের অনুরোধেই তাকে নাম ধরে এবং 'তুমি' বলে সম্বোধন করতো কিন্তু লোকসম্মুখে নীহারকে 'মেমসাহেব' আর 'আপনি' বলতো।

বনহুর এক্ষণে এমন ভাব দেখালো সে যেন নীহারকে ডাকতেই এসেছে। নীহারও বললো—চলো আলম।

নাসেরকে সে গ্রাহ্যই করলো না, আলমের সঙ্গে বেরিয়ে গেলো ক্যাবিন থেকে।

নাসের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর গট্ গট্ করে চলে গেলো সে বনহুর আর নীহারের পাশ কাটিয়ে। কোনো কথাই সে আর বললো না তাদের।

নীহারের মন সম্পূর্ণ সচ্ছ না হলেও কিছুটা হাল্কা হয়ে এসেছে, বনহুরের সঙ্গে সে পাশাপাশি অবতরণ করলো ফৌজিন্দিয়া দ্বীপের বুকে।

দূর থেকে ফৌজিন্দিয়া দ্বীপটাকে কচ্ছপের পিঠের মত মনে হলেও এখন তারা দেখলো, দ্বীপটা একেবারে ছোট খাটো বা সমতল নয়। বেশ বড় এবং কয়েক মাইলব্যাপী তার পরিধি।

পর্যটকদলসহ আবু সাঈদ বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়লেন। জাহাজের প্রায় সকলেই দ্বীপে অবতরণ করেছে। নাসেরের দলও বাদ যায়নি।

আলম আর নীহার এগিয়ে যাচ্ছে আবু সাঈদের দলে মিলিত হবার জন্য।

নাসের আর জলিল তাদের হতে বেশ কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছিলো, বললো নাসের জলিলকে লক্ষ্য করে—ফৌজিন্দিয়া থেকে নাবিক আলম যেন ফিরে যেতে না পারে বুঝেছো?

হাঁ ছোট স্যার সে কথা বলতে হবে না। জলিলের মুখটা যেন প্রতিহিংসায় বিকৃত হয়ে উঠলো। পকেট থেকে একটা ছোরা বের করে মেলে ধরলো—এটা দিয়েই ওকে শেষ করবো।

নাসের পিঠ চাপড়ে দিলো জলিলের।

ততক্ষণ দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে আলম আর নীহার।

নীহার অবাক হয়ে দেখছে সব। উঁচুনীচু আর অদ্ভুত টিলার মত সব জায়গাগুলো। কোথাও গাছ-গাছড়া বা কোনো রকম উদ্ভিদ জন্মেনি এখনও। শুধু বালি আর লালচে মাটির স্তূপ।

বনহুর নিপুণ দৃষ্টি মেলে সব লক্ষ্য করছে আর এগুচ্ছে। শরীরে তার স্বল্পদামী নাবিকের ড্রেস। পায়ে মজবুত বুট, মাথায় নাবিকের ক্যাপ। সকলের অজ্ঞাতে বনহুর পকেটে লুকিয়ে নিয়েছে সেদিনের নাসেরের হস্তচ্যুত

সেই রিভলভারখানা। এখনও সেটাতে কয়েকটি গুলীই মওজুদ রয়েছে কারণ একটিও খরচ হয়নি।

নীহার এগুচ্ছে আর এটা-সেটা নিয়ে বনহুরকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করছে। তাকে আজ বনহুর নতুন রূপে দেখতে পাচ্ছে যেন। এমন সচ্ছভাবে নীহার কোনোদিন আলমের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সুযোগ পায়নি, কোনো দ্বিধা নেই যেন আজ ওর মধ্যে।

অনেক দিন পর বনহুর নিজেও আজ বেশ আনন্দ উপভোগ করছে নতুন একটা দ্বীপে নতুন কিছু আবিষ্কারের নেশায় মেতে উঠেছে সে।

চলতে চলতে হঠাৎ বনহুর মাটির উপর বসে একটা কিছু হাতে উঠিয়ে নিলো, নীহার বললো—ওটা কি আলম?

বনহুর জিনিসটা মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করে বললো —এটা একটা ইটের টুকরা বলে মনে হচ্ছে।

হেসে উঠলো নীহার —ওটা এমন আর আশ্চর্যের কি?

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বললো—মানুষের বসবাস থেকে লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে সাগরবক্ষে নিমজ্জিত এক দ্বীপে মানুষের তৈরি ইটের টুকরা কম আশ্চর্য নয়, নীহার।

এতোক্ষণে নীহার বনহুরের ভাবান্তরের কারণ কিছুটা উপলব্ধি করলো। নীহার বনহুরের হাত থেকে ইটের টুকরাটা নিয়ে বললো—বহুকাল আগের ইট হবে, দেখছোনা কেমন অদ্ভুত ধরনের তৈরি?

হাঁ, বহুকাল আগের ইটই বটে! কিন্তু এই দ্বীপে ইট এলো কি করে? বনহুর চলতে শুরু করলো।

নীহার ওকে অনুসরণ করছে।

বললো বনহুর—চলো এবার তোমার আব্বার কাছে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

কেন, তোমার কি কোনো অসুবিধা হচ্ছে?

হেসে বললো বনহুর—আমার নয় তোমার হচ্ছে হয়তো। তাছাড়া শুধু অসুবিধা নয় নীহার, তোমাকে এতোক্ষণ না দেখে তোমার আব্বা হয়তো উদ্বিগ্ন হয়েছেন।

চলো তাহলে---বিমর্ষ কণ্ঠে বললো নীহার।

বনহুর বললো —দ্বীপটা সত্যি অদ্ভুত।

আমার কিন্তু খুব ভাল লাগছিলো। কি সুন্দর সকাল, চলো না একটু বসি ওদিকে।

উঁ, কি বললে?

বললাম ঐ উঁচু টিবিটার উপর একটু বসি, পা ধরে গেছে আমার।

বেশ চলো।

বনহুর আর নীহার সামনের উঁচু একটা জায়গা দেখে বসে পড়লো। সেখান থেকে বেশ কয়েক হাত দূরে নীচে সমুদ্রের ঢেউগুলো ছুটে এসে আছাড় খেয়ে আবার ফিরে যাচ্ছে।

সেদিকে তাকিয়ে বললো নীহার—আলম, তোমার মা-স্ত্রী সন্তান কি জীবিত আছে?

হাঁ তারা জীবিত।

একটা দীর্ঘশ্বাস গোপনে ত্যাগ করে বললো নীহার—আলম, তোমার জননী সৌভাগ্যবতী মা—সত্য তিনি রত্নগর্ভা। আর তোমার স্ত্রী গৌরবান্বিতা নারী, তোমার মত স্বামী যার সে যে বড় গর্বিতা--

হেসে উঠলো বনহুর—নীহার তুমি ভুল বলছো। আমার সান্নিধ্যে যে এসেছে যে শুধু ব্যথা আর দুঃখই পেয়েছে। তোমাকে সেদিন কি বলিনি আমার মা, আমার স্ত্রী—এদের মত ভাগ্যহীনা নারী এ পৃথিবীতে আর কেউ নেই।

আলম, আমি বিশ্বাস করি না তোমার একথা। আমি জানি, তুমি কোনোদিন মাকে কষ্ট দিতে পারো না। আমি জানি তোমার মত স্বামী পেয়েও কোনো নারী অসুখী হতে পারে না---

নীহার, তোমার কথা সত্য কিনা আমি জানি না, কারণ কারো মন নিয়ে ভাববার সময় আমার হয় না। আমি যতটুকু জানি, তাতে মনে হয় ওরা কেউ সুখী বা আনন্দিত নয়। জানো নীহার, আমি যার কাছে যখন গিয়েছি একটু আনন্দ নিতে সেই আমাকে উপহার দিয়েছে অশ্রু। অশ্রু ছাড়া আমি কারো কাছে আনন্দ খুঁজে পাইনি। বলো— বলো নীহার তাহলে আমি কি করে জানবো তারা আমাকে পেয়ে খুশি বা সুখী।

বনহুরের মুখে তন্ময় হয়ে তাকায় নীহার, তার কথাগুলো ঠিক গভীরভাবে বুঝতে পারেনা।

বনহুর নীহারের মনকে সচ্ছ করার জন্য অন্য কথা পাড়ে—এখানে এভাবে বসে সময় নষ্ট করা উচিৎ নয়, চলো ওঠা যাক্।

চলো! উঠে পড়ে নীহার আর বনহুর।

হঠাৎ পিছন ফিরতেই একটা ফাটল নজরে পড়লো বনহুরের। এগিয়ে গিয়ে ফাটলটার মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখতে লাগলো সে, বেশ বড়সড় ফাটলটা। ঠিক কোনো সিঁড়ির ধাপ ছিলো পূর্বকালে। ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলো, ফাটলটার মুখ বালি আর মাটিতে বন্ধ হয়ে গেছে। বনহুর অনেক্ষণ লক্ষ্য করলো ফাটলটা গভীর মনোযোগ সহকারে, তারপর বললো—নীহার,

এ দ্বীপটা কোনোকালে লোকালয় ছিলো, এই দেখো ফাটলের মধ্যে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে কয়েকটা সিঁড়ির ধাপ।

হাঁ, ঠিক সেইরকম মনে হচ্ছে কিন্তু।

চলো দেখি, তোমার আব্বা এবং ওরা নিশ্চয়ই কিছু আবিষ্কার করে ফেলেছেন।

বনহুর আর নীহার চলতে লাগলো।

বনহুরের কথাগুলো এখনও নীহারের কানে ভাসছে যেন। ---আমার সান্নিধ্যে যে এসেছে সে শুধু ব্যথা আর দুঃখই পেয়েছে। যার কাছে যখন গিয়েছি এতোটুকু আনন্দ নিতে, সেই আমাকে উপহার দিয়েছে অশ্রু। অশ্রু ছাড়া আমি কারো কাছে আনন্দ খুঁজে পাইনি।---নীহারের মন করুণায় ভরে উঠে, সত্যি আলম বড় অসহায়। কি করে ওকে সুখী করা যায় ভাবতে লাগলো সে। আলম কি পেলে আনন্দ পাবে, কি চায় সে?---

হঠাৎ নীহারের চিন্তাধারায় বাধা পড়ে, কয়েকজন লোক-সহ আবু সাঈদ এদিকেই এগিয়ে আসছেন, আলম আর নীহারকে দেখে তাদের সম্মুখে এলেন, কন্যাকে সম্বোধন করে বললেন—এই যে মা এসে গেছো? তবে যে নাসের বললো আলম তোমাকে নিয়ে অন্যদিকে চলে গেছে?

নীহার একবার নাসেরের দিকে ক্রুদ্ধদৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে বললো—আলম আলম আমাকে নিয়ে যায়নি আব্বা, আমিই আলমকে সঙ্গে করে দ্বীপের ওদিকটা দেখছিলাম।

ও তাই বলো। এসো আলম, হাঁ নতুন কিছু দেখলে ওদিকে?

হাঁ স্যার দেখেছি এবং আমি একটা স্থির সিদ্ধান্তেও পৌঁছেছি।

বলো কি আলম? আমরা এতোদূর অগ্রসর হলেও এখনও এ দ্বীপ সম্বন্ধে কোনোরকম কিছু আবিষ্কারে সক্ষম হলাম না। আচ্ছা বলো দেখি কি ব্যাপার?

স্যার, আমি ওদিকে একটা ইটের টুকরা কুড়িয়ে পেয়েছিলাম।

ইটের টুকরা!

হ্যাঁ স্যার।

নাসের বলে উঠলো—এ আবার এমন কি জিনিস?

বলো কি নাসের, এইরকম মনুষ্যবিহীন দ্বীপে ইটের টুকরা কম কথা।

অন্য একজন বলে উঠলো—কোনো জাহাজ থেকে হয়তো ইটের টুকরাটা দ্বীপে নিক্ষেপ করা হয়ে থাকবে।

নাসের লোকটার কথায় সায় দিয়ে বলে উঠলো—হাঁ, আমারও ঐরকম মনে হয়।

বনহুর নিশ্চুপ রইলো কারণ সে তর্ক ভালবাসে না।

নীহার বললো এবার—শুধু ইটের টুকরাই নয় আব্বা, এই অল্প সময়ে আলম এমন একটা জিনিস আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছে যা আপনারা এখনও পারেননি।

আবু সাঈদ হাস্যোজ্জ্বল দীপ্তমুখে তাকালেন।

বললো নীহার—আরও পরে বলবো, তার পূর্বে তোমরা কি আবিষ্কার করেছো দেখি?

এখনও তেমন কিছু আবিষ্কারে সক্ষম হইনি মা, তবে দ্বীপটা বড় আশ্চর্য এবং অদ্ভুত। কোথাও কোন বন-জঙ্গল বা আগাছা জন্মায়নি আজও। শুধু বালি আর মাটি। হাঁ আজ বেশিক্ষণ এ দ্বীপে বিলম্ব করা উচিৎ নয়।

নীহার এবং আলম সম্পূর্ণ গোপন করে গেলো সেই ফাটলে সিঁড়ির ধাপের কথা।

সেদিন বেশিক্ষণ দ্বীপে বিলম্ব না করে সবাই ফিরে এলো জাহাজে। কারণ নতুন দ্বীপ, তাছাড়া নানারকম বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে।

নীহার পিতার নিকটেও কোনোরকম কিছু বললো না। আলম বলেছিলো প্রথমে সে দেখবে ঐ সিঁড়ির ধাপের নীচে কি আছে। কাজেই এ ব্যাপারে নিশ্চুপ রইলো সে।

দ্বীপে রাতে কিসের আলো দেখা যায়, কিসের শব্দ শোনা যায়, জানার বাসনায় উদগ্রীব রইলো সবাই। দ্বীপের অনতিদূরে জাহাজ নোঙর করে রাখা হলো। গতরাতে একজন খালাসি নিরুদ্দেশ হয়েছে, কাজেই সকলের মনেই আতঙ্ক—আজ রাত কেমন কাটবে কে জানে!

প্রত্যেকেই রাত্রির জন্য প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছে।

আবু সাঈদ জানেন, এ দ্বীপে এমন কিছু আছে যার জন্য এ দ্বীপ সম্বন্ধে আজও কেউ সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ নয়। মনের মধ্যে নানারকম চিন্তাধারা নিয়ে রাত্রির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন আবু সাঈদ এবং জাহাজের সবাই।

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে আসতে লাগলো। অজানা দ্বীপটা ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে এলো, জাহাজের ডেকেও নেমে এলো গভীর অন্ধকার।

পর্যটকগণ প্রত্যেকেই যার যার ক্যাবিনে আশ্রয় নিলেন। নাসের আবু সাঈদের পাশে পাশে রইলো তার লাঠিয়াল সর্দার জলিলকে নিয়ে। কারণ কোনো বিপদ দেখা দিলে লাঠিয়াল পাহারাদারগণ যেন তাদের রক্ষার্থে এগিয়ে আসতে পারে। বিশেষ করে আবু সাঈদের সন্তুষ্টির কারণে মনোযোগী হয়েছে নাসের।

সন্ধ্যার পরই খাওয়া-দাওয়া পর্ব চুকিয়ে নেয় সবাই। আবু সাঈদ সাহেবের নির্দেশে সকলে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইলো।

রাত বেড়ে আসছে।

সমস্ত জাহাজ নিস্তব্ধ।

যার-যার ক্যাবিনে সবাই স্তব্ধ নিশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে, কিন্তু সকলের দৃষ্টিই রয়েছে শার্শীর মধ্য দিয়ে অদূরস্থ দ্বীপটার দিকে। রাত্রি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্বীপটা জমাট অন্ধকারে গাঢ় হয়ে উঠেছে।

আবু সাঈদ দূরবীক্ষণ চোখে লাগিয়ে দেখেছেন, পাশে দাঁড়িয়ে নাসের—তার হস্তেও একটি দূরবীক্ষণ।

জলিল এবং আরও কয়েকজন লাঠিয়াল ক্যাবিনের সম্মুখস্থ ছোট ক্যাবিনটার মধ্যে বসে বসে বিড়ি ফুঁকছে। ক্যাবিনের দেয়ালে ঠেশ দিয়ে রেখেছে তাদের লাঠি আর শরকীগুলো।

যে-যার ক্যাবিনের কাঁচের মধ্য দিয়ে তাকিয়ে দেখছে, দ্বীপের আলোগুলো কখন জ্বলে উঠে।

বনহুর রিভলভার হাতে ক্যাবিন থেকে বাইরে বের হতে যাচ্ছিলো, কেশব পথরোধ করে দাঁড়ালো—বাবু, জাহাজের ডেকে একটি প্রাণীও নেই, আমি আপনাকে যেতে দেবো না।

হেসে বললো বনহুর—দ্বীপের রহস্য ভেদ করতে এসে সবাই যদি আমরা ক্যাবিনের মধ্যে লুকিয়ে থাকি, তাহলে রহস্য উদ্ঘাটন হবে কি করে? যেতে দাও কেশব।

তাহলে আমিও যাবো আপনার সঙ্গে?

বেশ তাই চলো। আবু সাঈদ সাহেব তোমাকে দেহ রক্ষার্থে যে বন্দুক দিয়েছেন ওটা তাহলে সঙ্গে নিয়ে নাও।

কেশব এবার খুশি হলো বনহুরের কথায়, সে দ্রুত তার বন্দুকটা নিয়ে বললো—চলুন বাবু।

বনহুর আর কেশব ক্যাবিন থেকে যখন বাইরের ডেকে বেরিয়ে এলো তখন অন্ধকারে কে যেন সম্মুখে এসে দাঁড়ালো তাদের।

বনহুর বললো —কে?

আমি! চাপা একটা কণ্ঠস্বর।

তুমি কে?

ফুলমিয়া!

ফুলমিয়া?

হাঁ।

এখানে কি করছিলে?

কিছু না। কেমন যেন সঙ্কোচিত কণ্ঠস্বর।

বনহুর বললো—আমাকে হত্যা করতে এসেছিলে বুঝি?

ফুলমিয়ার গলা থেকে প্রথমে কোনো কথা বের হলো না, অন্ধকারেও তার চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো, বললো সে—বাবু! বাবু আপনাকে হত্যা করবো আমি! আপনি আমার জীবন রক্ষা করেছেন--কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে ফুলমিয়ার।

বলে বনহুর—তবে কি জন্য এসেছিলে ফুলমিয়া?

বাবু, শুধু আজ নয়, আমি রোজ রাতে আপনার ক্যাবিনের দরজায় পাহারা দেই।

হেসে বললো বনহুর—কেন?

বাবু, এ জাহাজে আপনার শত্রুর অভাব নেই।

তা জানি, কিন্তু তুমি---

বাবু ঐ দিন সিঁড়ির মুখ নষ্ট করে দিয়েছিলো ওরা আপনাকে বাঁচানোর জন্যই আমি জেনে শুনে সিঁড়িতে পা দিয়েছিলাম--

বলো কি ফুলমিয়া!

হাঁ বাবু, আমাদের লাঠিয়াল সর্দার ছোট স্যারের যুক্তিতে আপনার পিছু লেগেছে।

সব জানি, তোমাকে বলতে হবে না ফুলমিয়া। যাও এভাবে বাইরে থাকা তোমার কোনোমতেই ঠিক নয়। হঠাৎ কোনো বিপদ ঘটতে পারে।

ফুলমিয়া মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলো।

বনহুর বললো—চলো তোমার ক্যাবিনে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি, রাত দুটো বেজে গেছে, বাইরে কেউ নেই।

ফুলমিয়াকে ক্যাবিনে রেখে ফিরে চললো বনহুর আর কেশব। নির্জন ডেকে একটিও জনপ্রাণী নেই, প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্যাবিনে আত্মগোপন করে বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা করছে।

সাগরবক্ষ অমাবস্যার অন্ধকারের মতই কালো। ডেকের উজ্জ্বল আলোকরশ্মিও কেমন নিষ্প্রভ ম্লান লাগছে।

বনহুর আর কেশব পাশের ডেকে এসে দাঁড়ালো, বনহুরের হস্তে রিভলবার আর কেশবের হাতে বন্দুক। ডেকে দাঁড়িয়ে তাকালো তারা দু'জন ফৌজিন্দিয়া দ্বীপের দিকে—বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলো বনহুর আর কেশব। দেখতে পেলো, কতকগুলো নীলাভ আলোর বল দ্বীপটার বুকে ছুটোছুটি করছে।

কেশব ভীতকণ্ঠে বললো—বাবু, ভূতের আলো---

বনহুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে সত্যি আলোগুলো যেন কোনো অদৃশ্য হস্তের উপর নড়াচড়া করছে। আলোগুলো আকারে ছোটবড় অনেক রকম কিন্তু প্রায় সবগুলোই নীলাভ।

এই তো ঘন্টাকয়েক আগেও তারা ঐ দ্বীপে বিচরণ করে ফিরেছে কিন্তু কোথাও তো কিছু দেখতে পেলো না।

বনহুর যখন ডেকে দাঁড়িয়ে আলোর খেলা দেখছে তখন কেশব ভয়বিহ্বল কণ্ঠে বললো—বাবু, বাইরে থাকবেন না।

বললো বনহুর—কেন?

বাবু, ভূতেরা অশরীরী—ওদের আমরা দেখতে না পেলেও ওরা আমাদের ঠিক দেখতে পাচ্ছে। হঠাৎ এদিকে এসেও পড়তে পারে।

হাতে অস্ত্র থাকতে কোনো ভয় নেই কেশব।

বাবু, অস্ত্র ভূতের কিছু করতে পারে না, ওদের তো দেহ নেই। দেখছেন না আলোগুলো কেমন শূন্যের উপর যেন নেচে বেড়াচ্ছে। দেহ থাকলে তো গুলী ছুঁড়বেন?

বেশ চলো, তোমার যখন এতো ভয়! বনহুর কথাটা বলে ফিরে দাঁড়াতেই দু'জন লোক এসে দাঁড়ালো তার পাশে। একজন বললো—স্যার আপনাকে ডাকছেন।

বনহুর বুঝতে পারলো, দ্বীপের আলোকরশ্মির ব্যাপারেই তাকে ডাকছেন আবু সাঈদ, বললো—চলো।

কেশব বললো—বাবু, আমিও যাবো আপনার সঙ্গে।

বেশ চলো। বনহুর অগ্রসর হলো।

বনহুরের পিছনে চললো কেশব আর ঐ লোক দু'জন।

কেশব যেমন ভয়ে কুঁকড়ে গেছে তেমনি লোক দু'টিও ভয়ে এতোটুকু হয়ে গেছে যেন, মুখে যেন কারো কথা সরছে না। মালিকের হুকুম বলেই লোক দু'টি এই ভীতিকার মুহূর্তেও বাইরে বেরিয়ে এসেছে আলমকে ডাকতে। কোনোরকমে পৌঁছতে পারলে তবে হয়। লোক দু'টি এবং কেশব বার বার ভয়াতুর দৃষ্টি মেলে তাকাচ্ছিলো দূরে দ্বীপের বুকে আলোর বলগুলোর দিকে। এখন আরও বেড়ে গেছে যেন।

বনহুর কেশব, আর লোক দু'জন আবু সাঈদের ক্যাবিনে এসে হাজির হলো।

আবু সাঈদ কক্ষমধ্যে উদ্বিগ্ন মুখে পায়চারি করছেন। অদূরে কাচের শার্শীর পাশে দাঁড়িয়ে নীহার এবং আরও বেশ কয়েকজন লোক। তাদের মধ্যে নাসেরও আছে দেখতে পেলো বনহুর। নাসেরের মুখেও ভীতির ভাব। কেমন যেন বিবর্ণ ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে সবাইকে।

বনহুর, কেশব আর লোক দু'টি ক্যাবিনে প্রবেশ করতেই আবু সাঈদ দাঁড়ালেন, এগিয়ে এলেন বনহুরের পাশে—দেখেছো আলম?

বললো বনহুর—হ্যাঁ স্যার।

কিসের আলো বলে তোমার মনে হয়?

বনহুর কিছু বলবার পূর্বেই বলে উঠে কেশব—স্যার, ওগুলো ভূতের আলো ছাড়া কিছু নয়। দেখছেন না আলো গুলো কেমন শূন্যের উপর নড়াচড়া করছে। ভূত অশরীরী কিনা, তাই ওদের দেখা যায় না, শুধু ওদের মুখের আগুন দেখা যায়।

নীহার তো পিতার পাশে কুঁকড়ে দাঁড়িয়েছে, ভয়ে বিবর্ণ তার মুখমন্ডল। কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয়ের জন্য মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে সে নাবিক আলমের মুখে। ভূতের নামে তার হৃদকম্প শুরু হয়েছে, দেহটাও কাঁপছে বলে মনে হচ্ছে।

নাসেরের মুখেও অসহায় ভাব ফুটে উঠেছে। সেও ক্রমান্বয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে এসেছে তাদের পাশে।

আবু সাঈদ বললেন—বাজে কথা, ভূত বলে কিছু নেই।

বললো বনহুর—স্যার, ভূত না থাকলেও এমন কোনো জিনিস ঐ দ্বীপে আছে যাদের শক্তি ভূতের শক্তির চেয়েও বেশি।

বনহুর কথাটা এমন করে বললো যাতে কক্ষমধ্যে সকলের মনে ভীতি-ভাবটা আরও দৃঢ় হয়।

আবু সাঈদ বললেন—তবে কি কোনো---

হাঁ স্যার, কোনো অশরীরী আত্মা ছাড়া এমন আলো কে জ্বালতে পারবে বলুন? দেখছেন না আলোগুলো কেমন নীলাভ?

আবু সাঈদ আলমের মুখে কথাটা শুনে একটু হকচকিয়ে গেলেন, কারণ তিনি কোনো ভূত-প্রেত বা অশরীরী আত্মা বিশ্বাস করেন না। শুধু আবু সাঈদ কেন, ক্যাবিনে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যারা এসব কোনোদিন কানেও নেননি বা নেন না। নাসেরের তো কোনো কথাই নেই, সে কোনোদিন কোনো সময় এসব বিশ্বাস করে না। আজ এমন এক মুহূর্তে কথাটা তাদের কানে গেলো যখন তারা দিনকে রাত আর রাতকে দিন বললেও বিশ্বাস করে বসতো।

আলমের কথায় কারো মুখে কোনো উক্তি উচ্চারণ হলো না। সবাই একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরে কোনো এক ক্যাবিনের মধ্য হতে ভেসে এলো তীব্র ভয়ার্ত একটা আর্তনাদ। পরক্ষণেই পরপর বন্দুকের আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেলো-বাঁচাও বাঁচাও গেলো গেলো---

ভয়ে থর থর করে কাঁপছে সবাই, এমনকি আবু সাঈদের মুখমন্ডলও ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে।

নাসের এবার বনহুরের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার মুখও ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে।

বনহুর কান পেতে শুনছিলো, বললো—নিশ্চয়ই গত রাতের সেই হস্ত আজ আবার কাউকে টেনে নিয়ে গেছে--

আবু সাইদ আতঙ্কিত কণ্ঠে বললেন—একি আজগুবি কান্ড শুরু হলো আলম?

তাই তো ভাবছি স্যার। পরক্ষণেই বনহুর পা বাড়ালো ক্যাবিনের দরজার দিকে—স্যার দেখে আসি---

আবু সাঈদ বাধা দিলেন—আলম, এখন যেও না। যেও না বাইরে--

বনহুর আবু সাঈদের নিষেধ শোনার জন নয়, তার ধমনির রক্ত তখন উষ্ণ হয়ে উঠেছে।

নীহার হঠাৎ আচমকা ধরে ফেললো বনহুরের জামার পিছন অংশটা—আলম, যেও না।

এবার বনহুর দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলো, ফিরে দাঁড়িয়ে বললো—বাধা দিবেন না মেম সাহেব। ছেড়ে দিন আমাকে।

না না, তুমি যেও না আলম। বললেন আবু সাঈদ।

নীহার বনহুরের জামার অংশ আরও দঢ়হস্তে চেপে ধরলো—আমি তোমাকে যেতে দেবো না।

রাগতকণ্ঠে বললো বনহুর—সমস্ত মাটি করে দিলেন আপনারা! আবু সাঈদের দিকে লক্ষ্য করে বললো আবার —এতো ভীতু হলে কোন রহস্যই উদঘাটন হবে না। ছেড়ে দিন আমাকে---

নীহারের শিথিল হাতখানা আস্তে খসে এলো, বনহুরের জামার অংশ মুক্ত হওয়ায় সে দ্রুত বেরিয়ে গেলো। কেশবও অনুসরণ করলো বনহুরকে।

আবু সাঈদ নাসেরকে লক্ষ্য করে বললেন—যাও নাসের, জলিলকে বলো লাঠিয়ালদের সবাইকে নিয়ে আলমের সঙ্গে যেতে--

নাসের ভয়-বিহ্বলভাবে তাকলো লাঠিয়াল সর্দার জলিলের দিকে।

জলিল বললো—স্যার, এ সব ভূতের ব্যাপার, লাঠিতে কিছু হবে না---

ধমক দিলেন আবু সাঈদ —যাও, কোনো কথা বাড়িও না।

অগত্যা জলিল আবু সাঈদের ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে গেলো, সম্মুখের একটা ক্যাবিনে অপেক্ষা করছিলো তার দলবল, মালিকের হুকুম—না গেলেও নয়। জলিলের দল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বের হলো বটে কিন্তু এক পা এগোয় তো তিন পা পিছোয়।

ওদিকে বনহুর আর কেশব দ্রুত পৌঁছে গেলো যেদিক থেকে আর্তনাদের শব্দ ভেসে আসছিলো সেইদিকে।

নিকটে পৌঁছতেই বিস্মিত হলো বনহুর—একটা ক্যাবিনের ভিতর হতেই আর্তনাদের শব্দ বেরিয়ে আসছিলো। বনহুর ক্যাবিনের দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকলো—দরজা খোল, দরজা খোল---

অনেক ডাকাডাকির পর দরজা খুলে গেলো।

বনহুর আর কেশব ভিতরে প্রবেশ করে প্রথমে কিছু বুঝতে পারলো না, জিজ্ঞাসা করলো সে—কি হয়েছে?

হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলো একজন —ঐ দেখো, ঐদিকের শার্শী ভেঙ্গে একজনকে নিয়ে গেছে। সেকি ভয়ঙ্কর মোটা কালো একখানা হাত--

বলো কি, হাত?

অন্যান্য সবাই বললো এক সঙ্গে—হাঁ ঠিক হাতের মত।

অন্য একজন ভীতকণ্ঠে বললো—হাতের মত কিন্তু হাত নয় ভাই, হাতির শুঁড়ের মত দেখতে--

আর একজন বললো—যেমন মোটা তেমনি কালো।

ওদিকে একজন ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিলো সরে এলো সামনে —ভই আমি স্পষ্ট দেখেছি, দুটো চোখ আছে—যেন আগুনের গোলা---ওরে বাবা, ভাগ্যিস আমাকে তুলে নেয়নি বাচ্চু ঠিক্ আমার পাশেই শুয়েছিলো ওকে ধরে নিয়েই সড় সড় করে বেরিয়ে গেলো সুঁড়টা ভাঙ্গা শার্শী দিয়ে---

প্রথম ব্যক্তির হস্তে বন্দুক ছিলো সে বললো—আমি তাড়াতাড়ি গুলী ছুঁড়লাম, কিন্তু ততক্ষণে বাচ্চুকে নিয়ে শুঁড়টা অন্ধকারে পানির মধ্যে তলিয়ে গেছে---

বনহুর দ্রুত ভাঙ্গা শার্শীর মধ্য দিয়ে ঝুঁকে পড়লো কিন্তু গাঢ় অন্ধকার ছাড়া কিছুই নজরে পড়লো না।

ততক্ষণে আবু সাঈদ আরও কয়েকজন সঙ্গী-সাথী নিয়ে ভয়চকিত চিত্তে হাজির হলেন, তাঁর পিছনে নাসের এবং জলিলসহ লাঠিয়ালগণ।

সব শুনলেন এবং দেখলেন আবু সাঈদ। বাচ্চু নাবিকদের একজন ছিলো, দক্ষ কর্মঠ নাবিক ছিলো সে।

আবু সাঈদ একেবারে যেন বিহ্বল হয়ে পড়লেন। অন্যান্য সকলের মনেই ভয় আর আতঙ্ক—না জানি কোন্ মুহূর্তে কার মৃত্যু ঘটতে পারে!

খালাসি এবং নাবিকদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিলো, তারা আর এ দ্বীপে একটি দিনও থাকতে রাজি নয়। পয়সার জন্য তারা জীবন দিতে পারবে না। হতো যদি কোনো অসভ্য জংলী বা বাঘ ভল্লুকের আক্রমণ তবু তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতো এবং লড়াই করে তবে মরতো। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর মৃত্যু তারা গ্রহণ করতে চায় না।

আজকের রাতটাও কাটলো নানা উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে। সমস্ত রাত কেউ ঘুমাতে পারলো না।

ভোর হতেই সবাই ধরে বসলো, এবার তারা ফিরে যেতে চায়। গত প্রভাতে একজনকে হারিয়েও খালাসিদের মনে ছিলো অফুরন্ত উৎসাহ আর আজ ঠিক্ তার বিপরীত—সবাই মুখ কালো করে ফেলেছে, কেউ আর দ্বীপে অবতরণে সম্মত নয়।

আবু সাঈদ হৃদয়ে এতোদিন যে একটা চূড়ান্ত জানার বাসনা নিয়ে বিপুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলেন, সব যেন আজ প্রভাতে নিঃশেষ হয়ে যায়। খালাসি এবং নাবিকদের নিরুৎসাহ ভাবভঙ্গী তাঁকে একেবারে হতোদ্যম করে দেয়। তিনি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েন, তাঁর আদেশও অমান্য করেছে আজ তাঁর বিশ্বস্ত কর্মচারিগণ।

বেলা বেড়ে আসছে। ক্রমেই হতাশ হয়ে পড়ছেন আবু সাইদ, এখন কি করবেন—এতোদূর এসে এতো অর্থব্যয় করে শেষ পর্যন্ত বিফলকাম হয়ে ফিরে যাবেন! শুধু অর্থব্যয়ই নয় পথে অনেক বিপদ-আপদ গেছে কয়েকটি জীবনও বিনষ্ট হয়েছে, এতো হওয়ার পর ফিরে যাওয়া কেমন যেন একটা চরম পরাজয়--চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়লেন আবু সাঈদ।

আবু সাঈদ যতই মুষড়ে পড়ছেন ততই জাহাজে কর্মচারীবৃন্দ বেঁকে বসছে, কেউ আর একটি দিন এ দ্বীপে রাত্রি কাটাতে রাজি নয়।

শেষ পর্যন্ত আবু সাঈদ প্রচুর অর্থের লোভ দেখালেন, যা টাকা তাদের দেওয়া হয় তার দ্বিগুণ পরিমাণ দেওয়া হবে। কিন্তু কিছুতেই তারা এ দ্বীপে অবতরণে সম্মত হলো না।

আবু সাঈদ যখন হতাশায় ভেঙ্গে পড়েছেন তখন বনহুর তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালো—স্যার, ভাববেন না! চলুন আমি যাবো আপনার সঙ্গে।

আলম!

হাঁ স্যার। আর যতদিন আমাদের সন্ধান-কার্য শেষ না হবে ততদিন জাহাজ এ দ্বীপেই থাকবে।

আবু সাঈদ কথাটা ঘোষণা করে জানিয়ে দিলেন জাহাজের সবাইকে।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত খালাসি এবং নাবিকগণ বিদ্রোহী হয়ে উঠলো, সবাই দল বেঁধে এসে দাঁড়ালো আবু সাঈদের ক্যাবিনের সম্মুখে, সমস্বরে বললো সবাই—আমরা আর এক দিনও এ দ্বীপে অবস্থান করতে রাজি নই।

আবু সাঈদ অসহায়ভাবে তাকালেন বনহুরের মুখের দিকে, বললেন—এখন উপায়?

নীহারও পিতার পাশে দাঁড়িয়েছিলো এখন তাদের একমাত্র ভরসা যেন নাবিক আলম। জাহাজের সকলের মুখই ভয়-বিহ্বল, এমন কি আবু

সাঈদের সঙ্গী-সাথী যারা এতোদিন তাঁর একান্ত বন্ধু হিসাবে পর্যটন জীবনের সহচর ছিলেন তাঁরাও সবাই কেমন যেন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন, কারো মনেই যেন আর উৎসাহ-উদ্দীপনা নেই। সবাই আবু সাঈদের কথায় অমত জানিয়ে ফিরে যাবার বাসনা জানাচ্ছেন কারণ সকলেরই তো স্ত্রী-পুত্র-সন্তান-সন্ততি আছে, কে এভাবে মরতে চায়? চারিদিকে যখন নিরুৎসাহের চরম অবস্থা, তখনও নাবিক আলমের মুখ দীপ্ত ভয়শূন্য; ঠিক পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক।

শুধু নীহারই নয় স্বয়ং আবু সাঈদ পর্যন্ত তাকে যত দেখেন ততই বিস্মিত হন, সত্যি এমন ব্যক্তি তিনি খুব কমই দেখেছেন। শত বিপদেও যার মধ্যে কোনোরকম ভাবান্তর পরিলক্ষিত হয় না। নির্ভীক যুবক এই আলম।

আবু সাঈদের প্রশ্নে জবাব দিলো বনহুর—স্যার, বিচলিত হবেন না। আমি সবাইকে ঠান্ডা করে নিচ্ছি।

বনহুর ক্যাবিনের বাইরে বেরিয়ে এলো।

জাহাজের প্রায় কর্মচারী—খালাসি হতে নাবিক, ক্যাপ্টেন সবাই এসে জড়ো হয়েছে, সবাই বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে—আর তারা এ দ্বীপে বিলম্ব করতে চায় না।

বনহুর এসে দাঁড়ালো সবার মধ্যে।

এ জাহাজে একমাত্র নাসের এবং জলিলের দলের কয়েকজন সঙ্গী ছাড়া সবাই আলমকে গভীরভাবে ভালবাসতো এবং সমীহ করতো। বনহুর এসে দাঁড়াতেই ক্ষণিকের জন্য সবাই স্তব্ধ হলো, উন্মুখ হৃদয় নিয়ে তাকালো তার দিকে।

বনহুর শান্ত-ধীর-স্থির কণ্ঠে বললো—ভাইগণ, আমরা যে অবস্থায় উপনীত হয়েছি তাতে ঘাবড়ে যাওয়া স্বাভাবিক। মৃত্যু ভয় কার না আছে! কিন্তু মৃত্যু প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই অবশ্যম্ভাবী। জন্মালে মরতে একদিন হবেই, কাজেই মৃত্যু-ভয়ে অত্যন্ত কাতর হওয়া আমাদের কোনো সময় সমীচীন নয়।

সবাই এক সঙ্গে বলে উঠলো—আলম ভাই, আমরা আর কোনো কথাই শুনতে রাজি নই।

বললো বনহুর—দেখো আমি জানি এবং নিজেও বেশ উপলব্ধি করছি, এ দ্বীপটা আমাদের জন্য অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল একটা ভয়ঙ্কর জায়গা। কিন্তু আমরা কাপুরুষ নই—আমরা যে কারণে বা যে উদ্দেশ্য নিয়ে এ দ্বীপে এসেছি সে কাজ আমাদের সমাধা করা একান্ত কর্তব্য। এর চেয়েও যদি ভয়াবহ স্থানে আমাদের যাওয়া প্রয়োজন হয় তাই যেতে হবে। নূতন কিছু আবিষ্কার করতে হলে বিপদ-আপদ আসবেই—ভয়ঙ্করকে জয় করাই হলো

পুরুষোচিত কাজ। বন্ধুগণ, আমার অনুরোধ, তোমরা মৃত্যু ভয়ে কাতর না হয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে শেখো। মরতে যখন একদিন হবেই তখন ভয় কি মরণে---

বনহুরের দীপ্ত গম্ভীর কথাগুলো শুনে অনেকের মনেই পরিবর্তন আসছিলো কেউ কোনো কথা না বলে নিশ্চুপ শুনতে লাগলো। আলম যা বলছে, মিথ্যা নয় একটি বর্ণও।

বলে চলেছে বনহুর তখনও ঠিক তার পিছনে কখন যে আবু সাঈদ আর নীহার এসে দাঁড়িয়েছেন বনহুর বুঝতে পারেনি। আবু সাঈদ আর নীহারের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—সামান্য একজন নাবিক বৈতো কিছু নয় আলম, কিন্তু তার মধ্যে এতো বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ ভাব! তাদের চোখেমুখে বিস্ময়ভাব ফুটে ওঠে।

বনহুর বলে চলেছে—কোনো কাজে আত্মনিয়োগ করে সেকাজ যদি সমাধা না কর তাহলে তৃপ্তি কোথায়? কাজেই আমাদের মন থেকে ভয়-ভীতি আতঙ্ক মুছে ফেলতে হবে। দুর্দমনীয় সাহসে বুক বাঁধতে হবে। দেখতে হবে এর শেষ কোথায় এবং কি? ভাইগণ, তোমরা কোন্ মনে ফিরে যেতে চাও? যে শত্রু তোমাদের বন্ধু-সাথীদের এমন নির্মমভাবে নিহত করেছে তোমরা চাও না কি তার প্রতিশোধ নিতে?

এবার প্রায় অর্ধেকের বেশি লোক বলে উঠে—চাই, প্রতিশোধ চাই আমরা---

বনহুর আনন্দধ্বনি করে উঠে—সাবাস! তাহলে তোমরা সবাই এসো আমার সঙ্গে। মৃত্যুকে আমরা জয় করে আমাদের বন্ধুদের হত্যাকারী সেই অদ্ভুত জীবকে আবিষ্কার করি। বলো—তোমরা আমাকে সাহায্য করতে রাজি আছো?

এক সঙ্গে বললো এবার সবাই—রাজি!

মরতে যদি হয় মরবে?

হাঁ মরবো!

বনহুরের মুখে অদ্ভুত এক আনন্দের দ্যুতি খেলে যায়। আবু সাঈদ তার পিঠ চাপড়ে বলেন—আলম, তোমাকে আমি কি বলে যে ধন্যবাদ জানাবো ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।

বনহুর বললো—স্যার, এতে ধন্যবাদ জানাবার কিছু নেই, এখন চলুন—দ্বীপে অবতরণের জন্য প্রস্তুত হয়ে নিন।

চলো আলম, তাই চলো।

নীহার বনহুরের সম্মুখে এগিয়ে এলো, দু'চোখে কৃতজ্ঞতার আভাস। মুখে কিছু না বললেও অন্তরে শ্রদ্ধা জানালো সে মনে মনে।

আর কেউ না বুঝলেও বনহুর বুঝলো নীহারের মনের কথা। বনহুর একটু হেসে বললো—মেম সাহেব, আপনিও নামবেন তো?

হাঁ, আমিও নামবো। বললো নীহার।

বনহুর এবার সমস্ত নাবিক এবং খালাসিকে নিয়ে দ্বীপে অবতরণ করলো। আবু সাইদ আর তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ কেউ বাদ রইলো না। অগত্যা নাসের জলিলের দলের সঙ্গে যোগ দিয়ে নেমে পড়লো ফৌজিন্দিয়া দ্বীপের উপর।

বনহুর আর নীহার আজ আবু সাঈদকে প্রথমেই সেই স্থানটিতে নিয়ে হাজির করলো, তাঁকে দেখালো গতদিন যে ফাটলটার মধ্যে তারা সিঁড়ির ধাপের মত কিছু আবিষ্কার করেছিলো।

আবু সাঈদের আনন্দ আর ধরে না, তিনি জড়িয়ে ধরলেন বনহুরকে—আলম, তুমি সত্যিই একজন জ্ঞানবান লোক। তোমার জন্য এতো সহজে আমি কৃতকার্য হতে চলেছি।

বনহুর শ্রমিকদের নিয়ে সিঁড়ির ধাপটির খননকার্যে আত্মনিয়োগ করলো। অন্যান্য শ্রমিকদের বিভিন্ন স্থানে খনন-কাজে লাগিয়ে দেওয়া হলো।

আবু সাঈদ নিজেও একটি শাবল নিয়ে এখানে-সেখানে মাটিতে আঘাত করতে লাগলেন।

সমস্ত দ্বীপময় চললো নানাভাবে গবেষণা।

অনেক স্থান খনন করে ইট-পাথর বা ঐ ধরনের কিছু কিছু পাওয়া গেলো। আবু সাঈদের বিস্ময়ের অন্ত নেই, তিনি মনোযোগ সহকারে সব লক্ষ্য করে চলেছেন।

বনহুর শ্রমিকদের নিয়ে ফাটলটা খনন করে চলেছিলো। অল্পক্ষণেই দেখা গেলো, সেটা কোনো দোতলায় উঠার সিঁড়ির ধাপ।

একজন শ্রমিক এসে জানালো, প্রায় মাইলখানেক দূরে মাটির নীচে একটি দালানের ছাদের কিছুটা অংশ দেখা গেছে।

আবু সাঈদ এবং বনহুর চললেন সেই জায়গাটায়।

অল্পক্ষণেই আজ তারা আবিষ্কারে সক্ষম হলো—এ দ্বীপটা কোনো এক ডুবন্ত নগরী। একদিন এখানে ছিলো অসংখ্য লোকের বাস। কালক্রমে সেই নগরী সাগরবক্ষে নিমজ্জিত হয়েছিলো এবং সেই নগরীর লোকজন সবাই জলের অতলে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলো।

সেদিন বেশি কিছু আবিষ্কার না হলেও দ্বীপের আসল অস্তিত্ব খুঁজে পেলো তারা। সবচেয়ে আনন্দে আপ্লুত হলেন আবু সাঈদ। তাঁর এতো শ্রম সার্থক হলো। ফৌজিন্দিয়া দ্বীপটা যে একটি ডুবন্ত শহর বা নগর তাতে কোনো সন্দেহ রইলো না। এই দ্বীপের তলায় আছে অসংখ্য দালান-কোঠা আর ইমারত। কিন্তু রাতের বেলায় এতো আলোর খেলা হয় কি করে? এবং

গভীর রাতে ট্রেনের হুইসেলের মত কিসের শব্দ কানে তালা লাগিয়ে দেয়। এসব রহস্য রয়ে গেলো অজ্ঞাত। বেলা পড়ে আসতেই সবাই ফিরে এলো জাহাজে।

আজ জাহাজের নীচের ডেকে কেউ থাকবে না বলে জানানো হলো এবং জাহাজ ফৌজিন্দিয়া দ্বীপে নোঙর না করে গভীর সাগরবক্ষে ভাসমান অবস্থায় থাকবে।

সেইমতই কাজ হলো, বনহুর নিজে জাহাজ চালনা করে এমন এক জায়গায় জাহাজ নোঙর করলো যেখানে কোনো রকম বিপদের আশঙ্কা রইলো না।

জাহাজের কোনো শ্রমিক, নাবিক বা খালাসি নীচের ডেকে বা ক্যাবিনে রইলো না। সবাইকে উপরের ক্যাবিনে রাখা হলো এবং সাবধানে প্রত্যেকটা জানালার শার্শী আটকে দেওয়া হলো।

এতো সাবধানতা সত্ত্বেও সকলেরই মনে ভয় আর আশঙ্কা না জানি আজ আবার কার মৃত্যু ঘটতে পারে—কে জানে।

আবু সাঈদ আর নীহারের অনুরোধে বনহুর আর কেশব তাদের ক্যাবিনে রয়েছে। কারণ নীহার অত্যন্ত ভয় পেয়েছে, সে কিছুতেই শয্যা গ্রহণ করতে পারছিলো না।

রাত হয়।

সমস্ত জাহাজ নিস্তব্ধ।

কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই।

প্রত্যেকটা ক্যাবিনে সবাই জেগে, সকলেরই মনে উৎকণ্ঠা কখন কি ঘটে!

বনহুর আর কেশবকে বসিয়ে আবু সাঈদ আলাপ-আলোচনা করছিলেন।

নীহার জেগে থাকতে থাকতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। আজ ক'দিন তার ঠিকভাবে ঘুম নেই, হাজার হলেও মেয়েমানুষ তো নেতিয়ে পড়েছে একেবারে।

যতই ভীত এবং আতঙ্কগ্রস্ত হোক, বেশিক্ষণ নিস্তব্ধ থাকায় সকলেরই কেমন যেন প্রচন্ডভাবে দুলে উঠলো।

মুহূর্তে জাহাজের মধ্যে একটা আর্তগুঞ্জনধ্বনি ফুটে উঠলো যে যেখানে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলো সবাই জেগে উঠেছে তৎক্ষণাৎ। নীহারও বিছানা হতে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিলো, জেগে উঠে আঁকড়ে ধরলো খাটের ধারটা।

আবু সাঈদ এবং বনহুর সজাগ হয়ে রিভলভার বাগিয়ে ধরে উঠে দাঁড়ালেন। কারো মুখে কোনো কথা নেই, সবাই ভয়বিহ্বল দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছে এ-ওর দিকে।

নীহার পিতাকে আঁকড়ে ধরলো—আব্বা!

ভয় নেই মা, ভয় নেই---কন্যাকে মিথ্যা আশ্বাস দিতে লাগলেন আবু সাঈদ।

জাহাজখানা খানিকক্ষণ ভীষণভাবে দুলতে লাগলো। তারপর একবার একেবারে সম্পূর্ণ কাৎ হয়ে যাবার মত হলো। এইবার বুঝি আর রক্ষা নেই, জাহাজটা এবার ডুববে।

কিন্তু পরক্ষণেই জাহাজ একটা ঝাঁকি খেয়ে সোজা হয়ে গেলো। আর নড়ছে না জাহাজটা।

ক্রমে জাহাজের অভ্যন্তরে ভয়-বিহ্বল আর্তনাদ থেমে এলো। জাহাজের ক্যাপ্টেন মাইকে বার বার ঘোষণা করছেনঃ কেউ যেন ক্যাবিনের বাইরে বের না হয়।

জাহাজখানা স্থির হলেও মনে হলো, সাগরের ঢেউ-এর উপর যেন ধীরে ধীরে দোল খাচ্ছে।

বনহুর দ্রুত ক্যাবিনের শার্শীর পাশে গিয়ে সাগরের জলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে লাগলো কিন্তু কিছুই নজরে পড়লো না শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার।

কয়েক মিনিট পর হঠাৎ সেই হুইসেলের তীব্র শব্দ। কানফাটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ। যেন জাহাজের অনতিদূরে কোথাও ট্রেন হুইসেল দিচ্ছে।

জাহাজের সবাই কানে হাত-পা চাপা দিয়ে কাঁপতে লাগলো। এবার আর রক্ষা নেই, জাহাজের সঙ্গে বুঝি ট্রেনের সংঘর্ষ হবে।

নীহার আর্তকণ্ঠে ডাকলো—আলম এসো---সরে এসো, আমার বড্ড ভয় করছে---

বনহুর শান্ত এবং চাপা স্বরে বললো—ভয় নেই, এখানে কেউ আসতে পারবে না।

আবু সাঈদের মুখ ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে।

আজকের রাতটাও এভাবেই কাটলো। কারো চোখে ঘুম এলো না। ভোর হলো যখন তখন সবাই ঢলে পড়লো নিদ্রার কোলে কারণ আজ রাতে কেউ মারা পড়েনি।

বনহুর কখন নিদ্রিত হয়ে পড়েছিলো হঠাৎ জেগে উঠলো সে। ইচ্ছা করেই সে নিদ্রাকে ঠেলে দিয়ে হাই তুলে চেয়ারে সোজা হয়ে বসলো। বনহুর চেয়ারে বসতেই নিজের কাঁধে একটা কোমল কিছুর স্পর্শ অনুভব করলো।

রাতে যখন হুইসেলের ধ্বনি হচ্ছিলো তখন নীহার ভয় পেয়ে তাকে নিকটে এসে বসার জন্য বার বার বলছিলো। আবু সাঈদও বলেছিলেন

খাটের পাশে এসে বসতে। অগত্যা বনহুর নিজের চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বসেছিলো এসে খাটের পাশে।

একি, নীহার কখন যে বনহুরের চেয়ারের পাশে মাথা রেখে এমন করে ঘুমিয়ে পড়েছে সে জানে না। কখন যে তার মাথাটা গড়িয়ে চলে এসেছে বনহুরের কাঁধের ধারে তাও টের পায়নি। বনহুর দেখলো নীহারের গন্ডটা ঠিক তার চিবুকের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে এসেছে। চুলগুলো এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে আছে ললাটে।

বনহুরের সমস্ত দেহে একটা অনুভূতি নাড়া দিয়ে গিলো। হঠাৎ সে নীহারের মাথাটা সরিয়ে দিতে পারলো না। আস্তে তার ঠোঁট দু'খানা স্পর্শ করলো নীহারের শুভ্র গন্ডটার উপর। পরক্ষণেই বনহুরের সম্বিৎ ফিরে এলো, নীহারের মাথাটা সাবধানে নামিয়ে রেখে সোজা উঠে দাঁড়ালো। তাকিয়ে দেখলো বৃদ্ধ আবু সাঈদ খাটে ঠেস দিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছেন। কেশবও তার চেয়ারে বসে বসে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে হয়তো।

বনহুর রিভলভারটা পকেটে রেখে বেরিয়ে এলো বাইরে।

☐

আজ রাতে নানারকম ভয়ঙ্কর কিছুর উদ্ভব ঘটলেও কোন প্রাণনাশ ঘটেনি। আবু সাঈদ আশ্বস্ত হলেন—আজকের সাবধানতা তাহলে ব্যর্থ হয়নি। এজন্য বারবার ধন্যবাদ দিলেন তিনি নাবিক আলমকে। কারণ তার পরামর্শেই আবু সাঈদ এভাবে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। সকলের মনে ভয়ভীতি আর আতঙ্ক থাকলেও কেউ দ্বীপে অবতরণ নিয়ে আজ কোনো রকম মতবাদ করলো না। সবাই দ্বীপে নতুন কিছু আবিষ্কারের জন্য উদগ্রীব হয়ে কাজ করে চললো।

বেশ কিছু সময়ের মধ্যে দ্বীপটার ভিতর হতে বেরিয়ে এলো নানারকম অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিসপত্র আর নানারকম দালান-কোঠার ভগ্নাংশ।

এককালে ফৌজিন্দিয়া দ্বীপটা যে মস্তবড় একটা শহর ছিলো তাতে কোনো সন্দেহ রইলো না।

বনহুর নিজেও আবু সাঈদের সঙ্গে গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করলো। যতই মৃত্তিকা খনন করে চললো ততই দ্বীপটাকে রহস্যময় বলে মনে হতে লাগলো। অনেক নীচ অবধি খনন করায় বেরিয়ে এলো সব চাপা-পড়া কক্ষের মেঝের অংশ। বনহুর কয়েকজনকে নিয়ে পূর্বের ঐ সিঁড়ির ভগ্নধাপ লক্ষণীয় জায়গাটা খনন করে চললো। নিজ হস্তে সে শাবল চালাতে লাগলো।

প্রখর রৌদ্রে বনহুরের সুন্দর মুখমন্ডল রক্তাক্ত হয়ে উঠলো। ঘামে ভিজে গেলো তার জামাকাপড়। তবু অক্লান্তভাবে মৃত্তিকা খনন করে চলেছে।

কেশব তাকে বাধা দিয়ে বললো—বাবু, আপনি এসব করছেন কেন? আপনি শুধু আদেশ করুন, আমরাই তো আছি।

কেশবের কথার কোনো জবাব দিলো না বনহুর, সে যেমন কাজ করে যাচ্ছিলো তেমনি করে চললো।

অগত্য কেশবও নীরবে কাজ করতে লাগলো।

বেলা ক্রমান্বয়ে বেড়ে উঠেছে।

সূর্যের তাপ আরও তীব্র জ্বালাময় হয়ে উঠেছে।

শ্রমিকগণ যে যার কাজে ব্যস্ত।

বৈকালের আগেই তাদের কাজ শেষ করে ফিরে যেতে হবে জাহাজে। কাজেই কেউ বিশ্রাম গ্রহণ না করে অবিরাম মৃত্তিকা খনন করে যাচ্ছে।

এমন সময় আবু সাঈদের সঙ্গে নীহার এসে দাঁড়ায় সেইস্থানে যেখানে বনহুর কয়েকজন শ্রমিকসহ কাজ করে চলেছে।

বনহুরকে নিজ হস্তে শাবল চালাতে দেখে আবু সাঈদ এবং নীহার বিস্ময় প্রকাশ করলো। আবু সাঈদ বললেন— আলম, তুমি নিজে না করে শ্রমিকদের আদেশ করলেই পারতে?

নীহারের আঁখি দুটিতে প্রশংসনীয় দৃষ্টি, নিষ্পলক নয়নে সে তাকিয়ে আছে বনহুরের ঘর্মাক্ত পৌরুষদীপ্ত মুখমন্ডলের দিকে। সমস্ত দেহ ভিজে চুপসে উঠেছে বনহুরের---নীহারের বড় মায়া হলো।

বনহুর সোজা হয়ে দাঁড়ালো হাতের পিঠে ললাটের ঘাম মুছে নিয়ে বললো—স্যার, আমার তো কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

তাহলেও এই প্রখর রৌদ্রে---বললো নীহার।

হেসে বললো বনহুর —অভ্যাস আছে মেম সাহেব।

বনহুর কথাটা বলে পুনরায় কাজে আত্মনিয়োগ করলো। আবু সাঈদ আর নীহার এগিয়ে চললো অন্যদিকে। চলতে চলতে বললেন সাঈদ—সত্যি আলম অদ্ভুত ছেলে।

বললো নীহার—হাঁ আব্বা বড় অদ্ভুত।

দেখো মা, ওকে আমি যত দেখি ততই যেন আশ্চর্য হই। ওর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে আমি হতবাক স্তম্ভিত হয়ে যাই। শুধু তাই নয়, এমন চেহারার যুবক আমার চোখে আজ পর্যন্ত একটিও পড়েছে কিনা সন্দেহ---

আবু সাঈদ কথাগুলো বলতে বলতে এগুচ্ছিলেন। নীহারের মনে বয়ে যাচ্ছিলো একটা আনন্দের উৎস। পিতার উক্তিগুলো যেন তার কানে মধু বর্ষণ করছিলো।

আবু সাঈদ বললেন আবার —ছেলেটা যদি নাবিক না হয়ে কোনো অভিজাত ঘরের হতো তাহলে আমি নাসেরের সঙ্গে তোমার বিয়ে না দিয়ে আলমকেই জামাতা করে নিতাম---

পিতার কথাটা শুনে মুহূর্তে নীহারের মুখমন্ডল বিষন্ন মলিন হয়ে উঠলো, কারণ পিতার আশা-বাসনা কোনো দিনই সফল হবার নয়। আলম বিবাহিত এবং তার একটি সন্তানও আছে। একটা দীর্ঘশ্বাস গোপনে চেপে নিয়ে বললো নীহার—কেন আব্বা, অভিজাত ঘরে জন্মালে কি নাবিক হয় না?

হাঁ, সে কথা অবশ্য সত্য। আমার মনে হয় আলম নাবিক হলেও সে অভিজাত ঘরের সন্তান।

ঐ সময় পিছন থেকে শোনা যায় একজনের উচ্চ কণ্ঠস্বর—স্যার, স্যার--

থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকাতেই দেখতে পান আবু সাইদ এবং নীহার একজন শ্রমিক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছে।

অল্পক্ষণেই নিকটে এসে পড়ে, হাঁপাতে হাঁপাতে বলে সে —স্যার দেখবেন চলুন, একটা সুড়ঙ্গপথ বেরিয়ে পড়েছে। একটা সুড়ঙ্গ মুখ---

আবু সাঈদ এবং নীহার একরকম প্রায় ছুটেই চললেন যেখানে বনহুর শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করে চলেছে। নিকটে পৌঁছতেই অবাক হলেন আবু সাঈদ এবং নীহার। কিছুক্ষণ পূর্বে যে স্থানটিতে ওরা খনন করছিলো এক্ষণে সেই স্থানে একটা গভীর গর্ত বেরিয়ে পড়েছে এবং সেই গর্তমধ্যে নেমে গেছে পূর্বের ঐ ভগ্নসিঁড়ির ধাপগুলো।

আবু সাঈদের মুখে ফুটে উঠলো বিস্ময়, তিনি কন্যা নীহার সহ বনহুর এবং শ্রমিকদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন।

বনহুর বললো—স্যার, নিশ্চয়ই এই সিঁড়ির ধাপগুলো নীচে কোনো কক্ষমধ্যে নেমে গেছে।

হাঁ, আমারও সেইরকম মনে হচ্ছে আলম।

বনহুর এবার বললো—স্যার, আমি নীচে নেমে দেখতে চাই।

আবু সাঈদ এবং নীহার এক সঙ্গে বল্লে উঠলো— কি ভয়ঙ্কর কথা বলছো—বাবু ও কিছুতেই হবে না।

বনহুর বললো—আমাকে আপনারা বাধা দেবেন না। কারণ আমি এই সুড়ঙ্গমধ্যে প্রবেশ করবোই।

নীহারের মুখ ফ্যাকাশে হলো, বললো সে—আলম এই বিপদসঙ্কুল দ্বীপে ভয়ঙ্কর এক গর্তে প্রবেশ করতে চাও?

না প্রবেশ করলে ভিতরে কি আছে মোটেই জানা যাবে না।

আবু সাঈদ এবং নীহারের নিষেধ উপেক্ষা করে, কেশবের বাধা না মেনে বনহুর দুর্গম ভয়ঙ্কর গর্তমধ্যে অবতরণে প্রস্তুত হয়েছিলো। কিন্তু ঐ দিন

সুড়ঙ্গমধ্যে প্রবেশ করা আর সম্ভব হলো না বনহুরের। কারণ বেলা গড়িয়ে এসেছে, এবার জাহাজে ফিরতে হবে।

নীহার যেন নিশ্বাস নিলো এতোক্ষণে, যাক আজকের দিনটা এবং রাতটা তবু নিশ্চিন্ত সে। কেন যে ওর জন্য নীহারের এতো চিন্তা, নিজেই ভেবে পায় না যেন সে।

কেশব কিন্তু ভয়ানক ঘাবড়ে গেছে, বাবুকে সে কিছুতেই সুড়ঙ্গমধ্যে একা প্রবেশ করতে দেবে না। শত শত বছর আগের ধ্বংসপ্রাপ্ত সুড়ঙ্গমধ্যে না জানি কত কত ভয়ঙ্কর জীব বাস করছে। ওর মধ্যে প্রবেশ করলে আর সে ফিরে আসবে না।

এক সময় সবাই ফিরে গেলো জাহাজে।

আজও পূর্বদিনের মত জাহাজটিকে ফৌজিন্দিয়া দ্বীপ হতে প্রায় মাইলকয়েক দূরে সাগরবক্ষে ভাঁসিয়ে রাখা হলো এবং নীচের ডেকে বা ক্যাবিনে কেউ রইলো না। সবাই আশ্রয় নিলো জাহাজের উপর ক্যাবিনগুলোতে।

খাওয়া-দাওয়া-পর্ব সন্ধ্যার অনেক আগেই চুকিয়ে নেওয়া হলো।

বনহুর আজ আবু সাঈদকে বললো—স্যার আমি আজ নীচের কোনো ক্যাবিনে থাকতে চাই।

সঙ্গে সঙ্গে আবু সাঈদ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—জাহাজের সবাই যদি আমার কাছে অনুরোধ জানায় তবু আমি তোমাকে নীচের কোনো ক্যাবিনে থাকতে দিতে পারি না।

নীহার বনহুরের কথাটা শুনে চমকে উঠেছিলো, স্থির হলো পিতার উক্তি শুনে। বললো নীহার—আলম তুমি সাহসী জানি, কিন্তু বেশি বাড়াবাড়ি কিছুতেই ভাল নয়, বুঝলে?

হাঁ বুঝেছি মেম সাহেব। কিন্তু কি সেই জীবটা যা আমাদের জাহাজের দু'জনকে ভক্ষণ করেছে, তা জানাও তো প্রয়োজন? বেশ, আমি নীচে না থাকলেও উপরে যে -কোন অন্য ক্যাবিনে থাকতে চাই।

নীহার অভিমানভরা গলায় বললো—বুঝতে পেরেছি তুমি আমাদের ক্যাবিনে থাকলে বাইরে বেরুতে পারবেনা, এজন্যই তো অন্য ক্যাবিনে থাকতে চাও, না?

হাঁ, কারণ আমি জানতে চাই সেই ভয়ঙ্কর হস্তিশুঁড়ের ন্যায় মোটা হস্তখানা কোন্ জীবের এবং যতক্ষণ না আমি এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়েছি ততক্ষণ আমাকে কেউ আপনারা আটকাতে পারবেন না।

নীহার মাথা নীচু করে বসে রইলো, অজানিত এক আশঙ্কায় বুকটা কেঁপে উঠলো তার।

আবু সাঈদ বললেন—হঠাৎ কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই বলছিলাম রাতে ক্যাবিনের বাইরে বের না হওয়াই সমীচীন।

কিন্তু কোনো আপত্তিই বনহুর শুনলো না, জীবনে ভয় কাকে বলে সে জানে না। আর আজ তাকে আবু সাঈদ বা নীহার ক্ষান্ত করতে সক্ষম হবে।

বনহুর পাশের ক্যাবিনে রইলো—যেখানে রয়েছে নাসের এবং জলিলসহ লাঠিয়ালগণ। কেশবও রইলো তার কাছে। সে কোনোমতেই বনহুরের সঙ্গ ত্যাগ করতে রাজি নয়।

রাত এখনও বেশি হয়নি।

কারো চোখে এখনও নিদ্রাদেবী আসন গেড়ে বসেনি, সবাই নানারকম গল্প-সল্প নিয়ে ব্যস্ত আছে। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিই অতি নিম্ন ও চাপাস্বরে আলাপ-আলোচনা করছিলো।

সকলের মনেই রয়েছে আতঙ্ক, কখন সেই অদ্ভুত জীবের মোটা হাতখানা এসে কাকে তুলে নিয়ে সাগর মধ্যে ডুব্ মারবে।

এমন সময় হঠাৎ শোনা গেলো সেই কানফাটা তীব্র হুইসেলের শব্দ।

সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ 'পর্যটনের' প্রত্যেকটা ব্যক্তির মুখশুকিয়ে কাঠ হয়ে গেলো। সাহসী জলিলের লাঠিয়ালদল পর্যন্ত কুঁকড়ে গেলো কেঁচোর মত।

নাসের এসে দাঁড়ালো বনহুরের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে, ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে তার মুখটা।

সবাই প্রতীক্ষা করতে লাগলো না জানি কখন দুলে উঠবে জাহাজখানা ভীষণভাবে। কিন্তু আশ্চর্য আজ হুইসেলের তীব্র শব্দ এদিকে না এগিয়ে ক্রমান্বয়ে সরে যাচ্ছে দূরে—আরও দূরে। ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে এলো শব্দটা।

জাহাজের সবাই কান পেতে শুনছিলো এই শব্দ সম্বন্ধে নানাজনে নানারূপ মতবাদ করতে লাগলো। ততক্ষণে দূরে বহু দূরে ফৌজিন্দিয়া দ্বীপের উপর জ্বলে উঠেছে অসংখ্য আলোর প্রদীপ। আলোগুলো যেন হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে।

হুইসেলের শব্দটা মিশে আসতেই কতকটা আশ্বস্ত হলো জাহাজের আরোহীগণ কিন্তু একেবারে ভয়শূন্য হলো না কেউ। আবার কোন মুহূর্তে জীবটা এসে আচমকা আক্রমণ চালিয়ে বসে বলা যায় না। সবাই শার্শীর পাশে দাঁড়িয়ে দ্বীপের আলোর খেলা দেখতে লাগলো।

দিনের আলোতে যেখানে নেই কোনো কিছুর চিহ্ন, নেই কোনো মশাল বা প্রদীপের ভগ্নাংশ। অথচ এখন সেই দ্বীপে অসংখ্য আলোর বন্যা।

আজকের রাতটা তেমন কোনো বিপদের সম্মুখীন হলো না। অবশ্য কৃতিত্ব বনহুরেরই কারণ সে আজ নিজে ইঞ্জিন চালিয়ে জাহাজটাকে একেবারে ফৌজিন্দিয়া দ্বীপ ছেড়ে অনেক দূরে নিয়ে গিয়ে নোঙর করেছিলো।

আবু সাঈদ আর অন্যান্য পর্যটক পরদিন সবাই বনহুরকে ধন্যবাদ জানাতে লাগলেন।

সবাই যখন দ্বীপে অবতরণ নিয়ে ব্যস্ত তখন একসময় নীহার নীচের ডেকে বনহুরের ক্যাবিনে প্রবেশ করলো।

বনহুর তখন তার নাবিক ড্রেস পরা নিয়ে ব্যস্ত ছিলো। কয়েক মিনিট পূর্বে জাহাজ দ্বীপের সন্নিকটে এসে নোঙর করেছে। এবার বোটযোগে সবাই নামছে।

বনহুর জামাটা পরে নিয়ে সম্মুখে তাকাতেই চমকে উঠলো। নীহার কখন এসে দাঁড়িয়েছে তার ক্যাবিনের মধ্যে। একটু পূর্বে কেশব বেরিয়ে গেছে খনন যন্ত্রপাতি নিয়ে। বনহুর আজ ঐ অদ্ভুত সুড়ঙ্গমধ্যে প্রবেশ করবে, কাজেই সেইভাবে ড্রেসটা মজবুত করে নিয়েছিলো।

হঠাৎ নীহারকে দেখে দৃষ্টি স্থির হলো বনহুরের, বললো—নীহার তুমি নেমে যাওনি?

গম্ভীর কণ্ঠে বললো নীহার—না।

সে কি, যাবে না? কয়েক পা সরে এলো বনহুর নীহারের পাশে।

বনহুরের কথা কানে না নিয়ে বললো নীহার—আলম, সুড়ঙ্গ মধ্যে তুমি প্রবেশ করতে পারবে না।

অবাক হয়ে বললো বনহুর—নীহার, তুমি আজও নাবিক আলমকে চিনলে না? সে যা একবার বলে তা সে করবেই। শত বাধাও তাকে তার সঙ্কল্প থেকে বিরত করতে সক্ষম হয় না।

নীহার বনহুরের জামার সম্মুখভাগ এঁটে ধরে বলে—তুমি আমার অনুরোধ রাখবে আলম? আমি তোমাকে অনুরোধ করছি। তুমি যেও না, যেও না, আলম ঐ মৃত্যুভয়াল সুড়ঙ্গ-মধ্যে---

নীহারের হাত দু'খানা চেপে ধরলো বনহুর—নীহার, এতে ভয় পাবার কিছু নেই। আর মরণে আমার দুঃখও নেই। নীহার, আমার জীবনটাও বড় অভিশপ্ত জীবন---গলা ধরে আসে বনহুরের।

নীহার অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে বনহুরের ছলছল আঁখি দুটির দিকে। হঠাৎ নীহার বনহুরের বুকে মাথা রেখে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠে—আলম, জানি না কেন আমি নিজকে হারিয়ে ফেলেছি তোমার মধ্যে। অনেক ভেবেছি, আকাশের চাঁদ চাইলেই কোনোদিন পাওয়া যায় না, তবু কেন কেন পারি না নিজকে সংযত রাখতে......

নীহার, এ তোমার মনের দুর্বলতা, না হলে আমার মত একজন নগণ্য নাবিককে তুমি এভাবে মনে স্থান দিতে পারতে না।

না না, তুমি নগণ্য নও আলম, তুমি নগণ্য নও। তুমি অমূল্য সম্পদ, যা কল্পনা করা যায়—কিন্তু পাওয়া যায় না। নীহার বনহুরের বুকে গলায় গণ্ডে হাত বুলিয়ে চলে।

বনহুর নির্বাক নিস্পন্দ, কোনো কথা সে বলতে পারে না। তার সমস্ত দেহমনে যেন একটা শিহরণ নাড়া দিয়ে যায়। বনহুর সংযত রাখতে পারে না নিজেকে, গভীর আবেগে নীহারকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে। ওর মুখখানা তুলে ধরে নিজের মুখের কাছে।

নীহার ওকে বাধা দেয় না।

তারপর বনহুর নীহারকে বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করে দিয়ে বলে—চলো নীহার, বড্ড দেরি হয়ে গেলো।

নীহার আর বনহুর জাহাজের ডেকে এসে দাঁড়ালো, প্রায় সকলেই অবতরণ করেছে। একখানা বোট সিঁড়ির মুখে অপেক্ষা করছে বনহুরের জন্য।

বনহুর নীহারের হাত ধরে নামিয়ে নিলো জাহাজ থেকে। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় নীহারের দেহটা যেন কাঁপছিলো, ভয়ে নয়—আশঙ্কায়। হয়তো আলমের সঙ্গে এই তার শেষ জাহাজ ত্যাগ। হয়তো আলম ঐ সুড়ঙ্গমধ্যে প্রবেশ করে আর ফিরে আসবে না। হয়তো তাকে ঐ ভয়ঙ্কর দ্বীপে চিরদিনের জন্য বিসর্জন দিয়ে আসতে হবে.....

বোটে বসে বললো বনহুর—অমন গম্ভীর হয়ে কি ভাবছো নীহার?

কিছু না। একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে নিলো নীহার।

বনহুর বুঝতে পেরেছে, তার সুড়ঙ্গমধ্যে প্রবেশ-আশঙ্কায় নীহার বেশি উতলা এবং চিন্তিত হয়ে পড়েছে।

এরপর বনহুর আর কোনো কথা বলে না, নিশ্চুপ হয়ে বসে বোটের স্পীড বাড়িয়ে দেয়।

অল্প সময়ে বনহুর আর নীহারসহ বোটখানা দ্বীপের কিনারে গিয়ে পৌঁছে যায়।

জাহাজখানা ফৌজিন্দিয়া দ্বীপের কয়েক রশি দূরে নোঙর করেছিলো।

বনহুর বোট থেকে নেমে পড়ে নীহারকে হাত ধরে সাবধানে নামিয়ে নেয়। হঠাৎ হোচট খেয়ে যাতে পড়ে না যায় সেইদিকেও খেয়াল রাখে।

বনহুরের হাতে হাত রেখে যখন নীহার বোট থেকে নামছিলো তখন অদূরে দাঁড়িয়ে নাসের এবং জলিল লক্ষ্য করছিলো। ইদানীং নাবিক আলমের প্রতি তাদের ঈর্ষাগত মনোভাব বলিষ্ঠ না থাকলেও একেবারে বিনষ্ট হয়নি।

তবে সম্প্রতি ফৌজিন্দিয়া দ্বীপের মৃত্যুভয়াল ভয়ঙ্কর অবস্থার জন্য শান্ত আছে তারা, কারণ আলমের মত দুঃসাহসী শক্তিশালী একজন ব্যক্তির নিতান্ত প্রয়োজন আজ তাদের সকলের। কখন কোন্ বিপদ-আপদ ঘটে বলা যায় না, এসময় আলমকে হাত রাখা তাদের কর্তব্য। তাই আজকাল নাসের বা জলিলের দল হিংসায় জ্বলে মরলেও প্রকাশ্যে কোনোরকম কু-মতলব আঁটে না। তারা চায় দ্বীপ থেকে কোনোরকমে উদ্ধার পেয়ে ফিরে যাবার পথে ওকে খতম করতে হবে এবং সেই প্রতীক্ষাতেই আছে তারা।

বনহুরের সঙ্গে নীহার যখন এগিয়ে যাচ্ছিলো তখন নাসের দাঁত কটমটিয়ে বলছিলো—বেটাকে আর ক'টা দিন ফুর্তি করে নিতে দাও জলিল, তারপর ওকে হজম করে ফেলবো।

জলিল বলে উঠে—দ্বীপটা ভয়ঙ্কর স্থান, কখন কোন্ বিপদ ঘটে, তাই আমিও চুপচাপ আছি, নইলে ওকে এতোদিনে যমালয়ে পাঠিয়ে তবে ছাড়তাম।

জলিল আর নাসেরের যখন কথাবার্তা হচ্ছিলো তখন ফুলমিয়া এবং দলবল এসে যোগ দেয় তাদের সঙ্গে। পিছনে চলতে চলতে সব শোনে ফুলমিয়া।

জলিল এবং নাসের তাদের সবাইকে একবার দেখে নেয়। এরা সবাই তাদেরই লোক, কাজেই কথাবার্তা চলতে থাকে, বলে নাসের—কতদিন আগেই বেটা চলে যেতো যমালয়ে, কিন্তু ভাগ্য ভাল তাই বেঁচে গেছে বারবার।

জলিল বললো—সেকথা অবশ্য ঠিক বলেছেন ছোট স্যার। না হলে কতবার আলমকে হত্যা করার চেষ্টা করেও আমরা বিফল হলাম কেন?

বললো নাসের—দ্বীপের বিপদটা একবার কেটে যাক তাহলে.......

নাসেরের কথার মাঝখানে বলে উঠে জলিল—এবার শেষ বান নিক্ষেপ করবো ছোট স্যার, দেখে নেবেন বেটা কুপকাৎ না হয়ে যাবে না। কিন্তু স্যার—মোটা বখশীস চাই......জলিল, নাসেরের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসলো।

ফুলমিয়া সজাগ হয়ে সব শুনছিলো, শিউরে উঠলো সে। কিন্তু মুখোভাবে কোনোরকম প্রতিক্রিয়া দেখা দিলো না তার। নীরবে শুনছে আর দলের সঙ্গে যোগ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। ফুলমিয়ার মনে ঠিক বিপরীত চিন্তা, নাসের এবং জলিল চায় আলমকে ধ্বংস করতে, আর ফুলমিয়া চায় তার মঙ্গল।

ওদিকে আলমসহ নীহার তখন অনেকদূর এগিয়ে গেছে। অবশ্য তাদের সকলেরই গন্তব্যস্থান আজ একই জায়গায়—যে স্থানে বেরিয়েছে সেই সুড়ঙ্গমুখটা।

বনহুর আর নীহার যখন পৌঁছলো তখন সেখানে সবাই এসে জড়ো হয়ে গেছে। আশেপাশে বিভিন্ন স্থানে চলেছে তখন খনন-কাজ।

অনেক দালান-কোঠার ভগ্নাংশ বেরিয়ে এসেছে মাটির তলা হতে। অনেক জীবজন্তুর কঙ্কাল এবং নর-কঙ্কালও বেরিয়েছে প্রচুর। আবু সাঈদ এবং ভূতত্ত্ববিদগণ গবেষণা করে আশ্চর্য হলেন—শত শত বছর আগের মাটিচাপা-পড়া জীবের কঙ্কাল কি করে আজও বিনষ্ট না হয়ে ঠিক আছে!

গবেষণা চলতে লাগলো এ ব্যাপার নিয়ে।

এদিকে বনহুর সুড়ঙ্গমধ্যে প্রবেশ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিলেন। কেশবের মুখ ফ্যাকাশে কালো হয়ে উঠেছে।

নীহার যেন মনকে কিছুতেই ধরে রাখতে পারছে না, বার বার তার চোখ দুটো অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠছে। বনহুরের দিকে চাইতেই দৃষ্টি বিনিময় হলো, আশ্চর্য হলো নীহার—ওর মুখে নেই এতোটুকু ভয় বা দুশ্চিন্তার ছাপ।

বনহুর সড়ঙ্গমধ্যে প্রবেশের জন্য টাইট জামা-কাপড় পরে নিলো। পায়ে বুট, মাথায় ক্যাপ, হাতে গ্লাব্স্। বামহস্তে তীব্র আলোদায়ক টর্চ এবং দক্ষিণ হস্তে গুলীভরা রিভলভার।

আবু সাঈদের অভিজ্ঞ ফটোগ্রাফার বনহুরের পর-পর ফটো নিয়ে চলেছে। যদিও এতোক্ষণ সে দ্বীপের খনন অংশের বিভিন্ন ছবি সংগ্রহ করছিলো, এখন সে ব্যস্ত হয়ে উঠলো বনহুরের ছবি গ্রহণে।

বনহুর যখন সুড়ঙ্গমধ্যে প্রবেশ করলো তখন সে সকলের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লো, তার মুখমন্ডল দীপ্ত উজ্জল। ফটোগ্রাফার ছবি নিলো সেই মুহূর্তে।

উপস্থিত সকলের মুখ বিষাদময় হলো, আবু সাঈদ এবং অন্যান্য সকলের মুখেও গভীর একটা দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে উঠলো। নীহার ও কেশব অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলো।

শুধুমাত্র খুশি হলো নাসের এবং জলিল ও তার দলবল। কিন্তু ফুলমিয়ার মুখ কালো হয়ে উঠেছে, তার জীবন যে রক্ষা করেছে সে আজ মৃত্যুর গহ্বরে প্রবেশ করলো। মনেপ্রাণে ফুলমিয়া খোদাকে স্মরণ করছে, তিনি যেন আলম সাহেবকে সুস্থদেহে ফিরিয়ে আনেন।

কিন্তু ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে চললো, আলমের ফিরবার কথা নেই। সুড়ঙ্গমুখে সবাই বিপুল আগ্রহ নিয়ে প্রতীক্ষা করছে। সমস্ত জাহাজের লোকজন সবাই এসে জড়ো হয়েছে সেই স্থানে।

বেলা গড়িয়ে এলো কিন্তু আলমের আর সন্ধান নেই। আবু সাঈদ এবং বয়স্ক পর্যটকগণ সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন, তা ছাড়াও অন্যান্য সকলের মুখেই দুশ্চিন্তার ছাপ। কেশব আশঙ্কিতভাবে সুড়ঙ্গমুখে দাঁড়িয়ে আছে।

নীহার বারবার পিতাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলেছে, এতোক্ষণও আলম আসছে না কেন? কোনো বিপদ ঘটেনি তো তার? এতোক্ষণ আসছে না সে, আর একজন গিয়ে দেখা উচিত নয় কি?

কেশব এবার অধৈর্য হয়ে উঠেছে, হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে সে। আবু সাঈদের মুখে কোনো কথা সরছে না, কারণ আলমের যদি কোনো অমঙ্গল ঘটে থাকে তাহলে এজন্য দায়ী যে তিনিই। আবু সাঈদ নিজে পায়চারি শুরু করে দিয়েছেন, ললাটে ফুটে উঠেছে গভীর চিন্তারেখা।

সম্পূর্ণ কয়েকটা ঘন্টা অতিবাহিত হয়ে চলেছে।

বিপুল উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করছে সবাই।

সূর্য পশ্চিম আকাশে গড়িয়ে গেছে অনেকদূরে। শ্রমিক এবং নাবিকদের মধ্যে চঞ্চলতা দেখা দিলো, সবাই জাহাজে ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিয়েছে।

আবু সাঈদ ক্ষিপ্তের ন্যায় উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছেন, সহকারী এবং সঙ্গিগণ সবাই আবু সাঈদের উৎকণ্ঠায় যোগ দিয়ে নানাজনে নানারকম মতবাদ প্রকাশ করছেন।

শুধু নাসেরের দল মনে মনে খুশি হয়েছে চরম আকারে। এতোদিন নানাভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েও যা করতে সক্ষম হয়নি আজ তা আপনা আপনি হয়ে গেলো। নাসের জলিলসহ দলবল নিয়ে জাহাজে ফিরে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে নিয়েছে। আনন্দ তাদের ধরছে না যেন।

আবু সাঈদ ক্রমান্বয়ে অস্থির হয়ে পড়লেন, সকলের নিকটে অনুরোধ জানালেন আরও এক ঘন্টা অপেক্ষা করার জন্য।

কেশব তো হাত জুড়ে সকলের নিকটে অনুনয়-বিনয় শুরু করলো—তারা যেন তার বাবুকে ছেড়ে না যায়।

নাসের সবাইকে উস্কানি দিতে লাগলো, যাতে তারা আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করতে রাজি না হয়।

আবু সাঈদের কথামত আরও একটা ঘন্টা কেটে চললো। তবুও ভিতর হতে ফিরে এলো না আলম। এবার সকলে জাহাজের দিকে রওয়ানা দিলো।

তখনও আবু সাঈদ কেশব আর নীহার এবং কয়েকজন আবু সাঈদের বন্ধুস্থানীয় লোকজন অপেক্ষা করছেন। আর দেখা গেলো, ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে ফুলমিয়া। তার মুখে-চোখেও দারুণ উদ্বিগ্নতার ছাপ।

কিন্তু আর যে অপেক্ষা করা চলে না, এবার দ্বীপের বুকে নেমে আসবে সন্ধ্যার অন্ধকার। তার সঙ্গেই শুরু হবে দ্বীপময় এক মৃত্যুভয়াল আলোর খেলা। অসংখ্য প্রেত-আত্মার অদৃশ্য হস্তের কঠিন চাপে প্রাণ দিতে হবে সকলের।

আর বিলম্ব করা চলে না।

মৃত্যুভয় কার না আছে!

সবাই যখন জাহাজে ফিরে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে তখন আবু সাঈদ আলমের আশা ত্যাগ করে নীহারকে বললেন—মা, এবার আমাদের ফিরে যেতে হবে।

নীহার বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো—আব্বা, আলমকে এই মৃত্যুকূপে নিক্ষেপ করে কোন মন নিয়ে তুমি বাঁচতে চাও।

মা!

বাবা, তোমরা সবাই চলে যাও, আমি একা প্রতীক্ষা করবো আলমের।

একি বলছিস মা? তুই কি পাগল হলি?

কেশব এগিয়ে এলো—স্যার, আপামনি পাগল হয়নি। তিনি ঠিকই বলেছেন, বাবুকে এই বিপদে ফেলে আপনারা কি করে ফিরে যেতে চান? সবাই চলে গেলেও আপামনির সঙ্গে আমি থাকবো। মরতে হয় বাবুর সঙ্গে আমরাও মরবো।

কয়েকজন গণ্যমান্য বয়স্ক লোক ছিলেন আবু সাঈদের সঙ্গে, তাঁরা চরম বিপদে পড়েছেন—আবু সাঈদ সাহেবকে ছেড়ে যেতেও পারছেন না অথচ জীবনের মায়া কাটানোও মুস্কিল। নীহারের কথায় এবং কেশবের উক্তি শুনে সবাই প্রতিবাদ করে বসলেন।

প্রবীণ এক ব্যক্তি বললেন—একজনের জন্য এতোগুলো জীবন বিনষ্ট করার কোনো যুক্তি নেই। কেশব তার বাবুর জন্য অপেক্ষা করতে চায় করুক কিন্তু আমরা মা নীহারকে এই ভয়ঙ্কর স্থানে রেখে যেতে পারি না।

আবু সাঈদ কন্যাকে অনেক বোঝাতে লাগলেন।

আশ্চর্য, নীহার কিছুতেই ফিরে যাবে না জাহাজে!

ওদিকে লোকজন সবাই ফিরে চলেছে, নাসের দলবল নিয়ে এগিয়ে গেছে অনেকদূর।

আবু সাঈদ যখন ব্যথিত মর্মাহত হয়ে ফিরে চলার জন্য মন স্থির করে নিয়েছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে ঐ ভয়ঙ্কর মৃত্যুভয়াল সুড়ঙ্গমধ্য হতে ভেসে আসে গুলীর শব্দ।

সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে স্ফীত হয়ে উঠে আবু সাঈদ, নীহার এবং উপস্থিত অন্যান্য সকলের মুখ। কেশব তো খুশিতে চিৎকার করে উঠলো—বাবু—বাবু....

ফুলমিয়া অন্যান্যের মধ্যে আত্মগোপন করে এতোক্ষণ খোদার নাম স্মরণ করছিলো। সেও ভুলে যায় তার সর্দার আর দলবলের হিংসার কথা, ছুটে চলে আসে সুড়ঙ্গমুখে।

ঠিক সেই দন্ডে সুস্থদেহে সুড়ঙ্গমধ্য হতে বেরিয়ে আসে নাবিক আলম। সূর্যাস্তের শেষ রশ্মিতে তাকে পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক মনে হয়। আবু সাঈদ ছোট্ট বালকের মতই ছুটে গিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। তাঁর চোখে ঝরে পড়ে আনন্দ-অশ্রু। আবেগভরা মধুর কণ্ঠে ডাকলেন—আলম!

নীহারের চোখ খুশিতে জ্বলে উঠলো যেন, সেও পিতার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে নিষ্পলক চোখে দেখছে, সত্যি আলম জীবিত অবস্থায় ফিরে এসেছে।

কেশবের কণ্ঠে কোনো কথা সরলো না, সে কি করবে যেন ভেবে পাচ্ছে না।

ফুলমিয়া এবার হাত তুলে খোদার কাছে শুকরিয়া করতে লাগলো।

অন্যান্য সবাই এগিয়ে এসে বনহুরের সঙ্গে করমর্দন করতে লাগলো। নাসের আর জলিলের দল যদিও অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিলো তাদের মুখ পুনরায় কালো হলো। কারণ, তারা মনে করেছিলো, আলম আর সুড়ঙ্গমধ্য হতে ফিরে আসবে না। এ দ্বীপেই হবে তার জীবন্ত সমাধি, কিন্তু সে কল্পনা তাদের ধূলিসাৎ হলো।

আবু সাঈদ দলবল নিয়ে আলমসহ ফিরে এলেন জাহাজে। জাহাজে পৌঁছেই তিনি আনন্দ-আপ্লুত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, আলম ফৌজিন্দিয়া দ্বীপের গোপন রহস্য উদঘাটনে সক্ষম হয়েছে, তাকে তিনি অন্তরের সমস্ত অনুভূতি দিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

জাহাজের প্রতিটি ব্যক্তি এ সংবাদে খুশি হলো। এবার সবাই আশ্বস্ত হয়েছে, ফৌজিন্দিয়া দ্বীপের গোপন রহস্য জানতে পারবে বলে। কিন্তু জাহাজের একটি গোপন স্থানে নাসের জলিলের দলসহ সলা-পরামর্শ শুরু করলো, কোনোরকমে আলম যেন এ কৃতিত্ব লাভ করতে সক্ষম না হয়। সড়ঙ্গমধ্যের রহস্য উদঘাটনের পূর্বেই তাকে শেষ করতে হবে, রুদ্ধ করে দিতে হবে চিরতরে তার কণ্ঠ। এবার ছোরা দ্বারা বা জাহাজের ইঞ্জিনে নিষ্পেষিত করে নয়, পিস্তলের গুলীতে হত্যা করতে হবে। অতি সাবধানে কাজ করতে হবে যাতে এবার রেহাই না পায়।

নাসের জলিলকে একশত স্বর্ণমুদ্রা দিতে রাজি হয়েছে। কার্যসিদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া হবে তাকে এই স্বর্ণমুদ্রাগুলো।

এঁতোবড় একটা লোভ কম নয়, একশত স্বর্ণমুদ্রা পেলে আজীবন বসে চলে যাবে তার। লাঠিয়ালদের সর্দারী আর তাকে করতে হবে না।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার কিছু পরই তাদের জাহাজ ফৌজিন্দিয়া দ্বীপ ত্যাগ করে কয়েক মাইল দূরে চলে এলো। পূর্বদিনের জায়গা হতেও আজ আরও কিছুটা দূরে জাহাজ নোঙর করলো।

পর-পর কয়েকটা দিন বেশ ভালই কেটে চলেছে। এ ক'দিন সাংঘাতিক তেমন কোনো বিপদ ঘটেনি বা প্রাণহানি হয়নি। জাহাজে সকলের মনেই অনেকটা সাহস এসেছে।

জাহাজ নোঙর করার পর সকাল-সকাল খাওয়া-দাওয়া শেষ করে নিলো সবাই। আবু সাঈদ জানিয়েছেন, রাত্রি দশ ঘটিকায় আলম ফৌজিন্দিয়া দ্বীপের মৃত্তিকা তলের রহস্য ব্যক্ত করবে, যা সে আজ সেখানে স্বচক্ষে দেখে এসেছে।

নাসের জলিলকে সেই মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত করে নিলো। আলম যেন রহস্য উদঘাটনে সক্ষম না হয়।

জাহাজের প্রতিটি ব্যক্তি বিপুল আগ্রহ নীয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলো, না জানি কি রহস্য আজ ব্যক্ত করবে আলম। রাত্রি নয় ঘটিকার মধ্যেই সবাই আজ আবু সাঈদের ক্যাবিনে এসে জড়ো হলো। জাহাজের সবচেয়ে বড় এবং প্রশস্ত হলো এই ক্যাবিনটা।

অন্যান্য দিনের মত আজও নীচের ডেকে বা ক্যাবিনে কেউ রইলো না। সবাই আশ্রয় নিলো জাহাজের উপরের ক্যাবিনগুলোতে।

আবু সাঈদের অন্তরে আজ এক পূর্ণতার আনন্দ। পিতার মতই আনন্দিতা নীহার, দ্বীপের রহস্য উদঘাটনের জন্য নয়, আলম সুস্থ দেহে মৃত্যুভয়াল সুড়ঙ্গমধ্য হতে ফিরে এসেছে বলে।

আলমকে আবু সাঈদ তাঁর নিজ হস্তের মূল্যবান হীরক আংটি খুলে উপহার দিয়েছেন, আরও প্রচুর অর্থ তিনি তাকে দেবেন বলে জানিয়েছেন। আলম এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব, পুরস্কার-আশায় সে উন্মুখ বা উদগ্রীব নয়।

ফৌজিন্দিয়ার ভূগর্ভ-রহস্য জানার বাসনায় আবু সাঈদের ক্যাবিনে রীতিমত ভীড় জমে গেছে। নাসের এবং জলিলের দল ছাড়া সবাই আজ এসে জমায়েত হয়েছে এই ক্যাবিনে। সকলেরই চোখেমুখে বিপুল আগ্রহ।

আবু সাঈদ নিজের পাশে বসিয়েছেন নাবিক আলমকে। নীহারও ঠিক তার অনতিদূরে বসেছে, স্থির নয়নে তাকিয়ে আছে সে আলমের দীপ্তময় মুখমন্ডলের দিকে। নীহার যেন আনন্দে আত্নহারা হয়ে পড়েছে, আলম যে ঐ মৃত্যুভয়ঙ্কর সুড়ঙ্গমধ্য হতে ফিরে আসবে, এ আশা তার ছিলো না এবং সেই কারণে সে বেশি মুষড়ে পড়েছিলো।

কেশবও দাঁড়িয়ে আছে আলমের পাশে, আনন্দে আপ্লুত সে। আর একজনও ঠিক কেশবের মতই খুশি হয়েছে—সে হলো ফুলমিয়া। যদিও সে এখনও জলিলের সঙ্গেই রয়েছে তবু তার মনে তৃপ্তি, তার জীবন রক্ষকের জীবনলাভ ঘটেছে।

আবু সাঈদের ক্যাবিনে যখন বনহুর সেই ভয়ঙ্কর সুড়ঙ্গমধ্যের কাহিনী শোনানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছিলো তখন নাসেরের ক্যাবিনে তৈরি হয়ে নিচ্ছে জলিল। পিস্তলে গুলী ভরে নাসের পিস্তলটা জলিলের হাতে দেয়—এই নাও, অত্যন্ত সাবধানে কাজ শেষ করবে।

জলিল পিস্তলটা লুকিয়ে রাখলো পকেটে, তারপর হেসে বললো—সাবধান আমাকে করে দিতে হবে না ছোট স্যার। ঠিক আমি আজ আলম বেটাকে খতম করে তবে ছাড়বো। কিন্তু আমার বখশীসটা......

ও ব্যাপারে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, পথের কাঁটা সরে গেলেই আমি তোমাকে সন্তুষ্ট করবো।

নাসের আর জলিল যখন আলমকে হত্যা করা নিয়ে গভীর আলোচনায় মত্ত, তখন ফুলমিয়া সব শুনছিলো দলের মধ্য হতে। ভাবছিলো, এবার জলিলের হাত থেকে পরিত্রাণ নেই আলম সাহেবের, হায় কি করে তাকে বাঁচানো যায়। কোনো উপায় স্থির করতে না পেরে ফুলমিয়া খোদাকে স্মরণ

করতে লাগলো। হে পাক পরওয়ার দেগার, আমি একজন গোনাহগার বান্দা, তোমার কাছে আমি অপরাধী,তবু একটি দোয়া আমার কবুল করো, আমার জীবন যে রক্ষা করেছে তার জীবন তুমি রক্ষা করো, এই আমার মোনাজাত......

❑

সমস্ত ক্যাবিন নিস্তব্ধ। সবাই ব্যাকুল আগ্রহে তাকিয়ে আছে আলমের মুখে। বলে চলেছে আলম—সুড়ঙ্গ মধ্যে প্রবেশ করতেই একটা তীব্র ভ্যাপসা গন্ধ আমার নিশ্বাসকে রুদ্ধ করে দিতে লাগলো! প্রথমে মনে হলো, আমি এ গন্ধ সহ্য করতে পারবো না। হতাশ হয়ে পড়লাম, সুড়ঙ্গে প্রবেশ করা আমার বৃথা হলো, এবার ফিরে যেতে হবে, তবু আমি সহ্য করার চেষ্টা করতে লাগলাম, ভাগ্যিস্ আমার সঙ্গে অক্সিজেন গ্রহণের যন্ত্রটা ছিলো তাই রক্ষা পেলাম। আমি মুখে মুখোস পরে অক্সিজেন গ্রহণ করতে লাগলাম। থামলো আলম।

কক্ষমধ্যে সকলে স্তব্ধ হয়ে শুনে চলেছে। কারো মুখে কোনো কথা নেই।

পুনরায় বলতে শুরু করলো আলম—কিছুদূরে অগ্রসর হতেই বুঝতে পারলাম, সেটা কোনো সুড়ঙ্গপথ বা গুহা নয়। কোনো এককালে এখানে বাড়িঘর ছিলো, তাই বসে গেছে গভীর মাটির তলায়। টর্চের আলোতে আমি সব স্পষ্ট দেখতে লাগলাম। কক্ষগুলো শত শত বছর আগের অথচ ঠিক পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক রয়েছে। কোনো কোনো স্থানে যদিও কিছু কিছু অংশ ধসে পড়েছে তবু কক্ষগুলোর কোনো রকম বিকৃতি ঘটেনি। আরও আশ্চর্য হলাম, কক্ষগুলোর মধ্যে নানা রকম আসবাবপত্র সাজানো রয়েছে, তবে মাটি এবং ধূলোবালিতে সেসব জিনিসপত্র কিসের তৈরি বা কি জিনিস বোঝা মুস্কিল। যদিও আমার খুব ভয় হচ্ছিল, হয়তো বেশিক্ষণ এখানে ঠিক থাকতে পারবো না ভাবছিলাম—কারণ অক্সিজেন গ্রহণেও আমি ঠিকভাবে নিশ্বাস নিতে পারছিলাম না।

বললেন আবু সাঈদ— কি ভয়ঙ্কর অবস্থা থেকে তুমি ফিরে এসেছো আলম!

হাঁ স্যার, সে কথা মিথ্যা নয়। আমি টর্চের আলো নিক্ষেপ করে দেখতে লাগলাম। ভেবেছিলাম, বহুকালের ভূগর্ভে ধসে পড়া এসব কক্ষে নিশ্চয়ই নানারকম জীবজন্তু বসবাস করছে। কিন্তু অবাক হলাম, একটি মাকড়সাও আমার নজরে পড়লো না। সাপ বিছা বা ইঁদুর কিছুই নেই। হঠাৎ আমার টর্চের আলোতে এক অদ্ভুত জিনিস দেখলাম—ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে পড়েছিলাম একেবারে, দেখলাম মেঝেতে পড়ে আছে পাশাপাশি দুটো মানুষের দেহ......

আবু সাঈদ এবং আরও কয়েকজন পর্যটক মহোদয় একসঙ্গে বিস্ময়-ভরা কণ্ঠে বলে উঠলেন—মানুষের দেহ!

হাঁ, মৃতদেহ! প্রথমে চমকে উঠলেও অল্পক্ষণেই বুঝতে পেরেছিলাম—দেহ দুটো প্রাণহীন। আমি টর্চের আলো ফেলে এগিয়ে গেলাম দেহ দুটির পাশে।

ক্যাবিনে যেন টু শব্দটি নেই, সকলে নিশ্বাস বন্ধ করে শুনছিলো আলমের কথাগুলো।

আলম যখন বলে চলেছে—ওদিকে তার মৃত্যুদূতের মত অন্ধকারে আত্মগোপন করে এগিয়ে আসছে জলিল, দক্ষিণ-হস্তে তার গুলীভরা পিস্তল। মুখে গালপাট্টা বাঁধা, দেহে লাঠিয়াল সর্দারের মজবুত পোশাক।

সমস্ত জাহাজ নিশ্চুপ নিঝুম।

যার-যার ক্যাবিনে সবাই বসে বসে খোদার নাম স্মরণ করছে। আর বেশির ভাগ লোকই আবু সাঈদের ক্যাবিনে। সকলে তারা উপস্থিত বিপদ-আপদের কথা ভুলে গিয়ে আলমের রহস্যময় উক্তিগুলো শুনছিলো।

নাসের বসে আছে দলবল নিয়ে, তার চারপাশে ঘিরে বসেছে শম্ভু, জম্বু আর অন্যান্য লাঠিয়াল। জলিল একশত স্বর্ণমুদ্রা পাবে, সেই লোভে সে একাই চলে গেছে আলম-হত্যায়। কাউকে সঙ্গে নিতে রাজি নয়, একশত স্বর্ণমুদ্রায় ভাগও দেবে না জলিল—এই তার ইচ্ছা।

ক্ষুব্ধ শার্দূলের মত জলিল অন্ধকারে এগুচ্ছে।

ঠিক তার কয়েক হাত দূরে অতি গোপনে তাকে অনুসরণ করছে ফুলমিয়া, হাতে তার সুতীক্ষ্ণ ধার ছোরা। জলিল ফাঁকে পিস্তলের আগা প্রবেশ করিয়ে লক্ষ্য ঠিক করবে, তখন ফুলমিয়া পিছন থেকে আচমকা তার পিঠে ছোরা বসিয়ে দেবে। এই অভিসন্ধি নিয়েই সে এক্ষণে অগ্রসর হচ্ছে।

যাকে হত্যা করার নেশায় জলিল ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে, সেই নাবিক আলম—দস্যু বনহুর তখন সেই দ্বীপের অভ্যন্তরের রহস্যময় কাহিনী ব্যক্ত করে চলেছে....বলছে বনহুর—ভালভাবে লক্ষ্য করে বুঝতে পারলাম, একটি পুরুষ দেহ অন্যটি নারী, কিন্তু তাদের দেহে কোনো আবরণ ছিলো না, ধূলো-মাটি আর কাদা ছাড়া। আমার বিস্ময় চরমে উঠলো, মৃতদেহগুলো কেমন যেন লোহার মত কালো মনে হচ্ছিলো। ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখার জন্য আমি মৃতদেহের গায়ে হাত দিয়ে চাপ দিলাম, অদ্ভুত এবং বিস্ময়কর মৃতদেহগুলো দেখতেও যেমন লৌহ-রং তেমনি লৌহের মতই শক্তও বটে। চোখমুখের আকার তেমন স্পষ্ট বোঝা যায় না। নারী এবং পুরুষ-দেহ চিনবার উপায় একমাত্র তাদের দেহের আকার, তাছাড়া কারো মাথায় কোনো রকম কেশ নেই। মৃতদেহগুলো যে শত শত বছর পূর্বের তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আবু সাঈদ বিস্ময়-বিস্ফোরিতভাবে তাকিয়ে কথাগুলো যেন গিলছিলেন, অস্ফুট ধ্বনি করলেন—মৃতদেহগুলো শত শত বছর পূর্বের—কিভাবে বুঝলে আলম'?

বললো বনহুর—কারণ দেহগুলো শুকনো কাঠের মত এবং লোহার মত শক্ত হয়ে গিয়েছিলো। শুধু ঐ দুটি মৃতদেহই আমি দেখিনি স্যার, হঠাৎ আমার নজর পড়লো, ঐ মৃতদেহ দুটির অনতিদূরে একটি শিশুর দেহ এবং তার পাশে একটি কুকুর বা ঐ ধরনের কোনো জীবের দেহ পড়ে আছে। শিশু এবং কুকুরটির দেহ পরীক্ষা করেও আমি ঐ রকম শক্ত-কঠিন মনে করলাম। থামলো বনহুর, হাই তুলে বললো—আমার তখন নিশ্বাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছিলো, কাজেই দ্রুত সবকিছু দেখা শেষ করার বাসনায় উঠে পড়লাম। টর্চের আলো ফেলে এগুতে লাগলাম সন্তর্পণে।

বললো নীহার—আলম, তোমার ভয় হলো না?

হাসলো বনহুর—মৃত্যুর গহ্বরে প্রবেশ করে ভয়! কিসের ভয় করবো মেম সাহেব'?

ঐ মৃতদেহগুলোর জন্য তোমার মনে একটুও আশঙ্কা জাগলো না?

না। কারণ জানি, মৃত সে মৃতই—জাগবে না কোনোদিন। হাঁ, তারপর কিছুটা এগুতেই দেখলাম মাঝখানে একটা দরজা কিন্তু দরজার মুখে মাটির চাপ দিয়ে বন্ধ হয়ে গেছে, তবে খুব বেশি জমাট নয়। অল্প চেষ্টাতেই দরজাটা খসে পড়লো, তখন বুঝতে পারলাম—আসলে দরজায় মাটির চাপ জমাট হয়েছিলো না, ও দরজাটাই ঠিক দেখতে ঐ রকম মাটির চাপের মত মনে হচ্ছিলো, দরজাটা খসে পড়ে অন্ধকার একটা গহবর বেরিয়ে এলো। আমি টর্চের আলো ফেলে এবং রিভলভার বাগিয়ে ধরে সেই গহ্বরে প্রবেশ করলাম।

উঃ কি সাংঘাতিক লোক তুমি! বললো নীহার।

আবু সাঈদ বলে উঠলেন—এবার বুঝতে পারছি কেন এতো বিলম্ব হলো তোমার সুড়ঙ্গমধ্যে।

বললো বনহুর—হাঁ স্যার, এসব কারণে আমার বিলম্ব ঘটেছিলো।

তারপর—সেই গহ্বরে প্রবেশ করলে তুমি?

হাঁ, টর্চের আলো ফেলে অন্ধকারময় গহ্বরে প্রবেশ করে আমি স্তম্ভিত হলাম। এ কক্ষটা আরও জমাট অন্ধকার, কারণ সম্মুখ কক্ষটায় সুড়ঙ্গমুখের কিছুটা আলোকরশ্মি প্রবেশ করছিলো তাই কিছুটা সচ্ছ মনে হচ্ছিলো। দ্বিতীয় কক্ষটায় প্রবেশ করতেই হোচট খেয়ে পড়ে গেলাম, দড়বড় উঠে টর্চের আলো ফেলতেই শিউরে উঠলাম। মেঝেতে কয়েকটা কয়লার মত কালো মৃতদেহ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ে আছে। এবার যেন আমি সত্যি ভড়কে গেলাম। মৃতদেহগুলো অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কুৎসিত দেখাচ্ছে। আমি আর দাঁড়াতে পারলাম না, চট্‌পট্‌ সরে যাবো, ঠিক ঐ সময় দেখলাম কক্ষমধ্যে

নীলাভ আলোর বেলুন ভেসে উঠলো। আশ্চর্য হলাম—এ যে ঐ আলো যে আলো, আমরা জাহাজে বসে অন্ধকারময় দ্বীপের বুকে দেখে থাকি।

কক্ষমধ্যে নীরব, সূঁচ পতনের শব্দও যেন শোনা যায়। সবাই যেন বনহুরের কথাগুলো গিলছে একটির পর একটি করে। আবু সাঈদ স্তম্ভিত হতবাক হয়ে শুনে চলেছেন।

নীহারের মুখেও কোনো কথা নেই, সেও যেন নির্বাক হয়ে পড়েছে। অন্যান্যেও চুপচাপ শুনে যাচ্ছে—বলে চলেছে বনহুর। ওদিকে জলিল ডেকের অন্ধকারে সন্তর্পণে এসে দাঁড়িয়েছে ঠিক আবু সাঈদের ক্যাবিনের পিছনে, দক্ষিণ হস্তে পিস্তল। কোন্দিক দিয়ে সে গুলী ছুঁড়বে তাই ভাবছে মনোযোগ দিয়ে।

জলিলের নিকট হতে কিছুটা দূরে একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে রুদ্ধ নিশ্বাসে সুযোগের অপেক্ষা করছে ফুলমিয়া। জলিলকে আজ সে খতম না করে ছাড়বে না, অন্ধকারে ফুলমিয়ার চোখ দুটো যেন জ্বলছে, তার সঙ্গে জ্বলছে তার হস্তস্থিত সুতীক্ষ্ণ ধার ছোরাখানা।

ঠিক ঐ সময় নিশ্চিন্ত স্বাভাবিকভাবে বলে চলে বনহুর—একটি নয়—তাকিয়ে দেখলাম সেই অন্ধকারময় গহ্বরে আরও কয়েকটি আলোর বেলুন কেউ যেন অদৃশ্য হস্তে নাড়াচাড়া করছে, আমি মুহূর্ত বিলম্ব না করে গুলী ছুঁড়লাম আলোর বেলুন লক্ষ্য করে—কিন্তু আশ্চর্য! আলো যেমন ভেসে বেড়াচ্ছিলো তেমনি বেড়াতে লাগলো। আরও অবাক হলাম, কোনোটা জ্বলছে আবার নিভে যাচ্ছে আল্‌গোছে.......

আমি আর বিলম্ব না করে দ্রুত বেরিয়ে এলাম বাইরে। অবশ্য আরও থাকবার এবং দেখবার ইচ্ছা ছিলো কিন্তু আমার অক্সিজেন নিঃশেষ হয়ে আসছিলো, কাজেই আর দেরি করা সমীচীন মনে করিনি।

বললেন আবু সাঈদ—আর বিলম্ব করা তোমার মোটেই উচিত হতো না আলম, কারণ জাহাজে ফিরবার সময় হয়ে এসেছিলো, তাছাড়াও আমরা সবাই তোমার জন্য অত্যন্ত অস্থির বোধ করছিলাম। কিন্তু তুমি যে রহস্যময় কথাগুলো বললে তা সত্যিই বিস্ময়কর। শত শত বছর পূর্বের ধসে-পড়া ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আজও মনুষ্য-মৃতদেহ কি করে এভাবে থাকতে পারে?

বনহুর বললো—ঠিক আমার মনেও ঐ প্রশ্ন জেগেছিলো স্যার......

বনহুরের কথা শেষ হয় না, জাহাজখানা হঠাৎ একপাশে হুমড়ি খেয়ে কাৎ হয়ে যায়, পরক্ষণেই আবু সাঈদের ক্যাবিনের ঠিক পিছন হতে ভেসে আসে তীব্র আর্তনাদ।

ক্যাবিনের মধ্যে সবাই এ-ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ে আচমকা, কেউ কেউ মেঝেতে লুটোপুটি খায়। কেউ বা দেয়াল ধরে কোনোরকমে সামলে নেয় নিজকে। জাহাজের প্রত্যেকটা ক্যাবিনের মধ্যে একই অবস্থা।

এই বুঝি জাহাজখানা কাৎ হয়ে তলিয়ে যাবে সাগরবক্ষে। প্রত্যেকটা ক্যাবিন-মধ্যে ভয়ার্ত আর্তনাদের গুঞ্জনধ্বনি জেগে উঠে।

সেই তীব্র মর্মভেদী আর্তনাদ হঠাৎ ভেসে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তখনই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো। জাহাজ থেকে বিরাট কিছু সাগরবক্ষে পতনের শব্দ হলো। মনে হলো, কোনো একটা গাছের গুঁড়ি যেন জাহাজ থেকে সাগরের গভীর জলে গড়িয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজখানা একটা ঝাঁকি খেয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। এবার ভীষণভাবে দুলছে জাহাজ 'পর্যটন'। মনে হচ্ছে সাগরের জলে প্রচন্ড ঢেউ-এর সৃষ্টি হয়েছে, তারই আঘাতে দোল খাচ্ছে জাহাজখানা।

কিছুক্ষণ ক্যাবিনে কারো মুখে কথা সরলো না।

বিভিন্ন ক্যাবিন থেকে তখনও ভয়ার্ত আর্তচিৎকার শোনা যাচ্ছিলো। বনহুর কোনোরকম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব না করে দ্রুত বেরিয়ে গেলো ক্যাবিন থেকে, আবু সাঈদ বা নীহার কিছু বলবার আগেই চলে গেলো সে। তার নিকটেই ছিলো রিভলভার, রিভলভার নিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে অগ্রসর হলো।

বাইরে বেরিয়ে আসতেই ডেকের ঝাপসা আলোতে দেখলো—কে একজন ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো তাকে।

বনহুর বললো—কে তুমি?

হাঁপাচ্ছে লোকটা, বললো—বাবু বাবু, আমি ফুলমিয়া.......

ফুলমিয়া ভালভাবে তাকিয়ে দেখলো, ফুলমিয়া বলির পাঠার মত থরথর করে কাঁপছে। তার মুখ যেন মরার মত ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। ভয়ার্তভাবে দেখাচ্ছে সে—বাবু, ঐদিকে দেখুন —ঐ যে ঐ দিকে....সাগরবক্ষে অন্ধকারে কি যেন দেখাচ্ছে ফুলমিয়া।

বনহুর হঠাৎ কিছু বুঝতে না পেরে দ্রুত ডেকের ধারে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগলো। গভীর জলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আড়ষ্ট হলো বনহুর, জমাট অন্ধকারে তালগাছের গুঁড়ির মত বিরাট লম্বা কিছু নজরে পড়লো, ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে তালগাছের মত লম্বা জিনিসটা। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্যই তার দৃষ্টিতে পড়েছিলো। বনহুর অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে, কালো লম্বা জিনিসটা সাগরবক্ষে অদৃশ্য হতেই ফিরে তাকালো ফুলমিয়ার দিকে।

ফুলমিয়া তখনও কাঁপছিলো ঠক্ ঠক্ করে।

অল্পক্ষণেই আবু সাঈদ, কেশব আরও কয়েকজন এসে হাজির হলেন জাহাজের ডেকে। সকলেরই চোখেমুখে উদ্বিগ্নতার ছাপ। প্রত্যেকের হস্তে রাইফেল এবং রিভলভার।

আবু সাঈদের হস্তে রিভলভার, তিনি বললেন—কি ঘটলো আলম? কি হয়েছে?

বনহুর কিছু বলতে যাচ্ছিলো, ফুলমিয়া বাধা দিয়ে বলে উঠে—স্যার, এখানে আর একদন্ড থাকবেন না, চলুন ক্যাবিনে চলুন, সব আমি বলবো......

আবু সাঈদ এবং অন্যান্যে ফুলমিয়াকে ভয়-বিহ্বলভাবে কথা বলতে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছেন, তেমনি আশঙ্কিত হয়েছেন—না জানি কি দুর্ঘটনা আজ ঘটেছে!

ততক্ষণে নাসের এবং জলিলের দলের লোকজনও ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটে আসে, ঘিরে দাঁড়ায় সবাই ফুলমিয়া আর আলমকে। কিন্তু জলিল কোথায়, নাসের জলিলের অন্বেষণে চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকায়। অনেক সন্ধান করেও নাসের জলিলকে দেখতে পায় না। অবাক হয় নাসের মনে মনে, জলিল যাকে হত্যা করতে এসেছে সেই আলম সুস্থ-সবল দেহে দাঁড়িয়ে আছে, আর সে উধাও হয়েছে। তবে কি ঐ আর্তনাদের শব্দটা জলিলের কণ্ঠের....নাসের হতভম্ব হয়ে যায়।

ফুলমিয়ার ভয়ার্ত দৃষ্টি তখনও সাগর-জলে বারবার চলে যাচ্ছিলো, বললো সে চঞ্চল কণ্ঠে—আপনারা ক্যাবিনে চলুন বাবু, আপনারা ক্যাবিনে চলুন। আমি সব বলবো......

আবু সাঈদ বললো—তাই চলো আলম, দেখি ফুলমিয়া কি বলে।

আবু সাঈদের সঙ্গে সবাই তাঁর প্রশস্ত ক্যাবিনে এসে জড়ো হলো। এমন কি নাসের, শম্ভু, জম্বু ও অন্যান্য লাঠিয়ালও এসে পড়েছে। সকলের মুখেই দুশ্চিন্তার কালো মেঘ।

ফুলমিয়াকে আবু সাঈদ একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলো কারণ সে এখনও ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিলো।

বনহুর বললো—স্যার, অত্যন্ত ভয়াবহ সংবাদ। আমার মনে হয় আজও কাউকে সেই অদ্ভুত জীবটা ভক্ষণ করে সাগরগর্ভে অন্তর্হিত হয়েছে।

অবাক কণ্ঠে বললেন আবু সাঈদ—সর্বনাশ ঘটেছে! আমারও ঐ রকম সন্দেহ হচ্ছিলো। কারণ জাহাজটা কাৎ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চিৎকারের শব্দ আমাদের কানে এসেছিলো। কিন্তু আশ্চর্য, আর্তনাদের আওয়াজটা ঠিক আমার ক্যাবিনের পিছন থেকেই ভেসে এসেছিলো বলে মনে হয়েছিলো।

ফুলমিয়া বলে উঠে—স্যার, আপনি যদি অভয় দেন তাহলে আমি যা জানি এবং দেখেছি সব খুলে বলবো।

ফুলমিয়ার কথায় আবু সাঈদ বিস্মিত হলেন, তিনিই শুধু নন, অন্যান্যেও অবাক হলো তার হেঁয়ালিপূর্ণ কথা শুনে। বনহুরও আশ্চর্য হয়ে গেলো—কি বলতে চায় ফুলমিয়া!

আবু সাঈদ বললেন—ভয়ের কোনো কারণ নেই, তুমি নির্ভয়ে বলো।

ফুলমিয়া নাসেরের দিকে এবং তার নিজের দলবলের মুখের দিকে একবার সন্দিহানভাবে তাকিয়ে নিয়ে বললো—আমি সব সত্য কথা বলবে এবং সত্য কথা বলার পর আমার মৃত্যু ঘটবে.....ছোট স্যার এবং আমার দলবল আমাকে হত্যা করবে স্যার!

নাসেরের এবং লাঠিয়াল দলের মুখে একটা অদ্ভুত ভাব ফুটে উঠলো। ফুলমিয়ার কথা তারাও ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

কক্ষস্থ সকলে একবার ফুলমিয়া এবং নাসের ও লাঠিয়াল দলের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিলো, সকলেই ফুলমিয়ার কথার মানে বুঝে উঠতে পারছিলো না।

নীহার এবং বনহুর নিশ্চুপ শুনছিলো।

বললেন আবু সাঈদ—ফুলমিয়া, তুমি যা বলতে চাও স্পষ্ট করে বলো। তারপর তুমি যদি নিহত বা নিরুদ্দেশ হও তাহলে আমি কাউকে ক্ষমা করবো না। সে যাই হোক আমি সমুচিত শাস্তি দেবো।

তখনও ক্যাবিন-মধ্যে কারো বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি।

ফুলমিয়া বলবার পূর্বে আবার একবার নাসের এবং লাঠিয়াল দলের দিকে তাকিয়ে দেখে নেয়, বলে সে—স্যার, প্রথমে একটি কথা জেনে রাখবেন, নাসের সাহেব এবং আমার দলবল মানে আমাদের সর্দার জলিল মিয়া ও তার সাঙ্গপাঙ্গ—এরা সবাই আলম সাহেবকে মন্দ চোখে দেখে। তাকে হত্যা করার জন্য ওদের অত্যন্ত আগ্রহ। বিশেষ করে নাসের সাহেবই এদের এ ব্যাপারে উৎসাহ......

গর্জন করে উঠে এবার নাসের, কারণ এতোক্ষণে সে ফুলমিয়ার মনোভাব স্পষ্ট উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে।

নাসের হুঙ্কার ছাড়তেই আবু সাঈদ বজ্রকঠিন কণ্ঠে বলে উঠেন—চুপ করে শুনে যাও নাসের, কোনো রকম গন্ডগোল করলে আমি নিজ হস্তে গুলী চালাবো।

নীহার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো নাসেরের দিকে।

ফুলমিয়ার এবার সাহস হলো, সে আলমকে হত্যা-ব্যাপার নিয়ে হেডনাবিক মকবুলের হত্যা এবং জাহাজের ইঞ্জিনে আলমকে নিষ্পেষিত করে তাকে হত্যা করার চেষ্টা—আরও পর পর আলমকে নিহত করার জন্য নাসেরের কার্যাবলি সব সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বললো।

নাসের, এবং শম্ভু, জম্বু রাগে ফুলতে লাগলো হিংস্র জন্তুর মত; কিন্তু তারা টু শব্দটি করতে সাহসী হচ্ছে না, কারণ স্বয়ং আবু সাঈদ এবং তাঁর প্রতিটি অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধব সকলেই উপস্থিত এ ক্যাবিনে। তাছাড়া স্বয়ং আলম রয়েছে সেই স্থানে, জানে ওরা আলমের শক্তির পরিচয়। আলমের হস্তে এখনও গুলীভরা রিভলভার—ক্যাবিনের উজ্জ্বল আলোতে চক্‌চক্ করছে। নাসের এবং শয়তানের দল বাধ্য হয়েই দাঁড়িয়ে রইলো খাঁচার বন্দী ধূর্ত শিয়ালের মত।

ফুলমিয়া সব বললো, আলমকে হত্যার জন্য সিঁড়ির মুখ নষ্ট করে দিয়েছিলো ঐ নাসেরের যুক্তিতে জলিলের দল এবং আলমকে বাঁচাতে যেয়েই সে নিজেকে বিসর্জন দিয়েছিলো সাগরগর্ভে। কিন্তু মহান হৃদয় আলম তাকে মৃত্যুর কবল থেকেও বাঁচিয়ে নিয়েছে।

সব শুনে নীহার ক্রুদ্ধ নাগিনীর মত ফোঁস্ ফোঁস্ করতে লাগলো। তখনই নাসেরকে জীবন্ত সাগরবক্ষে নিক্ষেপ করার জন্য পিতাকে অনুরোধ জানাতে লাগলো।

কিন্তু আলমের মুখ সচ্ছ-স্বাভাবিক, সে আজ কথাগুলো নিজ কানে নতুন করে শুনলেও বহু পূর্বেই বুঝতে পেরেছিলো, নাসের এবং জলিলের দল তাকে হত্যা করতে চায়। বনহুর বুঝেও নীরব ছিলো, কোনোদিন সে বলেনি বা জানায়নি কারো কাছে। আজ শুনে সে বিন্দুমাত্র বিস্মিত হলো না। নীরবে শুনে যেতে লাগলো ফুলমিয়ার কথাগুলো।

নীহার শুধু অবাকই হচ্ছে না, প্রত্যেকটি ছবি ভেসে উঠছে তার চোখের সামনে। কি ভয়ঙ্কর হৃদয়হীন জানোয়ার এই শয়তান নাসের। নীহারের মুখ কঠিন রক্তাভ হয়ে উঠেছে, এই দন্ডে সে যেন নাসের এবং জলিলের দলকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

ফুলমিয়া সমস্ত ঘটনা একটির পর একটি ব্যক্ত করে চলেছে। এবার শুরু করে আজকের ঘটনা। নাসেরের কাছে জলিল একশত স্বর্ণমুদ্রার লোভে আজ এই মৃত্যুভয়ঙ্কর রাত্রির অন্ধকারে আত্মগোপন করে কিভাবে সে এসেছিলো নির্দোষ নিষ্পাপ আলম সাহেবকে হত্যা করতে, কিভাবে সে গোপনে সব জেনে নিয়ে জলিলের পিছু নিয়েছিলো, কি ভাবে একখানা সুতীক্ষ্ণ ধার ছোরা লুকিয়ে নিয়োছিলো কাপড়ের মধ্যে। জলিল যখন আলম সাহেবকে গুলী ছুঁড়তে যাবে ঠিক তখন তার পিঠে ছুরিখানা বসিয়ে দেবে ভেবেছিলো কিন্তু সে ভাগ্য তার হলো না। ফুলমিয়া কাপড়ের তলা থেকে ছোরাখানা বের করে আবু সাঈদের সম্মুখে টেবিলে রাখে।

কক্ষমধ্যে কারো মুখে কথা নেই। আবু সাঈদের ক্যাবিন যেন বিচারকের আদালত কক্ষ বনে গেছে। সবাই ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে শুনে চলেছেন। আসামীর মত মুখ চুন করে বিবর্ণভাবে দাঁড়িয়ে আছে নাসের ও তাদের দলবল।

আবু সাঈদ যেন স্বয়ং বিচারক।

গম্ভীর মুখে তিনি সব শুনে যাচ্ছেন, ক্ষণে ক্ষণে তাঁর মধ্যে ভাবের পরিবর্তন আসছে, ফুলমিয়ার কথাগুলো তিনি মনোযোগ সহকারে শুনছেন।

বলে, চলেছে ফুলমিয়া—স্যার, জলিল সর্দার যখন ঠিক আপনার ক্যাবিনের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন আমিও কিছুটা দূরে একটা থামের আড়ালে এসে লুকিয়ে পড়ি। ছোরাখানা বের করে নেই হাতে, যেমনি জলিল সর্দার পিস্তল লক্ষ্য করবে তখনি আমি কাজ শেষ করবো। কিন্তু স্যার, কি বলবো গা আমার কাঁপছে। জলিল সর্দারের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ দেখি—জাহাজের গা বেয়ে উঠে এলো গাছের গুঁড়ির মত জমকালো একটা লম্বামত কি যেন। সেই ভয়ঙ্কর জীব, সঙ্গে সঙ্গে জাহাজখানা কাৎ হয়ে গেলো এক পাশে। আমি হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম কিন্তু আমার চোখ দুটো জলিল সর্দারের দিকেই রয়েছে। গাছের গুঁড়ির মত জীবটা জলিল সর্দারকে তুলে নিলো টপ করে। আমার কানে এলো জলিল সর্দারের করুণ আর্তনাদ, আমি কি দেখলাম, সে কি ভয়ঙ্কর......

এবার নাসের এবং জলিলের দলবল ভয়ে বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো। তাহলে জলিল আর আমাদের জাহাজে নেই? সে ঐ ভয়ঙ্কর জীবটার উদরে চলে গেছে। এই তো কয়েকমিনিট পূর্বে সে তার কাছ থেকে পিস্তলটা নিয়ে বেরিয়ে এলো। আলমকে হত্যা করা তার হলো না। জলিলের মত একটা পালোয়ান লোকের এই চরম পরিণতি! নাসের হঠাৎ ছুটে গিয়ে বনহুরের হাত দু'খানা চেপে ধরলো—ভাই আলম, আমাকে মাফ করে দাও; আজ থেকে তুমি আমার বন্ধু। সত্যি আমি বড় অকৃতজ্ঞ, না হলে তোমার মত একজন গুণীব্যক্তিকে হত্যার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠতাম। আজ আমার দিব্যদৃষ্টি খুলে গেছে, দেখলাম কারো সর্বনাশ করতে চাইলেই করা যায় না, বরং তারই পাল্টা সর্বনাশ ঘটে বসে। জলিল সর্দারই তার জলজ্যান্ত প্রমাণ। বন্ধু, বলো আমাকে ক্ষমা করেছো?

বনহুর হেসে বললো—নাসের সাহেব, আপনি আমার কাছে কোনো দিনই অপরাধী নন। নিজেকে নিজেই ক্ষমা করে নিন, তাহলেই দেখবেন আপনি সচ্ছ হয়ে এসেছেন।

বনহুরের শান্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ কণ্ঠস্বরে সবাই অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলো।

নাসের অপরাধীর মত মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে, আজ সে নিজের ভুলের জন্য অনুতপ্তই নয়, লজ্জিত-ব্যথিতও।

জলিলের লাঠিয়ালদের মাথাও নত হয়ে গেলো। সকলের মুখেই লজ্জা,ক্ষোভ আর অনুতাপের ছাপ ফুটে উঠেছে। সর্দারের নির্মম মৃত্যু তাদের মনকে যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে। সাহসী শম্ভু-জম্বুও ঠিক হাওয়া বেরিয়ে যাওয়া বেলুনের মত চুপসে গেছে। কারো মুখে কোনো কথা সরছে না।

ফুলমিয়ার মুখ দীপ্ত উজ্জ্বল, বনহুরের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে।

সবচেয়ে নীহার বিস্মিতা স্তম্ভিতা, নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে সে নাবিক আলমের দিকে। ওকে যতই সে দেখছে ততই যেন গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে, সমস্ত অন্তর দিয়ে অভিনন্দন জানাতে ইচ্ছা করছে তার।

আবু সাঈদ বললেন—এবার—আলম, হঠাৎ এমন একটা ঘটনা ঘটে গেলো যার জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথাগুলো শেষ না করেই আমরা অন্যমনস্ক হতে বাধ্য হয়েছিলাম। অন্যান্যের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন—আপনারা বসুন; দ্বীপের ভূগর্ভে যে রহস্য আলম উদঘাটন করেছে তা এখনও সম্পূর্ণ ব্যক্ত করা হয়নি।

ক্যাবিনস্থ সকলে আসন গ্রহণ করলেন।

বনহুরও বসলো আবু সাঈদের পাশে।

আবু সাঈদ কিছুক্ষণ মৌন থেকে বললেন—বহুকাল পূর্বে সাগরতলে ধ্বসে-পড়া ফৌজিন্দিয়া দ্বীপ যে এককালে বিরাট একটি শহর ছিলো তাতে

কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আশ্চর্য, বহুদিন এইসব বাড়ি-ঘর, দালান-কোঠা গভীর জলের নীচে ডুবন্ত অবস্থায় থেকে আবার জেগে উঠেছে দ্বীপ আকারে। অনেক দিন শহরটা সাগরতলে নিমজ্জিত থাকায় শ্যাওলা, বালি, কাদা এবং নোনা মাটির স্তর পড়ে গেছে। কাজেই বাড়ি-ঘরের ধ্বংসস্তূপের উপরে দেখলে বোঝা মুস্কিল যে, এখানে এককালে কোনো শহর বা বাড়ি-ঘর কিংবা ঐ ধরনের কিছু ছিলো। থামলেন আবু সাঈদ, তিনি নতুন মানুষ নন, অভিজ্ঞ পর্যটক এবং ভূতত্ত্ববিদ। আলমের কাছে সম্পূর্ণ ঘটনাটা শোনার পর তিনি সব কিছু বুঝতে পেরেছেন। তিনি পুনরায় বলতে শুরু করলেন—আলম যে লাশগুলো ঐ ভগ্নস্তূপের মধ্যে দেখেছে, আশ্চর্য আজও সেই শত শত বছর পূর্বের লাশ অবকৃত অবস্থায় রয়েছে। এর বিশেষ কারণ আছে যার জন্য লাশগুলো আজও পঁচে নষ্ট হয়ে যায়নি।

ক্যাবিনের মধ্যস্থ ব্যক্তিগণ সকলেই বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে শুনছেন, কারো মুখে কোনো কথা নেই।

বলছেন আবু সাঈদ—শত শত বছর গভীর সাগরতলে শহরটা নিমজ্জিত ছিলো বটে কিন্তু ঐ ভগ্নস্তূপের সব স্থানেই সাগর-জল প্রবেশে সক্ষম হয়নি। তার প্রমাণ হলো, আলম সুড়ঙ্গমধ্যে প্রবেশ করে যে ধসে-পড়া কক্ষগুলো চোখে দেখে এসেছে, ঐ কক্ষগুলো গভীর জল-মধ্যে নিমগ্ন হলেও ওগুলোতে সাগরের নোনা জল প্রবেশ করেনি, কিন্তু সাগরের জলের যে একটা তীব্র নোনা স্বাধ আছে তারই গ্যাস বদ্ধ ধ্বংসপ্রাপ্ত কক্ষমধ্যেও প্রবেশ করেছে। সেই তীব্র নোনা গ্যাসের জন্য মৃতদেহগুলো গলে পঁচে যায়নি। নোনা জিনিসে যেমন কোনো বস্তু অতি শীঘ্র নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু নোনা গ্যাসের দ্বারা যে-কোনো জীবের মৃতদেহ যুগ যুগ ধরে সংরক্ষণ করাও সম্ভব হয়। এখন আমরা বুঝতে পারছি, ঐ ভূগর্ভস্থ কক্ষমধ্যে মৃত-দেহগুলো কেন আজও অবিকৃত রয়েছে।

বনহুর বললো—স্যার, আপনি যা বললেন সেই কথা সম্পূর্ণ সত্য। আমারও ঐ রকমই মনে হয়েছিলো।

হাঁ, ঠিক্ তাই; ঐ মৃতদেহগুলো নোনা গ্যাসের দ্বারা মমি আকারে শক্ত হয়ে গেছে এবং পাশের ধসে-পড়া কক্ষে যে আলোর বেলুনগুলো আলমের দৃষ্টিগোচর হয়েছিলো সেগুলোই আমরা ঐ ফৌজিন্দিয়া দ্বীপের বুকে জাহাজ থেকে দেখে থাকি।

একজন বিজ্ঞ পর্যটক বলে উঠলেন—মিঃ সাঈদ, ঐ আলোগুলো সম্বন্ধে আপনার কি মনে হয়?

আবু সাঈদ বললেন—ঐ আলোর বেলুন সম্বন্ধে এখন আমি নিশ্চিন্ত। ঐ আলোগুলো কোনো আত্মা বা আলোকরশ্মি নয়।

তবে কি? বললো এবার নীহার।

বললেন আবু সাঈদ—আলেয়ার আলো!

আলেয়ার আলো? অবাক কণ্ঠে বললো নীহার পুনরায়।

হাঁ, বহু জীবজন্তু মাটির নীচে চাপা পড়ায় একরকম গ্যাসের সৃষ্টি হয়েছে, সে গ্যাস থেকে ঐ অস্পর্শীয় আলোর সৃষ্টি হয়। আমাদের দেশেও মাঝে মাঝে শ্মশান বা করবস্থানে ঐ রকম আলো দেখা গিয়ে থাকে, তার নাম—আলেয়ার আলো।

ক্যাবিন-মধ্যে একটা সাফল্যজনক আনন্দধ্বনি ফুটে উঠলো। আবু সাঈদ বললেন—এবার আমরা ফৌজিন্দিয়া দ্বীপের আলোর রহস্য উদঘাটনে সক্ষম হয়েছি। এখন বাকি রইলো সেই তীব্র হুইসেলধ্বনির রহস্য উদঘাটন ...... একটু থেমে বললেন তিনি পুনরায়—জানি না সে রহস্য ভেদ করা আমাদের সম্ভব হবে কিনা। আমি সত্যি দুঃখিত এবং অনুতপ্ত কারণ ফৌজিন্দিয়া দ্বীপের রহস্য ভেদ করতে গিয়ে আজ পর্যন্ত আমাদের জাহাজের অনেকেই প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন...বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো তাঁর কণ্ঠস্বর।

সেদিনের মত আর কোনো আলাপ-আলোচনা হলো না। রাত গভীর হয়ে এসেছে বলে যে-যার ক্যাবিনে চলে গেলো। সাবধানতা এবং সতর্কতার সঙ্গেই সবাই নিজ নিজ ক্যাবিনে গিয়ে আশ্রয় নিলো অবশ্য জাহাজের উপরের ক্যাবিনগুলোতেই সকলের জন্য ব্যবস্থা ছিলো।

সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং অনেক রাত অবধি নিদ্রা জাগরণে প্রত্যেক ব্যক্তিই নিদ্রিত হয়ে পড়লো। কয়েকজন পাহারাদার অবশ্য পাহারার কারণে জাগ্রত রইলো, কিন্তু তারা ক্যাবিনের বাইরে বের হওয়ার সাহসী হলো না।

বনহুর আর কেশবের বিশ্রামের জন্য আবু সাঈদের পাশের ক্যাবিনের ব্যবস্থা ছিলো। কেশব আর বনহুর শয্যা গ্রহণ করলো।

নিদ্রা-কাতুরে কেশব অল্পক্ষণেই নিদ্রাদেবীর কোলে ঢলে পড়লো। জেগে রইলো বনহুর, চোখে তার নিদ্রা নেই। ফৌজিন্দিয়া দ্বীপের আলোক-রহস্য উদঘাটিত হয়েছে বটে কিন্তু ঐ তীব্র হুইসেলের শব্দ-রহস্য এখনও ভেদ করা সম্ভব হয়নি। তবে শব্দটা যে কোনো এক ভয়ঙ্কর জীবের তাতে কোনো ভুল নেই এবং সেই জীবটাই তাদের জাহাজে বার বার আক্রমণ চালিয়ে কয়েকজনকে গলধঃকরণ করেছে।

বনহুর শয্যায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলো, এই রহস্যটা ভেদ না হওয়া পর্যন্ত তারা নিশ্চিন্ত নয়। কি সে জীব? সামান্য একটুখানি দেখবার সুযোগ পেয়েছিলো সে অতি অস্পষ্টভাবে, কি ভয়ঙ্কর জমকালো—ঠিক্ গাছের গুড়ির মত মোটা এবং মস্ত লম্বা বলেই মনে হয়েছিলো। অক্টোপাশ মনে করেছিলো সে প্রথমে, কিন্তু অক্টোপাশ নয় বুঝতে পেরেছে। কি সে জীব হতে পারে? গভীরভাবে বনহুর চিন্তা করতে লাগলো।

এমন সময় জাহাজটা যেন দুলছে বলে মনে হলো। বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে শয্যা ত্যাগ করলো, বালিশের তলা হতে রিভলভারটা টেনে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। ঠিক ঐ জীবটা পুনরায় জাহাজে উঠে আসছে বলে সন্দেহ হলো তার। সতর্কভাবে তাকালো ক্যাবিনে কেশবই শুধু নয়, আরও কয়েকজন লোকও ঐ ক্যাবিনে নিদ্রিত রয়েছে। বনহুর লঘুপদে বেরিয়ে এলো ক্যাবিন হতে। বাইরে দাঁড়িয়ে ক্যাবিনের দরজা বন্ধ করে দিলো ভালভাবে।

চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অন্ধকারে এগুতে লাগলো বনহুর, যেদিক বেশ কিছুক্ষণ পূর্বে বিরাট লম্বা দেহী জীবটা অন্তর্হিত হয়েছিলো।

সমস্ত জাহাজখানা নিস্তব্ধ, নীবর-নিঝুম। জনপ্রাণী জাহাজের ডেকে কেউ নেই। প্রায় সকলেই নিদ্রিত, যারা জেগে আছে তারাও কেউ বাইরে নেই।

জাহাজখানা এতোক্ষণ বেশ দুলছিলো, এখন হঠাৎ এক দিকে খানিকটা কাৎ হয়ে গেলো আচমকা। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ক্যাবিন থেকে ভেসে এলো নিদ্রাজড়িত আর্তনাদ। ভয়ার্তকরুণ গুঞ্জনধ্বনি। ক্যাবিন মধ্যে এ-ওর গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে, নিদ্রা ছুটে গেলো মুহূর্তে সকলের চোখ হতে।

জেগে উঠলেন আবু সাঈদ, নীহারের ঘুমও ভেঙ্গে গেলো সঙ্গে সঙ্গে। আবু সাঈদ আশঙ্কা ভরা কণ্ঠে বললেন—সর্বনাশ হয়েছে, আবার সেই নরখাদক ভয়ঙ্কর জীব হানা দিয়েছে আমাদের জাহাজে—এখন উপায়?

নীহার কম্পিতকণ্ঠে বললো—আব্বা, আমার বড্ড ভয় হচ্ছে। তখন জলিলকে খেয়েছে, এখন কাকে খাবে কে জানে। হায়, একি হলো আব্বা, আলম আর কেশবকে ছেড়ে দেওয়া তোমার উচিত হয়নি।

মা তাই তো দেখছি, আমি মস্তবড় ভুল করেছি।

বিভিন্ন ক্যাবিন থেকে তখন আর্ত কোলাহল ভেসে আসছে। জাহাজখানা কাৎ হয়ে গেছে একপাশে, না জানি কখন সাগরবক্ষে নিমজ্জিত হবে কে জানে।

ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে আবু সাঈদ আর নীহারের মুখমন্ডল।

পাশের ক্যাবিনে কেশব আর অন্যান্য নাবিকও জেগে উঠেছে; সবাই ঈশ্বরের নাম স্মরণ করছে।

হঠাৎ কেশবের হুশ হয়, বাবু কোথায়? তার বাবু......কেশব বনহুরের বিছানা শূন্য দেখেই হাউ মাউ করে কেঁদে উঠে। চিৎকার করে ডাক দেয়—বাবু—বাবু—বাবু......

কিন্তু অজস্র ভয়ার্ত কণ্ঠস্বরের মধ্যে তলিয়ে যায় কেশবের কণ্ঠস্বর। কেশব কারো কোনো বাধা না শুনে ছুটে যায় আবু সাঈদের ক্যাবিনে, হাউ মাউ করে কেঁদে বলে—স্যার, বাবু নেই, আমার বাবু নেই, বাবু নেই স্যার....

আবু সাঈদ এবং নীহার কথাটা শুনে বজ্রাহতের ন্যায় স্তব্ধ হয়ে যান।

আবু সাঈদ বলে উঠলেন—কেশব, এ তুমি কি বলছো? আলম ক্যাবিনে নেই?

না না স্যার, বাবু ক্যাবিনে নেই।

তবে কোথায় গেলো?

নীহার হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো দু'হাতে মুখ চেপে ধরে—আলম, শেষ অবধি তোমার অদৃষ্টে এই ছিলো....আব্বা তুমি ওকে খুঁজে দেখো আব্বা....

কিন্তু কার সাহস আছে ঐ মুহূর্তে ক্যাবিন ত্যাগ করে বাইরে যায়। কেশব বাইরে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলো কিন্তু আবু সাঈদের আদেশে অন্যান্য লোক তাকে ধরে ফেললো। কেশব ক্যাবিনের দেয়ালে মাথা ঠুকে বিলাপ করে চললো।

এদিকে জাহাজ তখন একটা মোচার খোলার মতই দুলছে। না জানি কোন্ মুহূর্তে তলিয়ে যাবে। প্রত্যেকটা ক্যাবিনে আর্ত-কোলাহল, মৃত্যু ভয়ে সবাই উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। ।

বনহুর তখন উদ্যত রিভলভারহস্তে সন্তর্পণে অন্ধকারে এগুচ্ছে, যেদিকে জাহাজখানা সম্পূর্ণভাবে কাৎ হয়ে রয়েছে ঐ দিকে সে আজ দেখতে চায়, জীবটা কি এবং কেমন দেখতে। দুর্দান্ত সাহস আর মনোবল নিয়ে সে অগ্রসর হচ্ছে। যে কোনো মুহূর্তে তার মৃত্যু ঘটতে পারে।

বনহুর আজ নাবিক আলম নয়—সে দস্যু বনহুর।

তার মধ্যে জেগে উঠেছে ভয়ঙ্কর প্রাণ। সে প্রাণে নেই ভয়-ভীতি বা কোনো আতঙ্কের ছাপ। এই দন্ডে যদি কেউ বনহুরের আসল রূপ দেখতো নিশ্চয়ই সে স্তম্ভিত হয়ে যেতো। কঠিন হয়ে উঠেছে তার মুখমন্ডল, চোখ দুটি দিয়ে যেন অগ্নিশিখা নির্গত হচ্ছে। নাসিকাতে দ্রুত নিশ্বাস পতনের শব্দ হচ্ছে যেমন পশুরাজ শিকারের সন্ধান পেয়ে ফোঁস্ ফোঁস্ করতে থাকে ঠিক্ তেমনি। বনহুর ক্ষিপ্তের ন্যায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে, আজ সে দেখবে জীবটা কি।

অত্যন্ত সাবধানে জাহাজের ক্যাবিনের কোল ঘেষে কখনও বা উবু হয়ে মাথা নীচু করে বনহুর এসে পড়লো পিছন ডেকে অন্ধকারময় এক স্থানে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে লাগলো, কারণ এইস্থানে তিন পাশে বিভিন্ন ক্যাবিনের দেয়াল—সম্মুখভাগ খোলা, কাজেই ঐ স্থানে দাঁড়ালে জাহাজের প্রায় সম্পূর্ণ ডেকে নজর পড়ে অথচ তাকে সহসা পিছন থেকে কেউ আক্রমণে সক্ষম হয় না। বনহুর এই স্থানে দাঁড়িয়ে তাকালো সম্মুখস্থ সাগরবক্ষে। হঠাৎ বিস্ময়ে চমকে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে ক্যাবিনের সঙ্গে ঠেশ দিয়ে মিশে দাঁড়ালো, দেখতে পেলো বনহুর—তার নিকট হতে অনেকটা দূরে খোলা ডেকের

উপরে অন্ধকারে একটা জমকালো গাছের গুঁড়ির মত কি যেন গড়াচ্ছে। ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখলো, সেই গাছের গুঁড়ি অর্ধেকটা এখনও সাগরবক্ষে ডুবন্ত অবস্থায় রয়েছে। দুটো টর্চলাইটের মত কি যেন জ্বলছে গুঁড়িটার অগ্রভাগে।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে রিভলভার থেকে গুলী ছুঁড়লো ঠিক ঐ টর্চলাইটের মত জ্বলন্ত বল দুটি লক্ষ্য করে। পর-পর কয়েকটা গুলী সে এক সঙ্গে করে বসলো নিশ্বাস বন্ধ করে। ভুলে গেল বনহুর নিজের অস্তিত্ব, বিস্মৃত হয়ে গেছে সে সমস্ত দুনিয়াটাকে। বিপুল বিক্রমে আক্রমণ করেছে ঐ ভয়ঙ্কর জীবটাকে।

বনহুরের রিভলভারের পর পর গুলীর আঘাত খেয়ে জীবটা তীব্র হুইসেলধ্বনির মত কানফাটা আওয়াজ করে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো ভীষণ এক তান্ডবলীলা। জাহাজখানা সাইক্লোন ঝড়ের মুখে মোচার খোলার মত দোল খেতে লাগলো। পর মুহূর্তে জীবটা গড়িয়ে পড়লো সাগরবক্ষে।

এবার সাগরের জলের মধ্যে শুরু হলো সেকি সাংঘাতিক তোলপাড়! জাহাজ ডুবু ডুবু অবস্থা, সমস্ত জাহাজ আর্তনাদ আর কোলাহলে ভরে উঠেছে। আর বুঝি রক্ষা নেই, এই বুঝি শেষ!

বনহুর একটা থাম ধরে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, সমস্ত দেহ তার জলের ঝাপটায় ভিজে উঠেছে। চুল, জামা-কাপড় সব একাকার হয়ে গেছে। দক্ষিণ হস্তে এখনও তার রিভলভার—বুঝতে বাকি নেই বনহুরের গুলী খেয়ে জীবটার চরম অবস্থা হয়েছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সাগরবক্ষের প্রচন্ড আলোড়ন ক্রমান্বয়ে স্থির হয়ে এলো। সাগরে জলোচ্ছ্বাস শান্ত হওয়ার সঙ্গে জাহাজখানাও যেন শান্ত হয়ে আসছে আস্তে আস্তে। আশ্বস্ত হলো বনহুর, এতোক্ষণে যেন সম্বিৎ ফিরে এলো তার। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রুমাল দিয়ে চোখমুখের পানি মুছে ফেললো।

জাহাজ শান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই জাহাজের ক্যাবিন-মধ্যের ভয়ার্ত আর্ত চিৎকার থেমে এলো, তবে মৃদু গুঞ্জন থামলো না। ক্যাবিন-মধ্যে নানারকম ভয়-বিহ্বল আলোচনা চলছে তীব্রভাবে। কিন্তু কারো সাহস হচ্ছে না বাইরে বেরিয়ে আসে।

আবু সাঈদের মত অভিজ্ঞ এবং দুঃসাহসী পর্যটক পর্যন্ত আজ একেবারে হকচকিয়ে গেছেন, তিনি কি করবেন কিছুই ভেবে পাচ্ছেন না যেন। আলমই যে আজ ঐ ভয়ঙ্কর জীবটার খোরাক হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ ছিলো না আবু সাঈদের। নীহারও পিতার মনোভাব বুঝতে পেরে কেঁদে-কেটে আকুল হয়েছে, কিন্তু ভয় আর দুর্ভাবনাই তাকে বেশি উদভ্রান্ত করে তুলেছে, এবার আর বুঝি রক্ষা নেই কারো।

হঠাৎ রিভলভারের পর-পর আওয়াজ শোনার পর আবু সাঈদ কিছুটা বিস্মিত হয়েছিলেন, ভেবে পাচ্ছিলেন না কোথায় থেকে এ গুলীর শব্দ আসছে। পরক্ষণেই শুরু হয়েছিলো সাইক্লোন ঝড়ের মত ভীষণ অবস্থা। আবু সাঈদ সব ভুলে কন্যাকে আঁকড়ে ধরেছিলেন বুকের মধ্যে—মা, আর বুঝি রক্ষা পেলাম না আমরা। এবার সাগরবক্ষে জাহাজডুবি হয়ে সবাই মরবো।

নীহার ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিলো, কোনো কথা তার মুখ দিয়ে বের হচ্ছিলো না। থরথর করে কাঁপছিলো সে পিতাকে আঁকড়ে ধরে।

কিন্তু যেই দন্ডে জাহাজ একেবারে স্থির হয়ে পড়লো তখন আবু সাঈদ নিজের রিভলভারখানা নিয়ে দ্রুত বের হতে যাচ্ছিলেন ঠিক ঐ সময় তার ক্যাবিনের দরজায় আঘাত পড়ে।

চমকে উঠেন আবু সাঈদ, তবে কি জীবটা এবার তার দরজায় এসে হানা দিলো? দরজা খুলে বের না হয়ে তিনি এক পাশে দাঁড়িয়ে রিভলভার উদ্যত করে ধরলেন।

সেই সময় পুনরায় দরজায় আঘাত হলো এবং শোনা গেলো বনহুরের কণ্ঠস্বর—স্যার, দরজা খুলুন। দরজা খুলুন--

আবু সাঈদ দরজা খুলবার পূর্বেই তাঁর পাশে দন্ডায়মান নীহার দ্রুতহস্তে দরজা খুলে দেয়, চোখেমুখে তার ফুটে উঠে আনন্দোচ্ছ্বাস।

বনহুর কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে।

নীহার ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর বুকে—আলম। আলম---

আবু সাঈদও কম খুশি হননি, এতোক্ষণ তিনি আশঙ্কা করেছিলেন—আলম আর জীবিত নেই। আবু সাঈদ নিজেও বনহুরকে বুকে আঁকড়ে ধরলেন।

ক্যাবিন-মধ্যে আরও অনেকে ছিলো, সবাই বনহুরকে ঘিরে ধরে নানারকম প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চললো।

বনহুর শান্ত কণ্ঠে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলো। কিন্তু জীবটা এখনও জীবিত আছে না তার মৃত্যু ঘটেছে বলতে পারলো না। তবে যতদূর সম্ভব জীবটা নিহতই হয়েছে বলে মনে করছে সে, কারণ পর-পর কয়েকটা গুলীই জীবটার মাথায় গিয়ে বিদ্ধ হয়েছিলো তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এসব ব্যাপার নিয়ে আলোচনার মধ্যেই একসময় পূর্ব আকাশ ফর্সা হয়ে এলো। এমন একটা ভয়ঙ্কর ঘটনার পর কেউ আর ঘুমাতে পারেনি।

ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই সবাই জাহাজের ক্যাবিন থেকে বের হয়ে এলো। বনহুর, আবু সাঈদ, কেশব আর নীহার সবার আগে, পিছনে অন্যান্যে। জাহাজের ডেকে এসে দাঁড়াতেই একজন খালাসি ছুটে এলো পিছন ডেকের দিক হতে।

সবাই তাকালো খালাসিটার দিকে।

হাঁপাচ্ছে খালাসি বেচারী, দু'চোখ ছানাবড়ার মত বড় হয়ে উঠেছে। বারবার ভয়-কাতর দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছে পিছন ডেকের দিকে, কিছু যেন বলতে চাইছে কিন্তু সহসা বলতে পারছে না, কণ্ঠ যেন আড়ষ্ট হয়ে গেছে তার।

আবু সাঈদ বললেন—কি হয়েছে বলো? কোনো ভয় নেই এখন আর।

খালাসি লোকটা হাঁপাতে হাঁপাতে বললো—ঐদিকে গিয়ে দেখুন স্যার জাহাজের গায়ে---আর বলতে পারলো না সে।

আবু সাঈদ বললেন—চলো দেখি আলম কি ব্যাপার।

বনহুর এবং অন্যান্য আবু সাঈদকে অনুসরণ করলো। জাহাজের পিছন দিকে এসে সাগরবক্ষে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই সকলেরই চক্ষুস্থির হলো, কারো মুখে যেন কথা বের হলো না সহসা। বনহুর আর আবু সাঈদ উভয়ে একবার তাকালো উভয়ের দিকে, বনহুর বুঝতে পারলো, রাত্রির অন্ধকারে তার একটি গুলীও বিফলে যায়নি।

তালবৃক্ষের মত মোটা বিরাট এক অজগর সাপ মৃত অবস্থায় জাহাজের গায়ে ভেসে রয়েছে। লম্বায় কত হাত হবে বলা মুস্কিল দেহটা গাছের গুঁড়ির মত মোটা আর কয়লার মত কালো।

নীহার ভয়ে চেপে ধরলো পিতাকে, দুরু দুরু কাঁপছে তার দেহটা।

আবু সাঈদ বললেন—মা, সব ভয় দূর হয়ে গেছে। শুধু ভয়ই দূর হয়নি নীহার, আজ ফৌজিন্দিয়া দ্বীপের সবকিছু রহস্যই উদ্ঘাটিত হয়েছে। এই সর্পরাজেরই কণ্ঠের তীব্র হুইসেলধ্বনি এতোদিন আমরা শ্রবণ করে এসেছি। এপথে যতগুলো জাহাজ গেছে তারা সবাই এই শব্দ শুনতে পেয়েছিলো এবং যত নাবিক বা জাহাজের আরোহিগণ ফৌজিন্দিয়া দ্বীপে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে তাদের প্রায় ব্যক্তিই এই সর্পরাজের উদরে প্রবেশ করেছে। আজ সেই নরখাদক সর্পরাজের জীবন নাশ ঘটেছে। ফৌজিন্দিয়া দ্বীপে আজ আর কোনো ভয় রইলো না। থামলেন আবু সাঈদ, ফিরে দাঁড়ালেন তিনি বনহুরের দিকে, পিঠে হাত রেখে বললেন—এ সবের কৃতিত্বের মূলে হলো আলম। আলম শুধু ফৌজিন্দিয়া দ্বীপের আলোক-রহস্যই উদ্ঘাটন করেনি, সে ফৌজিন্দিয়া দ্বীপের তীব্র হুইসেলধ্বনিও চিরতরে রুদ্ধ করে দিয়েছে। আর কেউ এ শব্দ পাবে না এবং কাউকে আর এভাবে জীবন বিসর্জন দিতে হবে না।

জাহাজের সাবই আনন্দধ্বনি করে উঠলো। সবাই বনহুরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো যেন। নাসের এবং জলিলের দল সবাই এসে তাকে মোবারকবাদ জানাতে লাগলো।

আবু সাঈদ এবার সর্পরাজের কতকগুলো ফটো গ্রহণের জন্য ফটোগ্রাফারকে আদেশ দিলেন। সেদিনটা সর্পরাজের দেখা এবং ফটো তোলা নিয়েই ব্যস্ত রইলো সবাই। তারপর বিশ্রাম এবং আনন্দ-উৎসব।

নীহার এক সময় নিজে এসে বনহুরকে অভিনন্দন জানালো। নিজের হাতের একটি অংগুরী খুলে পরিয়ে দিতে গেলো সে ওর আঙ্গুলে। কিন্তু বাধা দিয়ে বললো বনহুর—নীহার, তোমার পিতার উপহার আমি সানন্দে গ্রহণ করেছি, কিন্তু তোমার অংগুরী আমি গ্রহণে অক্ষম।

নীহারের মুখ গম্ভীর হলো, অভিমান-ভরা কণ্ঠে বললো—কেন? আমি কি তোমার কাছে এতোই হেয়?

বনহুর নীহারের হাত মুঠায় চেপে ধরলো—নীহার, তোমার তুলনায় আমি অতি নগণ্য, তাই তোমার অংগুরী গ্রহণ আমার সাজে না, আমি নাবিক ছাড়া কিছুই নই---

নীহার বনহুরের মুখে হাতচাপা দিলো, একথা আমি তোমার মুখে আরও কতবার শুনেছি। কিন্তু আলম, আমি জানি তুমি নাবিক নও---

নীহার!

আমার আংটি তোমাকে গ্রহণ করতেই হবে।

যদি খুশি হও তাহলে দাও।

আলম! নীহার অস্ফুট আনন্দধ্বনি করে উঠে, বনহুরের হাতখানা হাতে তুলে নিয়ে নিজের আংগুল থেকে একটি আংটি খুলে নিয়ে পরিয়ে দেয় বনহুরের হাতের আংগুলে।

নীহার অংগুরী পরিয়ে দেয়, মৃদু মৃদু হাসে বনহুর।

❑

ফৌজিন্দিয়া দ্বীপ ত্যাগ করবার পূর্বে আবু সাঈদ একটা আনন্দ-উৎসবের আয়োজন করলেন! নানারকম গান-বাজনা এবং খাওয়া-দাওয়া হবে। খালাসি হতে নাবিক এবং পর্যটকগণ সবাই এ উৎসবে যোগদান করবেন।

'পর্যটনের' যাত্রিগণের মনে আনন্দ আর ধরে না। আবু সাঈদের সবচেয়ে বেশি আনন্দ—তার এ যাত্রা জয়যুক্ত হয়েছে। সার্থক হয়েছে আলমকে পাওয়া। আবু সাঈদ আলমের কাছে সর্বতোভাবে কৃতজ্ঞ। শুধু আবু সাঈদই নন, জাহাজের প্রত্যেকটা ব্যক্তি বনহুরের সঙ্গে করমর্দন করে নিজকে ধন্য মনে করতে লাগলো। সবাই অন্তর দিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে লাগলো তাকে।

আনন্দ-উৎসব শুরু হলো।

'পর্যটনে' যে যা গান-বাজনা জানেন তিনি তাই পরিবেশন করলেন। নীহারও গীটার বাজিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করলো।

নানারকম গান-বাজনা চলেছে।

বিকেল থেকে শুরু হয়েছে উৎসব, সন্ধ্যায় উৎসব শেষ হবে।

যে ক্যাবিনে আনন্দ-উৎসব চলেছে ঐ ক্যাবিনটা ছিলো সবচেয়ে বড় এবং প্রশস্ত। এই ক্যাবিনে নানারকম বাদ্যযন্ত্র এবং খেলাধুলোর সরঞ্জাম সাজানো ছিলো। তাছাড়াও আছে রেডিও এবং টেলিভিশন সেট।

নানারকম অশান্তি আর উত্তেজনায় এ ক'দিন কারো টেলিভিশন দেখা সম্ভব হয়ে উঠেনি। আজ সবাই মনস্থ করেছে, উৎসব-শেষে সবাই টেলিভিশন দেখবেন। কারণ আজ তারা নিশ্চিন্ত, উৎসব এবং খাওয়া-দাওয়া-পর্ব শেষ হলেই ফৌজিন্দিয়া দ্বীপ ত্যাগ করবে জাহাজ 'পর্যটন'। কারণ আবু সাঈদের কাজ শেষ হয়েছে।

আনন্দোচ্ছ্বাসে জাহাজ-মধ্যে খুশির উৎস বয়ে চললো। কয়েকজন নাবিক নানারকম বাজনা বাজিয়ে শোনালো। কেউ বা গান গাইলো, কেউ বা নাচ দেখালো। ক্যাবিনের চারদিকে সোফায় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ বসে আছেন। আবু সাঈদের পাশেই বসেছে নীহার আর আলম। নাসেরও আছে তাদের পাশে। আর অন্যান্য চারদিকে ভিড় জমিয়ে দেখছে।

নানারকম হাসি-তামাশা আর গান-বাজনার মধ্যে একসময় শেষ হলো জাহাজ 'পর্যটনের' আনন্দ-উৎসব।

খাওয়া-দাওয়া-পর্ব শেষ হলো।

অল্পক্ষণ পরেই টেলিভিশন প্রোগ্রাম শুরু হলো।

আবু সাঈদ এবার সোফায় হেলান দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে সিগারেট ধরালেন।

ক্যাবিনের মধ্যে সকলেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো টেলিভিশনে।

পবিত্র কোরান তেলাওয়াতের পর শুরু হলো এডভারটাইজমেন্ট। বিভিন্ন কোম্পানীর প্রচারপত্রসহ নানারকম ছবি দেখানো আরম্ভ হলো। ব্যাঙ্ক লিমিটেড কোম্পানী থেকে শুরু করে কটন স্পিনিং এবং সিনেমা বিজ্ঞপ্তি পর্যন্ত।

বনহুর অন্যমনস্কভাবে কিছু চিন্তা করছিলো, হয়তো গত রাতের ঘটনাটাই ভাবছিলো সে, দৃষ্টি ছিলো তার টেলিভিশন সেটে। এবার 'স্বয়ংবরা' ছায়াছবির এডভারটাইজমেন্ট দেখানো হচ্ছে।

প্রডাকশান, প্রডিউসার ও পরিচালকের নামসহ স্বয়ংবরা ছবির বিজ্ঞপ্তি ভেসে উঠলো টেলিভিশনের পর্দায়। ছবির দু'একটি বিশেষ আকর্ষণীয় দৃশ্যও দেখান শুরু হলো। হঠাৎ চমকে উঠলো বনহুর, দ্রুত সোজা হয়ে বসে অস্ফুটধ্বনি করে উঠলো— নূরী।

নিস্তব্ধ কক্ষে বনহুরের কণ্ঠস্বরে সবাই তার দিকে ফিরে তাকালো।

নীহার অবাক হয়ে বললো—আলম, তুমি ওকে চেনো নাকি?

টেলিভিশনে তখন 'স্বয়ংবরা' ছবিতে নূতন পার্শ্বনায়িকা নূরীকে স্থিরচিত্রে দেখানো হচ্ছিলো। ভীলবালার বেশে নূরী দাঁড়িয়ে আছে। যদিও নূরী হাসছে কিন্তু বনহুরের দৃষ্টিতে সে দেখলো, ওর বিষাদময় করুণ রূপ, চোখেমুখে তার উদ্বিগ্নতার ছাপ। বনহুর সম্বিৎহারার মত আসন ত্যাগ করে ছুটে গিয়ে টেলিভিশন সেট দু'হাত চেপে ধরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো, কিন্তু ততক্ষণে 'স্বয়ংবরার' এ্যাডভারটাইজমেন্ট শেষ হয়ে গেছে।

আলমের এই অদ্ভুত কান্ড দেখে ক্যাবিনস্থ সবাই অবাক হয়ে গেলো। বিস্মিত হলেন আবু সাঈদ। নীহার হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছে।

বনহুর এবার বিষণ্ন মনে উঠে দাঁড়ালো টেলিভিশন সেট ত্যাগ করে। ফিরে এসে আপন আসনে বসে পড়লো ধপ করে, চোখেমুখে ফুটে উঠেছে এক ব্যাকুলতার ছাপ।

আবু সাঈদ আগ্রহ কণ্ঠে বললেন—আলম, হঠাৎ তুমি এভাবে---কথা শেষ করলেন না তিনি।

নীহারও উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছে বনহুরের দিকে।

ক্যাবিনের সকলের দৃষ্টিই তখন বনহুরকে লক্ষ্য করছে, যদিও তাদের দৃষ্টি মাঝে মাঝে চলে যাচ্ছিলো টেলিভিশনে। সকলের মনেই প্রশ্ন—ব্যাপার কি?

আবু সাঈদের কথায় বললো বনহুর—স্যার, ঐ মেয়েটি আমার আত্মীয়া।

বিস্ময়-ভরা কণ্ঠে বললেন আবু সাঈদ—তোমার আত্মীয়া?

হাঁ, বেশ কিছুদিন পূর্বে জঙ্গলে -ঢাকা এক অজানা পর্বতে সে হারিয়ে গিয়েছিলো--আনমনা হয়ে যায় বনহুর। এবার তাকে অত্যন্ত গম্ভীর চিন্তাযুক্ত মনে হয়।

টেলিভিশনে তখন চীনা-নৃত্যের দৃশ্য শুরু হয়েছে। কতকগুলো চীনা যুবতী তাদের দেশীয় নৃত্য পরিবেশন করছিলো। ক্যাবিনের প্রায় সকলেই চীনা-নৃত্যে আত্মমগ্ন হয়ে পড়লেন, বনহুর সেই ফাঁকে ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে গেলো।

আবু সাঈদও এই অদ্ভুত নৃত্যে মনোযোগী হয়ে পড়েছেন।

কিন্তু নীহারের দৃষ্টি কোনো সময় আলমের মুখমন্ডল ছাড়া টেলিভিশনের পর্দায় আকৃষ্ট হলো না। বনহুর বেরিয়ে যেতেই নীহার আলগোছে আসন ত্যাগ করে বেরিয়ে গেলো বাইরে।

ভাগ্যিস ক্যাবিনে কেশব ছিলো না তাই রক্ষা, তাহলে নূরীর ছবি টেলিভিশনে দেখে সে ব্যাকুল হয়ে উঠতো। সে কোনো কাজে তখন ক্যাবিনের বাইরে গিয়েছিলো।

বনহুর তার নিজের ক্যাবিনে ফিরে আসে, আজ ক'দিন হলো এ ক্যাবিন ত্যাগ করে সে উপরের ডেকে চলে গিয়েছিলো। নীরব-নির্জন কক্ষের শয্যায় এসে চীৎ হয়ে শুয়ে পড়লো বনহুর, গভীর চিন্তায় ডুবে গেলো সে। ---নূরীর অন্তর্ধানের পর কেটে গেছে কয়েকটা দিন! ভেবেছিলো বনহুর, নূরীকে আর কোনোদিন সে খুঁজে পাবেনা, নিশ্চয়ই সে জংলীদের কবলে পড়ে প্রাণ হারিয়েছে কিংবা কোনো জন্তু তাকে ভক্ষণ করে ফেলেছে। আজ সে সন্ধান পেয়েছে—নূরীর মৃত্যু হয়নি—না না কোনো ভুল নেই, নূরীকে

চিনতে তার এতোটুকু ভুল হবে না কোনোদিন। এক সঙ্গে তার কেটেছে শিশুকাল; কৈশোর জীবন, তারপর এখনও নূরী তাকে আবেষ্টনীর মত আঁকড়ে রেখেছিলো সর্বক্ষণ। কিন্তু নূরী কি করে বোম্বে গিয়ে হাজির হলো—শুধু তাই নয়, একেবারে চিত্রজগতে---

হঠাৎ শিয়রে কারো উপস্থিতি অনুভব করে বনহুর, পরক্ষণেই চুলে স্পর্শ একটি কমল হস্তের—আলম।

সম্বিৎ ফিরে আসে বনহুরের, উঠে না বসে যেমন শুয়েছিলো তেমনি থাকে, শুধু চোখ দুটি তুলে ধরে নীহারের মুখে, কোনো জবাব দেয় না।

বনহুর তখন চলে আসার সঙ্গে সঙ্গেই নীহারও বেরিয়ে এসেছিলো এবং সন্তর্পণে অনুসরণ করছিলো তাকে।

বনহুর সোজা তার পূর্বের ক্যাবিনে ফিরে এসে দাঁড়ালো ঠিক তার ক্যাবিনের মেঝেতে। অনেকক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো, লক্ষ্য করলো—আলম টেলিভিশনে সেই চিত্র তারকার এ্যাডভারটাইজমেন্ট দেখার পর হতে সম্পূর্ণ যেন পাল্টে গেছে। নীহার বনহুরের চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো—আলম, সত্যি করে বলো ঐ মেয়েটি তোমার কে?

বনহুর দৃষ্টি নীহারের মুখ থেকে ফিরিয়ে তাকালো ক্যাবিনের লাইটের উজ্জ্বল আলোর দিকে—আমার সঙ্গিনী?

তোমার স্ত্রী?

অস্ফুট কণ্ঠে বললো বনহুর—হঁ।

বনহুরের চুল থেকে নীহারের হাতখানা সরে আসে, চট করে উঠে দাঁড়িয়ে বলে—আলম, একটা চিত্রতারকা তোমার স্ত্রী!

নীহার উঠে দাঁড়াতেই বনহুর শয্যায় বসে পড়লো অবাক হয়ে তাকালো সে ওর মুখের দিকে। নীহারের হঠাৎ এমন বিস্ময়কর কণ্ঠস্বরে কম আশ্চর্য হয়নি বনহুর।

নীহার গম্ভীর কণ্ঠে বললো—চিত্রতারকাগণ কোনোদিন সতীসাধ্বী মেয়ে হতে পারে না, কারণ নানারকম পুরুষের সঙ্গে তাদের মিশতে হয়, নানাভাবে মন যুগিয়ে চলতে হয় তাদের---

মুহূর্তে বনহুরের মুখমন্ডল রক্তাভ হয়ে উঠে, চক্ষুদ্বয় হতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, কঠিন কণ্ঠে চিৎকার করে উঠে—নীহার?

বনহুরের অগ্নিমূর্তি নীহারকে স্তব্ধ করে দেয়, কিছুক্ষণ কোনো কথা তার মুখ দিয়ে বের হয় না। ধীরে ধীরে নীহারের চোখ দুটো নত হয়ে আসে, বলে সে—আমাকে ক্ষমা করো আলম।

নীহার বেরিয়ে যাওয়ার জন্য দরজার দিকে পা বাড়াতেই বনহুর ডাক দেয়—নীহার যেও না।

দাঁড়িয়ে পড়ে নীহার।

বনহুর নীহারের কাঁধে হাত রাখে—নীহার, আমার বুকের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠেছে, আমি পারছি না কিছুতেই নিজেকে স্থির রাখতে---বনহুর ছুটে গিয়ে বিছানায় উবু হয়ে শুয়ে পড়ে বালিশে মুখ গুঁজে কেঁদে উঠে ছোট্ট বালকের মত।

নীহার ওকে ত্যাগ করে চলে যেতে পারে না, সেও এসে বসে বনহুরের পাশে, মাথায় হাত বুলিয়ে বলে—আলম, তুমি শান্ত হও। শান্ত হও, কেঁদো না, কেঁদো না তুমি---

নীহার!

আলম! আলম, কেঁদো না—শান্ত হও। নীহার আজ অবাক না হয়ে পারে না, যে আলমকে সে লোহার মতই কঠিন সংযমী পুরুষ বলে জানে, আজ সে ভুল যেন ভেঙ্গে যায়। আলমের চোখের পানি তার চোখেও অশ্রুর বন্যা এনে দেয়।

এক সময় শান্ত হয়ে আসে বনহুর, নীহারের কোমল হস্তের স্পর্শ তার দেহ-মনে সান্ত্বনা এনে দেয়। কখন ঘুমিয়ে পড়ে সে, নীহার তখনও ওর চুলের ফাঁকে আংগুল চালনা করে চলেছে।

বনহুরের মাথাটা বালিশের উপর ঠিক করে শুইয়ে দিয়ে দেহে চাদরখানা টেনে দেয়, তারপর বেরিয়ে যায় কক্ষ থেকে।

পরদিন জাহাজ ফৌজিন্দিয়া দ্বীপ ত্যাগ করার পূর্বে বনহুর আবু সাঈদের নিকটে এসে বললো—স্যার, আমাকে বোম্বে যেতে হবে।

বেশ তো, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। বললেন আবু সাঈদ।

জাহাজ ছাড়ার পূর্বে বনহুর নিজে নাবিকের ড্রেসে সজ্জিত হয়ে ইঞ্জিন-কক্ষে প্রবেশ করলো।

জাহাজ 'পর্যটন' এবার রওয়ানা দিলো বোম্বে অভিমুখে।

আস্তানায় দস্যু বনহুর—৩২

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

ঘর্মাক্ত দেহে কালি মাখা অবস্থায় বনহুর ইঞ্জিন-কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো। বোম্বে পৌঁছতে আর মাত্র একটি দিন বাকি। বনহুর অধৈর্য হয়ে উঠেছে—শুধু নূরীর সাক্ষাৎ কামনাই তার বাসনা নয়, নূরীকে চলচ্চিত্র জগৎ থেকে সরিয়ে আনাই তার উদ্দেশ্য।

নির্জন ডেকে দাঁড়িয়ে ভাবছে নানা কথা।

এমন সময় নীহার এসে দাঁড়ালো তার পাশে। বনহুর ওর দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হলো, কেমন যেন বিষাদময় করুণ চেহারা। এলোমেলো চুল, প্রসাধনবিহীন মুখমন্ডল। চোখেমুখে যেন একটা উদাস ভাব পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে তার। এ ক'দিন নীহারের সাক্ষাৎলাভ ঘটেনি একটিবারের জন্যও। বনহুর সহসা কোনো-কথা বলতে পারলো না। নীহারের দিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো, তাকালো সম্মুখস্থ সীমাহীন জলরাশির দিকে। বনহুর অন্তর দিয়ে এ ক'দিন উপলব্ধি করেছে নীহার তাকে কতখানি ভালবেসে ফেলেছিলো। যদিও সে ওকে কোনো সময় এ ব্যাপারে উৎসাহ দেখায়নি বা প্রশ্রয় দেয়নি তবুও নীহারের মনটা যে সম্পূর্ণরূপে তার দিকে ঝুঁকে পড়েছে সহজভাবেই অনুভব করেছে সে। অবশ্য আজ শুধু নয়, এমনিভাবে আরও কতদিন কত নারীর মনে সে নিজের অজ্ঞাতে রেখাপাত করেছে যার জন্য বনহুর কিছুমাত্র দায়ী বা অপরাধী নয়।

নীহারের প্রতি করুণায় ভরে উঠে বনহুরের মন। সুন্দর ললাটে চিন্তার ছাপ পড়ে, নিজকে সচ্ছ করে নেবার জন্য প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেট কেসটা বের করে একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে।

নীহার স্তব্ধ প্রতিমার মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে যাবার জন্য পা বাড়ায়।

বনহুর মুখ ফিরিয়ে একমুখ ধোঁয়া সম্মুখে ছুঁড়ে দিয়ে বলে—শোন।

থমকে দাঁড়ায় নীহার, দৃষ্টি তখনও নত ছিলো ওর।

বনহুর সরে আসে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে, নীহারের নত মুখখানা তুলে ধরে—নীহার, কি হয়েছে তোমার?

চট করে কোনো জবাব দিতে পারে না নীহার শুধু চোখ দু'টো তুলে তাকায় বনহুরের দিকে।

বনহুর একটু হাসবার চেষ্টা করে বলে—তোমাকে কষ্ট দেবার জন্যই আমি এ জাহাজে এসেছিলাম, তাই না? নীহার, আমাকে ক্ষমা করতে পারবে না তুমি?

হঠাৎ নীহার উচ্ছ্বসিতভাবে কেঁদে উঠে বনহুরের বুকে মুখ লুকায়, বলে সে—না না না, আমি তোমাকে ক্ষমা করতে পারবো না। কেন তুমি আমার মনকে এভাবে চুরি করে নিয়েছো? কেন তুমি এসেছিলে এ জাহাজে? কেন তুমি ডুবে মরে যাওনি সেদিন ঐ সাগরের জলে।

নীহার, ঠিকই বলেছো। সেদিন সাগরবক্ষে মৃত্যু হলে আমি বেঁচে যেতাম। কিন্তু অদৃষ্ট আমাকে সে সুযোগ দেয়নি আমি তাই আজও বেঁচে আছি--একটু নিশ্চুপ থেকে বলে বনহুর —নীহার, যদি বলো এই মুহূর্তে আমি সাগরবক্ষে নিজকে বিসর্জন দিতে পারি। বনহুর নীহারের হাতখানা মুঠায় চেপে ধরে—তাহ'লে তুমি নিশ্চয়ই স্বস্তি পাবে।

নীহার পূর্বের ন্যায় নিশ্চুপ।

বনহুর নীহারের হাতখানা মুক্ত করে দিয়ে পিছন ডেকের দিকে এগিয়ে যায়, দক্ষিণ হস্তের সিগারেটটা ইতিপূর্বে নিক্ষেপ করেছিলো দূরে।

পিছনের নির্জন ডেকে এসে দাঁড়ালো বনহুর, বাতাসে তার চুলগুলো উড়ছে, মুখমন্ডল তার সচ্ছ-স্বাভাবিক।

নীহার এখনও ঠিক পূর্বের স্থানে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু দৃষ্টি তার চলে গেছে বনহুর যেখানে ডেকের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে সেইখানে। মনের মধ্যে আলোড়ন চলেছে নাইবা পেলো ওকে, তা বলে মরবে ও! বেঁচে থাকুক, হয়তো আবার সে ফিরে আসবে একদিন। তবুতো মন জানবে, এ পৃথিবীর শামিয়ানার নীচেই যে আছে, যে পৃথিবীর তলায় আছে নীহার। যাকে ভালবাসা যায় তার অমঙ্গল চিন্তা করা যায় না, কি করে ওকে মৃত্যুর হীমশীতল কোলে নির্বাসন দেবে! তা হয় না, আলমকে মরতে দেবে না। আলমই যে তাদের রক্ষাকবচ, কি ভয়ঙ্কর মৃত্যু-বিভীষিকা থেকেই না সে তাদের বাঁচিয়েছে—একবার নয় কতবার। তার পিতার ফৌজিন্দিয়া দ্বীপ অভিযান সার্থক হয়েছে, সেও ঐ ওরই জন্য। আর সে-ই কিনা মরবে, শুধু তাকে সুখী করার জন্য নিজকে বিসর্জন দেবে?

নীহার ক্ষণিকের জন্য ভেবে নিলো, তারপর দ্রুত ছুটে গিয়ে জাপটে ধরে ফেললো বনহুরকে —না না, মরতে তোমাকে দেবো না।

বনহুর গম্ভীর—স্থির কণ্ঠে বললো—কোনো লাভ হবে না আমি বেঁচে থাকলে তোমার।

জানি! কিন্তু বেঁচে থাকবে সেটাই যে হবে আমার পরম সান্ত্বনা!

নীহার!

না না, আর তুমি আমাকে নীহার বলে ডেকো না আলম। ঐ ডাক আমাকে পাগল করে তোলে, আমি—আমি হারিয়ে ফেলি নিজেকে।

তাহলে----

তুমি নাবিক, আমি মনিব কন্যা—কাজেই আমাকে---কণ্ঠ আটকে আসে নীহারের, অশ্রু-ছলছল চোখ দুটো কেমন যেন তীক্ষ্ণ মনে হয়। মুহূর্ত দাঁড়ায় না আর নীহার সেখানে—ছুটে চলে যায়।

বনহুর হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, একটা ক্লান্তির ছাপ ফুটে উঠে তার মুখে। আর কয়েক ঘন্টা আছে সে এ জাহাজে, তারপর এ জাহাজ থেকে বিদায় নিয়ে সে চলে যাবে, কোনো সম্বন্ধ আর থাকবে না এ জাহাজের কারো সঙ্গে। হয়তো আর কোনোদিন দেখা হবে না, এদের স্মৃতি তলিয়ে যাবে কোন্ অতলে। তবে এ কথা সত্য 'পর্যটন' জাহাজের প্রতিটি কথা তার মনে আঁকা হয়ে থাকবে চিরস্মরণীয় হয়ে।

ঐদিনের পর নীহারের সঙ্গে বনহুরের সাক্ষাৎ ঘটেছিলো একবার কিন্তু কোনো কথা হয়নি তাদের মধ্যে। শুধু নীরব দৃষ্টি বিনিময় ঘটেছিলো এই যা। বনহুর বেশ অনুভব করেছিলো—নীহারের ভিতরটা মোটেই সুস্থ বা স্বাভাবিক নয়। একটা অসহ্য জ্বালা ওকে দাহ করে চলেছে তা স্পষ্ট বোঝা যায় ওর মুখোভাবে।

❑

জাহাজ বোম্বের অদূরে কারোইয়া বন্দরে পৌঁছলে নাবিক আলমকে বিদায় জানাতে সমবেত হলো জাহাজ 'পর্যটন' এর যাত্রীবৃন্দ। আজ আর আলমের কোনো শত্রু নেই এ জাহাজে। 'পর্যটনের' মালিক আবু সাঈদ সাহেব হতে নাবিক এবং খালাসিগণ সবাই ব্যথা-কাতর অন্তর নিয়ে আলমকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে এগিয়ে এলো। জাহাজের প্রত্যেকেই ওকে বিদায় জানাতে গিয়ে নীরবে অশ্রু মুছলো।

বিদায়ের শেষ মুহূর্তে বনহুর অবাক হলো—সবাই যখন তাকে বিদায় জানাতে এলো তখন তাদের মধ্যে শুধু দেখতে পেলো না বনহুর আবু সাঈদ কন্যা নীহারকে।

বনহুরের অতৃপ্ত আঁখি দুটিও যেন অনন্ত পিপাসা নিয়ে খুঁজে ফিরছিলো একখানা ব্যথা-কাতর করুণমুখ। জাহাজ 'পর্যটন' থেকে চিরতরে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে সে—আর কোনোদিন এ জাহাজে ফিরে আসবে কিনা জানা নেই। তাই বনহুর একবার জাহাজের প্রতিটি প্রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কামনা করে। সহস্র ভীড়ের ফাঁকে একবার দেখতে চায় সেই মুখ খানাকে, যে মুখ তার মনকেও বিচলিত করে তুলেছিলো কোনো এক দুর্বল মুহূর্তে। অন্তরের নিভৃত কোণে একটা তীব্র জ্বালা অনুভব করে, ঐ বিদায় যেন তার কাছে সম্পূর্ণ সচ্ছ মনে হয় না।

কেশব সামান্য কিছু আসবাবসহ এসে দাঁড়ালো বনহুরের পাশে—বাবু, ফুলমিয়া আমাদের সঙ্গে যেতে চায়।

গভীর একটা চিন্তার অতলে তলিয়ে গিয়েছিলো বনহুর, কেশবের কথায় যেন সম্বিৎ ফিরে আসে তার—চোখ তুলে বলে, ফুলমিয়া আমাদের সঙ্গে যেতে চায়?

হাঁ বাবু।

কিন্তু আমি কোথায় যাব নিজেই তো জানি না এখন।

কেশব কিছু বলবার পূর্বে পিছন থেকে সরে আসে ফুলমিয়া —দেখেন বাবু সাহেব, আমাকে আপনি নিয়া চলেন।

ফুলমিয়া, তুমি আমার সঙ্গে কোথায় যাবে?

যেখানে আপনি যান সেখানে যাবো। দুনিয়ায় আপনজন বলতে আমার কেউ নেই, আমি চিরদিন থাকবো আপনার সঙ্গে।

বনহুর কিছুক্ষণ নির্বাক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকিয়ে রইলো ফুলমিয়ার দিকে।

সেই অবসরে বললো কেশব—বাবু ওকে ছেড়ে যাবেন না। ফুলমিয়া আমাদের সঙ্গে থাকলে ভালই হবে।

বেশ, আমার সঙ্গে কষ্ট যদি মাথা পেতে নিতে চাও তবে চলো। তবে হাঁ আমি কোনো সময় তোমাদের দূরে সরিয়ে দেবো না, যদি যাই আমিই যাবো।

ফুলমিয়া অতোশত বোঝে না। আলম যে তাকে সঙ্গে নিতে রাজি হয়েছে এটাই তার বড় সৌভাগ্য। খুশি হলো ফুলমিয়া।

আবু সাঈদ বিদায় মুহূর্তে বনহুরকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন —আলম, তোমাকে দেবার মত আমার কিছু নেই। তুমি যে উপকার করেছো তার মূল্য হয় না। আমার যথাসর্বস্ব দিলেও আমি তৃপ্তি পাবোনা। এই নাও এক লক্ষ টাকার একখানা চেক তোমাকে দিলাম—প্রয়োজন হতে পারে।

হাসলো বনহুর—চেকের কোনো প্রয়োজন হবে না স্যার। আপনার অন্তরে স্নেহ আর প্রীতির কথা চিরদিন স্মরণ থাকবে। বনহুরের চোখ দুটো নিজের অজ্ঞাতে একবার ঝাপসা হয়ে এলো। বনহুর নিজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের পুটলিটা পিঠে তুলে নিয়ে অগ্রসর হলো।

কিছুদূর এগুতেই সম্মুখে এসে দাঁড়ালো নীহার ঝড়-বিধ্বস্ত ছিন্নলতার মত বিষণ্নভাবে।

বনহুর চমকে উঠলো—তুমি!

বললো নীহার—হাঁ আমি। আলম, ফুলমিয়াকে তুমি গ্রহণ করতে পারলে আর আমি তোমার কাছে এতোই তুচ্ছ? ফুলমিয়ার মত এতটুকু কৃপার পাত্রী নই কি আমি তোমার কাছে?

মেম সাহেব, আপনি শুধু ফুলমিয়া নয়, আমার চেয়ে আপনি অনেক অনেক উর্ধ্বে। আমার মত নগণ্যহীন ব্যক্তি আপনার মত মহৎপ্রাণ নারীর নাগাল পেতে পারে না। আপনি আমাকে মাফ করবেন মেম সাহেব--- বনহুর কথা শেষ করে দ্রুত জাহাজ ত্যাগ করে নেমে গেলো।

বজ্রা হতের ন্যায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো নীহার।

আবু সাঈদ আজ ক'দিন কন্যার মনোভাব অনুভব করেছিলেন, তিনি যে একেবারে এসব জানতেন না তা নয়। কিন্তু নীহার যে আলমকে এতোখানি ভালোবেসে ফেলেছিলো আজ তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করলেন। আলম আর নীহার যখন কথা বলছিলো আবু সাঈদ কন্যার পিছনে এসে দাঁড়ান,হাত রাখেন কন্যার কাঁধে—মা নীহার!

পিতার কোমল কণ্ঠ নীহারের মনের বাঁধ যেন ভেঙ্গে দেয়, হঠাৎ উচ্ছ্বসিতভাবে কেঁদে উঠে সে দু'হাতে মুখ ঢেকে।

আবু সাঈদের চোখ দুটোও ভিজে উঠে, কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে, কন্যাকে সান্ত্বনা দিতে যান কিন্তু পারেন না, আলম যে তাঁর মনেও গভীরভাবে রেখাপাত করে গেছে, কোনো দিনই ওর কথা ভুলতে পারবেন না আবু সাঈদ।

❑

বোম্বে শহর।

যদিও এ শহরটা বনহুরের কাছে নতুন তবু সে এতটুকু বিচলিত হলো না। কেশব আর ফুলমিয়াসহ একটা হোটেলে আশ্রয় নিলো।

পাশাপাশি দুটো কামরা ভাড়া নিলো বনহুর নিজেদের জন্য। একটা কামরায় বনহুর স্বয়ং থাকবে আর একটিতে ফুলমিয়া ও কেশব।

বোম্বে পৌঁছেই দরকারী জিনিসপত্র কেনা-কাটা করে নিলো বনহুর নিজের হাতে। কি কিনলো না কিনলো সব জিনিসের সংবাদ রাখলো না কেশব আর ফুলমিয়া।

সবচেয়ে তার সর্বক্ষণের সাথী হলো নাসেরের সেই রিভলরখানা। যথেষ্ট গুলীও বনহুর সংগ্রহ করে নিয়েছিলো আবু সাঈদের নিকট হতে। বনহুর তাই নিশ্চিন্ত, চলাফেরা করতে তার কোনো অসুবিধাই হবে না।

যে হোটেলে বনহুর সঙ্গীদ্বয়সহ আশ্রয় নিয়েছিলো সে হোটেলটি বোম্বের নামকরা না হলেও খুব ছোট নয়। হোটেলটি বোম্বের ফুলাগু রোডের প্রায়

শেষ প্রান্তে অবস্থিত ছিলো। রোডের নাম অনুসারেই হোটেলটার নাম করা হয়েছিলো ফুলাগু হোটেল।

ফুলাগু সুন্দর পরিচ্ছন্ন না হলেও মোটামুটি মন্দ নয়। হোটেলের মালিক একজন বার্মিজ। যদিও লোকটা বার্মিজ কিন্তু সে বহুকাল বোম্বে বাস করার দরুণ কথাবার্তা সব খাঁটি বোম্বাই ওয়ালাদের ভাষায় বলতো। ইংলিশও জানতো ভাল। ফুলাগু হোটেলের মালিকের নাম হলো ফাংফালিও।

বনহুর প্রথম সাক্ষাতেই ফাংফালিও এর অন্তরটা দেখে নিয়েছিলো, লোকটা মহৎ এবং ভদ্র তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রথম দিনই বেশ আলাপ জমে গেলো, খাঁটি ইংলিশে আলাপ আলোচনা হলো বনহুর আর ফাংফালিও এর মধ্যে।

স্বয়ং ফাংফালিও বনহুরের কামরা গুছিয়ে দিলো। বনহুরের আচরণে সেও যে খুব মুগ্ধ হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

নিজের ক্যাবিনে শয্যা গ্রহণ করে বনহুর আজ স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করলো। সন্ধ্যার পরই খাওয়া-দাওয়া পর্ব চুকিয়ে নিয়েছিলো, কাজেই এখন বনহুর সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত।

হোটেলে এখনও লোকজন গমগম করছে, বিভিন্ন ক্যাবিন থেকে অবসর-বিনোদ যাত্রীদের হাসি-গল্পের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। বনহুর কেশব আর ফুলমিয়াকে তাদের ক্যাবিনে শয়ন করার নির্দেশ দিয়ে নিজেও শয়ন করেছিলো এসে নিজের ক্যাবিনে।

শয্যায় শয়ন করে বনহুর সিগারেটের পর সিগারেট পান করে চললো। গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলো—কোথায় কেমনভাবে সন্ধান পাবে সে নূরীর।

বোম্বে শহর ছোটখাট নয়, তা ছাড়াও এ শহরটি বনহুরের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। প্রথমে এ শহরের প্রতিটি জায়গা তাকে বিশেষভাবে জেনে নিতে হবে। এলোমেলো কত কি চিন্তা আজ তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিলো---সব চেয়ে বেশি মনে পড়ছিলো নীহারের কথা, অবশ্য নীহারের কথা নিয়ে এখন ভেবে কোনো ফল হবে না যদিও।

বনহুর যতই নীহারের কথা বিস্মৃত হতে চেষ্টা করছিলো ততই যেন আরও গাঢ় হয়ে ভেসে উঠছিলো ওর মুখখানা মনের পর্দায়। কিছুতেই নিদ্রা আসছিলো না তার চোখে। শিয়রের টেবিলে এ্যাসট্রেটা অর্ধদগ্ধ সিগারেটে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। একটা সুমিষ্ট সুগন্ধযুক্ত ধুম্রকুন্ডলী সমস্ত কক্ষটাকে মোহময় করে তুলেছিলো। বনহুর মন থেকে নীহারের স্মৃতি মুছে ফেলতে চেষ্টা করলো—কিন্তু একি, একটি মুখ সরে যেতে না যেতে আর একটা মুখ তার মনকে আচ্ছন্ন করে তুলছিলো—শ্যালন, লুসি, মিস আরতী—আরও

কত নির্মল পবিত্র মুখ---অনেক ফেলে-আসা স্মৃতিগুলো ভীষণভাবে আলোড়ন জাগালো তার হৃদয়মধ্যে। কত নারীই না তার জীবনপথে এসেছে কিন্তু কেউ তো জয় করতে পারেনি—পারেনি পদস্থলিত করতে। বনহুর নিজকে কঠিনভাবে সংযত রেখে সবার সঙ্গে সমানভাবে মিশেছে, স্নেহ-ভালবাসা-প্রেম-প্রীতিও দিয়েছে যতটুকু সে সক্ষম হয়েছে দিতে।

আজ কেন বার বার মনে পড়ছে সেইসব অবলা সরল সহজ তরুণীগুলোর মুখ, কেন যেন আজ সবাই এক সঙ্গে এসে তার মনের পর্দায় ভীড় জমাচ্ছে। তবে কি নূরীর আকর্ষণেই আজ তার মনে এ অস্থিরতা?

বনহুর অর্ধদগ্ধ সিগারেটটা এ্যাসট্রেতে গুঁজে রেখে উঠে মুক্ত জানালার পাশে এসে দাঁড়ায়। ঘুমন্ত বোম্বে নগরীর দিকে তাকিয়ে থাকে নির্ণিমেষ নয়নে, এই শহরেরই কোনো এক নিভৃত কোণে লুকিয়ে আছে তার নূরী। এখন কি করছে সে, হয়তো ঘুমিয়ে আছে নয় কোনো ছবির সুটিং নিয়ে ব্যস্ত আছে। জানে বনহুর ষ্টুডিও ফ্লোরে রাতেও সুটিং চলে কারণ সেও একদিন চলচ্চিত্র জগতে নায়কের অভিনয় করেছে। আজ সে সব কথা মনে করে হাসি পায় তার—দস্যু বনহুর হয়েছিলো চিত্রনায়ক আর আজ নূরীও সেই জগতে গিয়ে পড়েছে কেমন করে কে জানে---। হঠাৎ বনহুরের দৃষ্টি গিয়ে পড়লো অদূরস্থ একটি লাইট পোষ্টের পাশে কোনো এক দেয়ালের গায়ে। চমকে উঠলো বনহুর, মস্তবড় একটা পোষ্টার দেয়ালের গায়ে আঁটা রয়েছে, পাশাপাশি দুটি নারী মুখ। একটি নারী অপরিচিত, আর একটি নূরীর ছবি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বনহুর বিচলিত হয়ে উঠলো, লাইট পোষ্টের উজ্জ্বল আলোতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে লাগলো।

বোম্বে শহরে প্রথম রাত বনহুরের কাটলো সম্পূর্ণ অনিদ্রায়। শয্যায় শয়ন করেও কিছুতেই দু'চোখের পাতা এক করতে পারলো না সে।

গোটা রাত অনিদ্রায় কাটিয়ে চোখ দুটো জ্বালা করছিলো আয়নার পাশে এসে দাঁড়ালো; নিজের উদভ্রান্ত চেহারার দিকে তাকিয়ে নিজেই আঁতকে উঠলো। চোখ দুটো যেন জবা ফুলের মত লাল হয়ে গেছে, সমস্ত মুখমন্ডলে ক্লান্তি আর অবসাদের ছাপ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। বনহুর কিছুক্ষণ নিজের চেহারার দিকে নিশ্চুপ তাকিয়ে আংগুল দিয়ে চুলগুলো ঠিক করে নিলো। তারপর তোয়ালেটা কাঁধে ফেলে প্রবেশ করলো বাথরুমে।

বাথরুম থেকে বের হলো যখন তখন অনেকটা সুস্থ আর সচ্ছ মনে হলো নিজেকে, চায়ের টেবিলে এসে বসতেই কেশব আর ফুলমিয়া এসে দাঁড়ালো।

বললো কেশব—বাবু, আমাদেরকে কি করতে হবে বলে দিন?

সম্মুখস্থ টেবিলে কলিং বেলটার উপরে চাপ দিতে দিতে বললো বনহুর—বসো, প্রথমে নাস্তা খেয়ে নাও তারপর কাজের কথা হবে।

কেশব আর ফুলমিয়া তাদের বাবুর সম্মুখে চেয়ারে বসতে ইতস্ততঃ করছিলো, বললো বনহুর—বসে পড়ো তোমরা।

ততক্ষণে হোটেলের বয় এসে দাঁড়ালো, খাঁটি উর্দু ভাষায় বললো—নাস্তা আনবো স্যার?

বনহুর বললো—হাঁ,নিয়ে এসো।

বয় চলে গেলো।

কেশব আর ফুলমিয়া আসন গ্রহণ করলো বটে কিন্তু কেমন যেন সঙ্কোচিতভাবে বসে রইলো।

নাস্তা এলো।

বনহুর দু'টি প্লেট ওদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো—নাও।

নাস্তা শেষে কফির কাপে চুমুক দিয়ে বললো বনহুর—কেশব, একটা পেপার নিয়ে এসো, দেখো দেখি কোন হলে 'স্বয়ংবরা' ছবি হচ্ছে।

কেশব উঠবার পূর্বেই ফুলমিয়া উঠে পড়ে; পা বাড়াতেই বলে উঠে বনহুর—কফিটা শেষ করে যাও, আর পয়সাও নিয়ে যাও বুঝলে?

কেশব বললো—কেন, আমিই তো যাচ্ছি।

ফুলমিয়া বললো—কেন, আমি থাকতে তুমি যাবে কেন? দিন পয়সা দিন----

হাত পাতে ফুলমিয়া বনহুরের সামনে।

বনহুর পয়সা দিলে চলে যায় ফুলমিয়া।

অল্পক্ষণ পরে সংবাদপত্র নিয়ে ফিরে আসে। বনহুর কাগজখানা চোখের সামনে মেলে ধরে এবং সিনেমা বিজ্ঞপ্তি গুলোর উপরে দ্রুত দৃষ্টি বুলিয়ে চলে।

হঠাৎ বনহুরের দৃষ্টি সংবাদপত্রের একস্থানে সীমাবদ্ধ হলো, 'স্বয়ংবরা' ছবির বিজ্ঞপ্তি এটা। বনহুর দেখলো, ছবিখানা এখন বোম্বের কয়েকটি হলে একযোগে চলছে—মার্জিয়া, শ্যামশাহা, রূপনারায়ণ। বনহুর দশ টাকার দু'খানা নোট পকেট থেকে বের করে বললো —কেশব, যাও মার্জিয়া সিনেমা হল থেকে 'স্বয়ংবরা'র জন্য তিনখানা টিকেট নিয়ে এসো গে।

কেশব আর ফুলমিয়া বনহুরের কথায় অবাক হলো প্রথমে, এই সাত সকালে সিনেমার টিকেট—বিস্মিত হবার কথাই তো। কিন্তু বাবুর কথায় তারা কোনোরকম উক্তি উচ্চারণ করলো না। নতমুখে কিছু চিন্তা করছে দেখে পুনরায় বললো বনহুর—সকাল সকাল সিট বুক না করলে এসব শহরে

ছবি দেখা মুস্কিল। সময়মত টিকেট পাওয়া যাবে না, তাই তিনখানা টিকেট কেটে এনে রাখবে।

এবার কেশব মাথা দোলালো—আচ্ছা।

গোটা দিন হোটেল থেকে আর বের হওয়া হলো না বনহুরের, সন্ধ্যার পূর্বে ফুলমিয়াকে বললো একটা ট্যাক্সি ডেকে আনতে।

ট্যাক্সি এলো।

বনহুর, কেশব আর ফুলমিয়াকে নিয়ে ট্যাক্সি পৌঁছলো মার্জিয়া হলের সম্মুখে। ট্যাক্সির মধ্য হতেই বনহুরের নজর গিয়ে পড়লো হলের সম্মুখস্থ পোষ্টারগুলোর উপর। নায়িকা শ্যামার পাশে নূরীর ছবিখানার দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বনহুর।

কেশবের দৃষ্টি পোষ্টারে পতিত হতেই চমকে উঠলো সে, বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো—বাবু, এ ফুল—ফুলের ছবি?

হাঁ কেশব, ফুলই বটে।

বাবু!

কেশব চলো, পরে সব বলবো।

কেশব আর ফুলমিয়াসহ হলে প্রবেশ করলো বনহুর।

ছবি শুরু হতে এখনও কয়েক মিনিট বাকি—বনহুর, কেশব আর ফুলমিয়া এসে বসলো। অল্পক্ষণ পরই ছবি শুরু হলো। বনহুরের বুকের মধ্যে আলোড়ন চলেছে, বিপুল আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে সে।

পর্দায় টাইটেল চলছে।

উন্মুখ হৃদয় নিয়ে দেখছে বনহুর। এই বুঝি নূরী নামটা এবার ভেসে উঠবে পর্দায়। নেমসিন শেষ হয়ে এলো কিন্তু 'নূরী' অক্ষর দুটো তো ভেসে উঠলো না। ভড়কে গেলো বনহুর—তবে কি তার মনের ভ্রম, ভুল করেছে সে। নিশ্চয়ই ওটা অন্য কোনো মেয়ে হবে। চিত্রজগতে চিত্রতারকাদের তো অভাব নেই। বনহুরের মনটা হঠাৎ বিমর্ষতায় ভরে গেলো।

ছবি শুরু হলো, বনহুর আনমনে তাকিয়ে আছে, হঠাৎ পর্দায় তার আকাঙ্ক্ষিত জনকে দেখে উন্মুখ হয়ে উঠলো—না না, ভুল তার হয়নি। এ যে তারই নূরী।

কেশব অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো—বাবু, এ যে ফুল!

হাঁ কেশব, ফুলই বটে। চুপ করে দেখে যাও।

ছবি দেখা শেষ করে যখন বনহুর বেরিয়ে এলো বাইরে তখন কেশব চঞ্চল কণ্ঠে বললো—বাবু ফুল কি করে সিনেমায় এলো?

বনহুর বললো—আমিও তাই ভাবছি কেশব।

এরপর পথে আর কোনো কথা হলো না, হোটেলে ফিরে বনহুর নিজ কামরায় গিয়ে সোফায় বসে পড়লো।

ফুলমিয়া আর কেশব যার-যার নিজ ক্যাবিনে আশ্রয় নিলো বটে কিন্তু কারো মনোভাব সচ্ছ ছিলো না। বনহুরের গম্ভীর হবার সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে পড়েছিলো কেশব, সে কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিলো না, যে ফুলকে তারা হারিয়েছিলো সেই সুদূর পর্বতের নির্জন বনভূমিতে কি করে তার আর্বিভাব হলো বোম্বের রূপালী পর্দায়?

কেশবের চেয়েও বেশি বিস্মিত এবং হতভম্ব হয়েছে ফুলমিয়া। ছবিগৃহে হঠাৎ কেশবকে অস্ফুট ধ্বনি করতে দেখে এবং আলম সাহেব আর কেশবকে অত্যন্ত ভাবাপন্ন হয়ে যেতে দেখে অবাক না হয়ে পারেনি সে। কিন্তু কাউকে কোনো প্রশ্ন করার সাহসও হয়নি তার।

বনহুর ছবি দেখার পর স্থির বিশ্বাসে এলো নূরীকে চিনতে তার ভুল হয়নি একটুও। নূরীকে এবার তার খুঁজে বের করতে মোটেই বিলম্ব হবে না।

পরদিন বনহুর সুন্দর দামী স্যুট পরে তৈরি হয়ে নিলো এবং মাথায় একটা ক্যাপ পরে নিলো। মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি আর গোঁফ, চোখে চশমা। হাতে ব্যাগ আর ছড়ি। মাথায় চুলের পিছন দিকে এবং সামনের কয়েক গাছা চুলে পাক ধরেছে, দাড়ির মাঝেও দু'একটা সাদা মনে হচ্ছে।

ছদ্মবেশ ধারণ করে আয়নার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো বনহুর। এখন তাকে দেখলে পঁয়তাল্লিশের কম মনে হবে না। চেহারা এবং পোশাকে ধনবান ও আভিজাত্যের ছাপ ফুটে উঠেছে।

চশমাটা খুলে সম্পূর্ণ দেহটার দিকে একবার নিপুণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দেখে নিলো, তারপর হোটেলের পিছন সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলো নীচে।

একটা ট্যাক্সি ডেকে চেপে বসলো—বোম্বে ষ্টুডিওতে চলো।

গাড়ি উল্কা বেগে ছুটতে শুরু করলো।

বোম্বে শহর।

তেল চকচকে পিচালা পথ।

অসংখ্য গাড়ির ভীড়ে বনহুরের গাড়িখানা অগ্রসর হচ্ছে। পিছন আসনে নিশ্চুপ বসে আছে বনহুর,দক্ষিণ হস্তের আংগুলের ফাঁকে অগ্নিদগ্ধ সিগারেট। পাশেই রয়েছে ছোট্ট এ্যাটাচি ব্যাগটা। পথের দু'ধারে আকাশচুম্বী অট্টালিকাগুলোর দিকে তাকিয়ে সে গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছিলো। বড় বড় অট্টালিকার সম্মুখে দোকানপাট আর প্রায় মাঝে মাঝেই হোটেল ও রেষ্টুরেন্ট রয়েছে। ফলমূলের দোকানই যেন বেশি মনে হলো। এক্কা ঘোড়ার গাড়ি এবং দোতলা বাস প্রায়ই নজরে পড়তে লাগলো। তবে পথে বেশ শৃঙ্খলার সঙ্গে যানবাহন চলাচল করছে। পথের ঠিক মাঝখান দিয়ে চলেছে

যন্ত্রচালিত গাড়িগুলো। একপাশ কেটে চলেছে ঘোড়া গাড়ি এবং টউরে গাড়ি। রাজপথের দু'পাশে ফুটপাত অসংখ্য লোকজন পায়ে হেঁটে চলাচল করছে এই ফুটপাত দিয়ে।

কর্মব্যস্ত জনমুখর বোম্বে নগরী।

বনহুর আপন মনে গভীর চিন্তায় মগ্ন।

বোম্বে আগমন করলেও বনহুর এখনও বোম্বে নগরীর সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হতে পারেনি, কারণ মাত্র দু'দিন হলো তারা এ শহরে এসেছে।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পর দূরে সুউচ্চ একটা চূড়া নজরে পড়লো। অনেকগুলো দালান -কোঠা ছাপিয়ে মাথাটা দেখাচ্ছে—মস্তবড় গুম্বজের মত দেখতে। আশে পাশে মন্দিরের চূড়ার মত আরও কতগুলি উচ্চচূড়া। বনহুর ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলো—ওটা কিসের গুম্বজ দেখা যাচ্ছে ড্রাইভার?

স্যার, ঐ যে গুম্বজ দেখছেন ওটাই তো বোম্বে ষ্টুডিও। গুম্বজগুলো ষ্টুডিও ফ্লোরের।

ওঃ তুমি দেখছি ষ্টুডিওর সব জানো?

পথের বাঁকে হ্যান্ডেলটা দ্রুত ঘুরিয়ে নিয়ে বললো ড্রাইভার —প্রায়ই আমাকে ষ্টুডিওতে আসতে হয় কিনা, তাই সব জানি স্যার।

অল্পক্ষণেই গাড়ি এসে বোম্বে ষ্টুডিওর সম্মুখে দাঁড়িয়ে পড়লো। বিরাট ফটক, ফটকের দু'ধারে দু'জন পাহারাদার রাইফেল কাঁধে দাঁড়িয়ে আছে। একজন পাহরাদার ফটক খুলে দিলো, গাড়ি প্রবেশ করলো ফটকের মধ্যে।

পাহারাদার দু'জন সেলুট করে সরে দাঁড়ালো।

বনহুর ষ্টুডিওর অফিসে প্রবেশ করলো। ষ্টুডিও সম্বন্ধে সবকিছু পূর্ব হতেই জানা ছিলো, কাজেই আজ নতুন করে তাকে বেগ পেতে হলো না, সোজা সে অফিস-রুমে প্রবেশ করে ষ্টুডিও ডাইরেক্টর মিঃ রাজেন্দ্র চন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো।

রাশভারী মানুষ মিঃ রাজেন্দ্র। কাগজপত্র নিয়ে কি যেন লিখছিলেন, চশমাসহ চোখ দুটো তুলে ধরে বললেন—বসুন।

বনহুর আসন গ্রহণ করলো।

মিঃ রাজেন্দ্র বললেন—আপনি কোথা থেকে এসেছেন জানতে পারলে—

নিশ্চয়ই জানাবো। আমি খান বাহাদুর শামস ইরানী। এতোদিন বিদেশে ছিলাম কোনো ব্যবসা উপলক্ষে, এবার বোম্বে ফিরে এসেছি। ভাবছি অন্য ব্যবসা না করে এবার ছবি করবো।

খুশি হয়ে বললেন মিঃ রাজেন্দ্র চন্দ্র—বেশ তো, ভাল কথা। আজেবাজে ব্যবসার চেয়ে ছবির ব্যবসা অনেক লাভবান। যদি ছবি একবার হিট করে

তাহলে কোনো কথাই নেই। একেবারে লালে লাল হয়ে যাবেন। দেখলেন না এ বছরের কয়েকটা ছবি কেমন মার্কেট পেলো?

হাঁ, সব জানি। বনহুর অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীর মত মাথা দোলালো। তারপর বললো—আমি আপনার নিকটে এ বিষয়ে পরামর্শ নিতে এলাম।

বেশ ভাল কথা, জিজ্ঞাসা করুন?

বনহুর একথা-সে কথার মধ্য দিয়ে অল্পক্ষণেই গভীরভাবে আলাপ জমিয়ে নিলো মিঃ রাজেন্দ্র চন্দ্রের সঙ্গে। এমন কি, কথায় কথায় 'স্বয়ংবরা' ছবির পরিচালকের ঠিকানা লিখে নিলো, তারপর বিদায় গ্রহণ করলো সে ঐ দিনের মত।

ষ্টুডিও থেকে বেরিয়ে সোজা আসলাম চৌধুরীর বাড়ি অভিমুখে রওয়ানা দিলো বনহুর। অবশ্য এখন তাকে সর্বক্ষণ ভাড়াটে গাড়িই ব্যবহার করতে হচ্ছে। মিঃ রাজেন্দ্র চন্দ্রের ওখান থেকে সোজা একেবারে পৌঁছে গেলো বনহুর পরিচালক আসলাম চৌধুরী বাসায়।

মস্তবড় দোতলা—ইংলিশ প্যাটার্ণের সবুজ রংয়ের বাড়ি। সম্মুখে বাগান; বাগানের মধ্য দিয়ে লাল কাঁকড় বিছানো পথ। পথটা সোজা চলে গেছে গাড়ি বারান্দায়।

বনহুরের গাড়ি গেট পার হয়ে গাড়ি-বারান্দার নীচে এসে থামলো। একজন ভদ্রলোক ড্রইংরুমের বারান্দায় পায়চারি করছিলেন, গাড়িখানা থামতেই এগিয়ে এলেন। ভদ্রলোকের দেহে স্লিপিং গাউন, আংগুলের ফাঁকে দামী চুরুট। বনহুর গাড়ি থেকে নেমে আদাব জানালো।

ভদ্রলোকটিকে দেখে বনহুর বুঝতে পারলো, ইনিই পরিচালক আসলাম আলী চৌধুরী হবেন।

বনহুরের অনুমান মিথ্যা নয়। আসলাম আলী একজন সম্ভ্রান্ত বয়স্ক ভদ্রলোককে দেখে করমর্দন করলেন, তারপর সঙ্গে করে ড্রইংরুমে নিয়ে বসালেন। অবশ্য কিছুটা যে তিনি বিস্মিত হননি তা নয়, কারণ এ ব্যক্তি তার সম্পূর্ণ অপরিচিত।

আসলাম আলী যখন আশ্চর্য দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছেন বনহুরের দিকে তখন বনহুর নিজকে সংযত করে নিয়ে বললো—আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যই আমার আগমন। আমার নাম শামস ইরানী, আপনিই বুঝি---

জি হাঁ, আমি আসলাম আলী।

আমি সেই রকমই অনুমান করে নিয়েছিলাম। দেখুন, আমি যা বলবো বা বলতে এসেছি সে কথা হলো—আমি একটা ছবি করবো মনস্থ করেছি, আমার ছবির কাজ আগামী মাস থেকে শুরু করবো। ছবির নাম এখনও

ঠিক করিনি তবে ছবির নাম ঠিক করবার পূর্বে ছবির পরিচালক ঠিক করে নিতে চাই।

'স্বয়ংবরা' ছবি রিলিজ পাবার পর আলী সাহেব এখন অবসরই আছেন, প্রায় একরকম বসে আছেন তিনি। অবশ্য অন্য ছবির চিন্তা তিনি করছেন। হঠাৎ নতুন একজন প্রযোজকের আগমনে আনন্দ বোধ করলেন। আলী সাহেব জানতেন, তাঁর 'স্বয়ংবরা' মুক্তি পাবার পর অমন কত প্রযোজকের আগমন হবে তাঁর বাড়িতে। মনে মনে খুশিই হলেন, আত্মগর্বে স্ফীত হয়ে উঠলো তাঁর মুখমন্ডল। শামস ইরানীকে দেখেও তিনি এ রকমই একটা আন্দাজ করে নিয়েছিলেন।

বনহুর শান্ত-ধীর কণ্ঠে বললো এবার—আমার ছবির পরিচালক হিসাবে থাকবেন আপনি, এটাই আমি আশা করি। অবশ্য আপনি যা পারিশ্রমিক চাইবেন আমি তাতেই রাজি হতে পারবো।

আলী সাহেবের চোখ দুটো চক্ চক্ করে উঠলো, মাথার চুলে হাল্কাভাবে একটু হাত বুলিয়ে নিয়ে বললেন—এ তো আমার সৌভাগ্য মিঃ ইরানী। আমিও চাই নতুন প্রযোজক যারা চলচ্চিত্র জগতে নতুন আগমন করেছেন। কারণ আমি তাদের অর্থের প্রাচুর্য আরও বাড়িয়ে দিতে চাই, সৃষ্টি করতে চাই নতুন এক বিত্তশালী জগত। যারা কোনোদিন এ জগতে আসেননি বা আসতে সাহসী হননি তাদের মনের ভুল আমি ভেঙ্গে দিতে চাই।

বনহুরের মুখে হাসির আভাস, মনোযোগ সহকারে শোনে সে আলী সাহেবের কথাগুলো। বলে বনহুর—হাঁ, আমিও এর পূর্বে অন্য ব্যবসা করতাম। বিদেশে আমার কয়েকটি ইন্ডাষ্ট্রী আছে। তবু আমার ইচ্ছা ছবি করবো।

বেশ তো, অন্যান্য ব্যবসার চেয়ে এ ব্যবসায়ে যথেষ্ট লাভবান হওয়া যায়। অবশ্য খুব চিন্তা করে ছবি তৈরি করলে তাতে পয়সা যেমন আসে সুনামও তেমনি পাওয়া যায়।

আমি তেমনি একটা মনোভাব নিয়েই এসেছি আলী সাহেব। 'স্বয়ংবরা' ছবি আমার কাছে খুব ভাল লেগেছে। নিখুঁত আপনার পরিচালনা, শুধু তাই নয়, এ ছবিতে যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁদের অভিনয়ও হয়েছে অত্যন্ত প্রাণস্পর্শী। আলী সাহেব, আমার ছবিতেও আমি এইসব শিল্পীদের গ্রহণ করতে চাই।

অত্যন্ত আনন্দের কথা। আপনি যাদের পছন্দ করবেন তাদেরকেই চুক্তিবদ্ধ করা হবে।

বনহুর ভিতরে ভিতরে খুশিই হলো, এতো অল্প সময়ে এতোটা অগ্রসর হবে সে ভাবতেও পারেনি। আর বেশি এগিয়ে কাজ নেই, এতে ফল মন্দ

হতে পারে। ধীরে এগুনোই শ্রেয় মনে করে সেদিনের মত বনহুর বিদায় গ্রহণ করলো পরিচালক আলী সাহেবের বাড়ি থেকে।

হোটেলে কেশব আর ফুলমিয়া বহুক্ষণ বাবুকে না দেখে চিন্তিত হয়ে পড়েছে। হঠাৎ কাউকে কিছু না বলে সে গেলো কোথায়?

ফুলমিয়া আর কেশব যখন হোটেল থেকে বেরুতে যাচ্ছে ঠিক তখন বনহুরের গাড়ি এসে থামলো হোটেলের সম্মুখে।

বনহুরের পাশ কেটেই চলে যাচ্ছিলো ওরা।

বনহুরকে চিনতে পারে না ফুলমিয়া আর কেশব। বনহুর কিন্তু ওদের দু'জনার মুখোভাব দেখেই বুঝতে পেরেছে, ওরা অত্যন্ত ভাবাপন্ন ও চিন্তিত হয়ে উৎকণ্ঠিতভাবে কোথাও চলেছে। ওদের চিন্তার কারণ যে সে, নিজে সেটাও উপলব্ধি করে নিলো বনহুর।

ফুলমিয়া আর কেশবের সম্মুখে পথ রোধ করে বলে বনহুর —এই তোমরা শোন।

থমকে দাঁড়ালো কেশব আর ফুলমিয়া, দু'জনার মুখেই বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠেছে, প্রথম চলার পথে বাধা।

কেশব বললো—স্যার, আমাকে ডাকছেন?

হাঁ শোন।

বলুন স্যার?

তোমাদের দেখে খাঁটি বাঙ্গালি বলে মনে হচ্ছে, তোমরাই কি এই হোটেলে গত পরশু এসেছো?

হাঁ, আমরা বাঙ্গালি এবং পরশু এসেছি। বললো কেশব।

বনহুর নিজের ছদ্মবেশ নিখুঁত হয়েছে বুঝতে পারলো, কারণ কেশব আর ফুলমিয়া তাকে একটুও সন্দেহ করেনি। বনহুর বললো—ওঃ তোমরাই তাহলে আমার বন্ধু আলমের সঙ্গীদ্বয়?

কেশব আর ফুলমিয়ার মুখটা উজ্জ্বল হলো, যাক এই অজানা অচেনা জায়গায় তবু পরিচিত একজনকে পাওয়া গেলো। খুশি হলো বটে মুহূর্তের জন্য তারপর মুখোভাব গম্ভীর করে বললো কেশব—স্যার, সকাল বেলা তিনি বাইরে গেছেন এখনও ফিরে আসেননি, আমরা তাই তাকে---

খুঁজতে যাচ্ছিলে বুঝি?

হাঁ, স্যার তিনি যে কেন এখনও আসছেন না ভেবে পাচ্ছি না আমরা।

তা তোমরা তাকে কোথায় খুঁজে পাবে? বিরাট শহরে কোথায় কি কাজ নিয়ে গেছে তাই বা কে জানে। যাক, আমি তাকে দেখি কোথাও পাই কিনা। তোমরা যাও, নিজের কামরায় চলে যাও।

কেশব আর ফুলমিয়া এতক্ষণে একজন দরদীর সন্ধান পায়। কতকটা আশ্বস্ত হয়ে ফিরে যায় হোটেলে।

বনহুর পিছন সিঁড়ি দিয়ে উঠে যায় উপরে নিজ ক্যাবিনে। তারপর দ্রুতহস্তে ড্রেস পরিবর্তন করে নেয়।

বাথরুম থেকে যখন বেরিয়ে আসে তখন তাকে দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না এই যুবক কিছু পূর্বের সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক। সুন্দর মুখমন্ডলে বনহুরের নেই কোনো ক্লান্তি বা অবসাদের ছাপ বরং অন্যদিনের চেয়ে আজ তাকে অনেক সচ্ছ মনে হচ্ছে। একটু পরে বনহুর ডাক দেয় কেশব আর ফুলমিয়াকে।

কেশব আর ফুলমিয়া অবাক হয়ে যায়, বিস্ময়ভরা নয়ন নিয়ে ওরা দু'জন তাকিয়ে থাকে বনহুরের দিকে।

কেশব বলে উঠে—বাবু, আপনি কোথায় গিয়েছিলেন? আর এলেনই বা কখন?

কেন, তোমরা বুঝি খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলে?

তা আর হবো না বাবু, না হয়ে যে উপায় ছিলো না। এই বিদেশ বিভূঁই জায়গায় কি বিপদ যে কখন ঘটে--

আমার জন্য কিছু ভেবো না তোমরা। বসো কেশব আর ফুলমিয়া কথা আছে তোমাদের সঙ্গে।

কেশব আর ফুলমিয়া আসন গ্রহণ করলো।

কেশব বললো—বাবু, বোম্বে শহরে আপনার কোনো বন্ধু আছে কি?

আমার বন্ধু! অবাক হওয়ার ভান করে বলে বনহুর।

ফুলমিয়া বলে এবার—স্যার, আপনার বন্ধুই হবে। বেশ ভদ্রলোক বলে মনে হলো।

হাঁ বাবু, খুব ভদ্রলোক—চোখে চশমা, হাতে ঘড়ি---

কেশবের কথার মাঝখানে বলে উঠে বনহুর—বোম্বে শহরে আমার তো কোনো বন্ধু নেই। শোন কেশব আর ফুলমিয়া তোমরা এ দেশের কাউকেই বিশ্বাস করবে না। হঠাৎ কারো কাছে কোনো কথাও বলবে না কোনো সময়, কারণ কখন যে কে আমাদের বিপদে ফেলার জন্য ওৎ পেতে বসে আছে, বুঝতে পারবে না।

কেশব আর ফুলমিয়া মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিলো। লোকটা যে তাদের কাছে মিথ্যা বলেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বনহুর বলে—কেশব, তুমি তো জানো, আমরা এই বোম্বে শহরে কেন এসেছি?

হাঁ বাবু জানি ফুলকে খুঁজতেই আপনি---

শুধু আমি নই, ফুলের সন্ধান করতে গেলে বা তাকে খুঁজে বের করতে হলে তোমাদের উভয়ের সহযোগিতাও আমার দরকার হতে পারে।

কেশব ইতিমধ্যে ফুলমিয়ার কাছে নূরী সম্বন্ধে সব কথা খুলে বলেছিলো। গতরাতে সিনেমা দেখে আসার পর বনহুর কেশবকে বলেছিলো ফুলমিয়াকে নিভৃতে সব ঘটনা যেন খুলে বলে। সে সঙ্গে আছে। তাছাড়া নূরীকে খুঁজে বের করতে হলে তাকেও প্রয়োজন হতে পারে।

বনহুরের কথাতেই কেশব সব খুলে বলেছে ফুলমিয়ার কাছে। কাজেই আজ বাবুর কথায় অবাক হলো না, সব সে বুঝতে পারছিলো।

বলে চলে বনহুর—কেশব, আমি নূরীর সন্ধান পেয়েছি। সে যে বেঁচে আছে এ ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ। কিন্তু এখনও জানি না সে কোথায় আছে। কেশব, নূরীকে খুঁজে বের করতে আমার বেশি বিলম্ব হবে না। তবে তাকে উদ্ধার করতে হলে আমাকে যথেষ্ট চেষ্টা করতে হবে এবং তোমাদের সহায়তা একান্ত দরকার হবে আমার।

কেশব বললো—বাবু, ফুলকে উদ্ধার করতে আমরা প্রাণ দিতে পারি। বলুন বাবু, কি করতে হবে আমাদের?

ফুলমিয়া বললো—তিনি এখন কোথায় আছেন সন্ধান পেয়েছেন স্যার? যদি সন্ধান পেয়ে থাকেন আমাকে বলুন, আমি লাঠি দিয়ে তাদের মাথা লাল করে আমাদের বোনকে নিয়ে আসবো।

হেসে বললো বনহুর—ফুলমিয়া, সে যেখানে আছে সেখানে সহসা কেউ যেতে পারবে বলে মনে হয় না, তাছাড়া লাঠি দিয়ে তাদের মাথা ফাটানোও সম্ভব নয়। কাজেই তোমাদের বোনকে উদ্ধার করা খুব সহজ হবে বলে মনে হয় না।

কেশব আর ফুলমিয়ার মুখ শুকিয়ে গেলো, তাহলে ফুল নিশ্চয়ই কোনো কঠিন স্থানে আটকা আছে, যেখানে তাদের প্রবেশ অসাধ্য এবং লাঠি কোনো কাজে আসে না।

বনহুর গম্ভীর মুখে চিন্তা করতে লাগলো, কারণ সে নিজেও জানে না নূরী কোথায় আছে, তবে আন্দাজে মনে হয় এমন জায়গায় সে আছে যেখানে সর্বসাধারণের গমনাগমন কঠিন।

বনহুরের চিন্তা অহেতুক নয়, নূরী এখন আসলাম আলীর আয়ত্তে এবং শ্যামারাণীর নাগপাশে আবদ্ধ। নূরীর নিজস্ব শক্তি এখানে কিছুই নেই। আসলাম আলীর হাতের পুতুল এখন নূরী।

'স্বয়ংবরা' ছবিতে নূরীকে ক্যামেরার সম্মুখে কাজ করাতে আসলাম আলী চৌধুরী হিমসিম খেয়ে গিয়েছিলেন, তবু নাছোড় বান্দা হয়েছিলেন তিনি। নূরীকে নিয়ে ছবি শেষ করতে অনেক সাধ্য-সাধনা তাঁকে করতে হয়েছে,

তবেই না আজ 'স্বয়ংবরা'র এতো সুনাম। সত্যিই ছবিটা দর্শক সমাজে একটা সুন্দর সার্থক ছবি বলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। শুধু তাই নয়, নূরীকে দর্শকমণ্ডলী অত্যন্ত প্রীতির সঙ্গে গ্রহণ করেছে। 'স্বয়ংবরা' শুধু বক্স অফিস হিট করেনি, পরিচালক আসলাম আলীকে অনেক দূর অগ্রসর করে দিয়েছে। এ ছবিতে প্রযোজক যেমন পয়সা পেয়েছেন তেমনি সুনাম পাচ্ছেন আলী সাহেব। পরিচালক জানেন, তাঁর ছবির সবচেয়ে বড় আকর্ষণ নতুন মুখ শশী।

আজকাল আসলাম আলীর কপাল খুলে গেছে যেন—একটা কোম্পানি নয়, বহু কোম্পানি থেকে তার ডাক আসছে। আরও একটি ব্যাপার হলো, আসলাম আলীর হাতেই আছে নতুন শিল্পী শশী, শশীকে ছবিতে পেতে হলেই আসলাম আলীর প্রয়োজন।

কাজেই রোজ আসলাম আলীর গাড়ি-বারান্দায় প্রযোজকদের গাড়ির ভীড় জমে উঠতো। কেউ বা আসতো ছবি পরিচালনার দায়িত্ব দেবার জন্য,কেউ বা আসতো নতুন শিল্পী শশীকে তার ছবির নায়িকার চরিত্রে গ্রহণের আশায়। আসলাম আলীর বুক গর্বে স্ফীত হয়ে উঠতো, এমন একটি রত্ন এখন তার হাতের মুঠায় যার জন্য তাঁর ভবিষ্যত যে আরও উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

শশীকে 'স্বয়ংবরা'য় কাজ করাতে যদিও আলী সাহেব হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিলেন তবু একটা আত্মতৃপ্তি ছিলো, আগামী একদিন একে নিজের মনের মত করে পাবেন। সেই বিশ্বাসেই আলী সাহেব ধৈর্য সহকারে প্রতীক্ষা করছিলেন।

এমন দিনে আবির্ভাব হলো বনহুরের। নূরীর সন্ধানেই আগমন তার, যেমন করে হোক নূরীকে চিত্রজগত থেকে সরিয়ে নিতেই হবে।

❑

গভীর রাত।

বনহুর শয্যা ত্যাগ করে নেমে দাঁড়ালো, পাশের স্যুটকেসটা খুলে বের করে ফেললো জমকালো ড্রেস। পরে নিলো--কতদিন পর আবার বনহুর এ ড্রেসে সজ্জিত হলো। দক্ষিণহস্তে তার রিভলভার। আজও নাসেরের রিভলভারখানা তার নিকটে সযত্নে রয়েছে।

নূরীকে উদ্ধার করতে হলে চাই প্রচুর টাকা। তাকে যে প্রযোজক সেজে কার্য হাসিল করতে হবে! সর্বপ্রথম চাই একখানা গাড়ি, মানে নিজস্ব মোটর কার। একটি ভাল গাড়ি কিনতে হলে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা লাগবে। আরও অন্যান্য খরচ আছে। এই মুহূর্তে তার লক্ষ টাকার প্রয়োজন।

পাশের কামরায় কেশব আর ফুলমিয়া নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে।

বনহুর মাথায় পাগড়ীটা তুলে দিয়ে পাগড়ীর খানিকটা অংশ দিয়ে মুখের নীচের দিকটা ঢেকে ফেললো, তারপর পিছন সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে নীচে নেমে গেলো। পূর্বেই হোটেল-গ্যারেজের একটা চাবি সংগ্রহ করে নিয়েছিলো বনহুর, গ্যারেজ খুলে বের করে ফেললো সে হোটেলের মালিকের গাড়িখানা যে গাড়ির চাবি আজ মালিকের নিকট হতে সংগ্রহ করে নিয়েছিলো সে।

গাড়ি নিয়ে বনহুর ছুটলো বোম্বের রাজপথ বেয়ে। রাত্রি গভীর হওয়ার জন্য পথ প্রায় নির্জন তবে একেবারে স্তব্দ নয়। মাঝে মাঝে দু'একটা প্রাইভেট কার এদিক-ওদিক ছুটে চলে যাচ্ছে।

বনহুর মাথায় পাগড়ীটা অবশ্য এখন খুলে রেখেছে পাশের আসনে কারণ হঠাৎ তার সমস্ত দেহে জমকালো ড্রেস দেখে পাহারারত পুলিশ কোনোরকম সন্দেহ করে নিতে পারে। বনহুর একটা নির্জন স্থানে গাড়ি রেখে নেমে পড়লো। কয়েকটা লৌহ যন্ত্রপাতি ইতিপূর্বেই সে সংগ্রহ করে নিয়েছিলো। বনহুর কৌশলে গাড়ির নাম্বার প্লেট খুলে গাড়ির ভিতরে আসনের নীচে রেখে দিলো।

আবার চলতে শুরু করলো গাড়িখানা।

বোম্বে আম্বিয়া হোটেলের সম্মুখে এসে গাড়ি রেখে নেমে পড়লো বনহুর। আম্বিয়া হোটেল এখন সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ হয়ে পড়েছে। শুধু একটি কক্ষে তখনও আলো জ্বলছে, এটি হলো আম্বিয়া হোটেলের ম্যানেজার শহীদ আফগানীর কক্ষ। দু'জন সহকারী নিয়ে হিসাব-নিকাশ করছিলেন। এ হোটেলে প্রতি দিনের আয় প্রায় পঁচিশ হাজারের বেশি।

বোম্বের নামকরা আভিজাত্য ঘরের নারী-পুরুষ এ হোটেলে আগমন করে থাকেন। তাছাড়াও বিদেশী লোকজনের আমদানীও হয়ে থাকে। নানা ধরনের আমোদ-প্রমোদ চলে এ আম্বিয়া হোটেলে, এ হোটেলের বিশেষ আকর্ষণ হলো ফ্যান্সী নাচ আর বিলেতী মদ। গণ্যমান্য এবং ধনবান আগন্তুকদের শুভাগমনে সন্ধ্যার পর থেকে হোটেলটা গমগম করে। বোম্বের অধিবাসিগণই বেশি।

বনহুর বোম্বে সংবাদপত্রে এই আম্বিয়া হোটেল সম্বন্ধে বিশেষভাবে জ্ঞাত হয়েছিলো। আরও বিস্তারিত জেনে নিয়েছিলো সে ফুলাগু হোটেলের মালিক ফাংফালিও-এর কাছে। বলেছিলো ফাংফালিও—সাহেব, বোম্বের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য উপায়ে পয়সা উপার্জন করে থাকে ঐ আম্বিয়া হোটেল। এখানে সবরকম পাপ কাজ সমাধা হয়ে থাকে। তেমনি পয়সাও পায় ওরা প্রচুর।

বনহুর সংবাদপত্রে এ হোটেলের ঠিকানাও জেনে নিয়েছিলো। কাজেই কোনো অসুবিধা হলো না তার এই মুহূর্তে।

বনহুর হোটেলের সম্মুখে গাড়ি রেখে নেমে পড়লো বটে কিন্তু ঠিক সম্মুখ-গেট দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলো না। পিছন দিক দিয়ে হোটেলের বাবুর্চির ক্যাবিনে প্রবেশ করলো প্রথমে; নাক ডেকে বয় আর বাবুর্চিরা ঘুমাচ্ছে। বনহুর আলগোছে বেরিয়ে এলো হোটেলের সম্মুখ দিকে। দোতলার রেলিং বেয়ে সোজা এগুতে লাগলো আলো প্রজ্জ্বলিত কামরার অভিমুখে।

বনহুর গাড়ির ভিতর হতে এই কামরাটা লক্ষ্য করে নিয়েছিলো। অন্যান্য কামরা অন্ধকার হলেও এই কামরায় তখন আলো জ্বলছিলো। বনহুর ভাবলো, এটাই হোটেলের কর্মকর্তাদের আড্ডা-গৃহ বা রাত্রির বিনোদ ভবন। কিন্তু আসলে তা নয়, এটা ছিলো এই আম্বিয়া হোটেলের ম্যানেজারের কামরা। সমস্ত দিনের হিসাব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ম্যানেজার ও তার সঙ্গীদ্বয়। পাশেই গাদা গাদা টাকার বান্ডিল সাজানো।

নিশ্চিন্ত মনে কাজ করে চলেছে ওরা কোনোরকম ভয় বা সন্দেহের কারণ নেই। হোটেলের গেটে সজাগ রাইফেলধারী পাহারাদার রয়েছে।

এমন সময় বনহুর আচমকা প্রবেশ করে সঙ্গে সঙ্গে রিভলভার উদ্যত করে ধরে সে—খবরদার নড়লে মৃত্যু!

হঠাৎ বজ্রপাতের ন্যায় স্তব্ধ হয়ে যায় আম্বিয়া হোটেলের ম্যানেজার ও কর্মব্যস্ত সঙ্গীদ্বয়। এতোক্ষণ হিসাব নিকাশের মাঝে বার বার হাই তুলছিলো ওরা, নিদ্রায় তাদের চোখের পাতা এক হয়ে আসছিলো। আচমকা জমকালো একটি মূর্তিকে তাঁদের সম্মুখে রিভলভার হস্তে দন্ডায়মান দেখতে পেয়ে হকচকিয়ে যায় তারা।

ম্যানেজার বাবু ভয়-বিহ্বল কণ্ঠে চিৎকার করতে যায়—ডাকু—ডাকু---

বনহুর চাপা কলায় বলে—চুপ করো! চেঁচালে এক্ষুণি গুলী ছুঁড়বো।

দক্ষিণ হস্তে রিভলভার উদ্যত রেখে টাকার বান্ডিলগুলো পকেটে পুরে বনহুর সোজা হয়ে দাঁড়ায় পর মুহূর্তে পিছু হটে বেরিয়ে যায় বিদ্যুৎ গতিতে এসেছিলো ঠিক তেমনি করে।

বনহুর বেরিয়ে যেতেই ম্যানেজার এবং তার সহকারীদ্বয় চিৎকার করে উঠে—ডাকু, ডাকু, গ্রেপ্তার করো—গ্রেপ্তার করো—

ততক্ষণে বনহুর হোটেলের সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে নীচে নেমে গেছে। উপর তলা হতে চিৎকার-ধ্বনি ভেসে আসতেই মেইন গেটের রাইফেলধারী পাহারাদার উঠিপড়ি করে ছুটলো উপরে।

বনহুর সেই মুহূর্তে লুকিয়ে পড়লো সিঁড়ির আড়ালে।

তার পাশ কেটে পাহারাদার এবং আরও লোকজন ছুটলো সবাই উপরে।

বনহুরের সম্মুখে গেট উন্মুক্ত, অতি সহজে সে গেট পার হয়ে গাড়িতে উঠে বসলো। ষ্টার্ট দিতেই ছুটে বেরিয়ে এলো কয়েকজন, বনহুরের গাড়িকে লক্ষ্য করে চিৎকার করতে লাগলো।

ম্যানেজার ও তার সঙ্গের কর্মচারীদ্বয় তখন নেমে এসেছে, চীৎকাররত লোকদেরকে লক্ষ্য করে বললো—গাড়ির নাম্বার দেখেছেন আপনারা? গাড়ির নাম্বার---

লোকগুলো হাবা বনে গেছে যেন, বললো তারা—কই গাড়ির তো কোনো নাম্বার দেখলাম না। গাড়ির নাম্বার তো নেই!

বনহুরের গাড়ি তখন অদৃশ্য হয়ে গেছে দূরের বাঁকে।

ফুলাগু হোটেলে ফিরে এলো বনহুর যখন তখন গাড়ির পিছনে নাম্বার প্লেট লাগানো হয়ে গেছে। গ্যারেজ খোলাই ছিলো, গাড়ি রেখে নিজের কামরায় এসে দরজা বন্ধ করে দিলো। আপন মনেই হাসলো বনহুর, তারপর মাথার পাগড়ীটা খুলে ফেলে দিলো বিছানায়। পকেট থেকে টাকার বান্ডিলগুলো বের করে স্যুটকেসে রেখে ফিরে এলো বিছানার পাশে। টেবিলের ড্রয়ার খুলে রিভলভারখানা রেখে দিলো।

বাথরুম থেকে যখন বনহুর বেরিয়ে এলো তখন তাকে দেখলে কেউ বলতে পারবেনা—একটু পূর্বের দস্যু এই মুহূর্তের বনহুর। নাইট ড্রেস পরে শয়ন করলো সে শয্যায়।

ভোরে ঘুম ভাঙতে বেশ দেরি হয়ে গেলো বনহুরের।

দরজা খুলে অবাক হলো সে, কেশব আর ফুলমিয়ার চোখে মুখে উৎকন্ঠার ছাপ বিদ্যমান।

বললো কেশব—বাবু, এতো বেলা অবধি কোনোদিন তো ঘুমান না? কোন অসুখ-বিসুখ করেনি তো?

মৃদু হেসে বললো বনহুর—আজ একটু বেশি ঘুমিয়েছি। আর বেশি ঘুমালেই বুঝি অসুখ-বিসুখ হয়? শোন কেশব আর ফুলমিয়া, তোমরা চট করে নাস্তা এবং চা খেয়ে চলে এসো, বাইরে বেরুতে হবে।

কেশব আর ফুলমিয়া বাবুর কথামত কাজ করলো। তারা চা-নাস্তা করে সোজা চলে এলো বাবুর কামরায়। কেশব আর ফুলমিয়াকে বনহুর বসার জন্য ইংগিত করে বললো—বসো আমি আসছি।

বনহুর ড্রেসিংরুমে চলে গেলো, একটু পরে ফিরে এলো হাতে দু'জোড়া স্যুট এবং দুটো ক্যাপ। বললো বনহুর—তোমরা এগুলো পরে তৈরি হয়ে নাও।

অবাক হয়ে তাকালো কেশব আর ফুলমিয়া কারণ তারা ইতিপূর্বে এমন মূল্যবান স্যুট এবং টুপি পরেনি। কেশব হাত বাড়িয়ে নিলো বটে কিন্তু হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলো—বাবু, এসব আমরা পরবো?

হাঁ, পরবার জন্যই তো দিচ্ছি; তোমরা আজ থেকে কোনো এক ছবির সহকারী পরিচালক হলে।

ফুলমিয়া আর কেশব অবাক হয়ে প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠলো—ছবির পরিচালক—বলেন কি বাবু?

তোমরা কাপড় পরে তৈরি হয়ে নাও, আমিও আসছি। কথাটা বলে বনহুর ড্রেসিংরুমে প্রবেশ করলো।

ততক্ষণে কেশব আর ফুলমিয়া স্যুট পরে তৈরি হয়ে নিলো। যদিও একটু-আধটু ঢিলা এবং আঁট-সাট হলো তবু একেবারে কোনোরকম বেখাপ্পা ধরনের হলো না। কেশব আর ফুলমিয়ার পোষাক পরা হয়ে গেলো তবু বাবুর সন্ধান নেই, তিনি ড্রেসিং রুমে যেন আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন।

বেশ কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এলো বনহুর কিন্তু তাকে দেখে হঠাৎ চমকে উঠলো কেশব আর ফুলমিয়া। আজ বনহুরের দেহে পূর্বদিনের সেই ড্রেস বিদ্যমান। তাকে দেখলে এই মুহূর্তে চেনা কিছুতেই সম্ভব নয়।

কেশব আর ফুলমিয়া যখন অবাক চোখে তাকিয়ে আছে—এই ভদ্রলোক কি করে ভেতর কক্ষে প্রবেশ করলেন আর কখনই বা প্রবেশ করেছিলেন ড্রেসিং রুমে।

বনহুর কেশব আর ফুলমিয়ার মুখোভাব লক্ষ্য করে একটু হেসে বললো—তোমরা আমাকে চিনতে পারনি। আমিই তোমাদের বাবু আলম।

অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো কেশব —বাবু!

ফুলমিয়া ঢোক গিলে বললো—স্যার আপনি! আপনিই সেই ভদ্রলোক বুঝি?

হাঁ। শোন আমি এখন কোনো ছবির প্রযোজক বুঝলে? মানে আমার টাকায় ছবি তৈরি করবো।

স্যার ছবি তৈরি করবেন? তা আমরা পারবো আপনার সহকারী হতে?

আঃ শোনোই না। ছবি তোমাদের তৈরি করতে হবে না, করবো আমি। শোন, তোমাদের যা বলবো সেই ভাবে কাজ করবে।

আচ্ছা স্যার। বললো ফুলমিয়া।

কেশব যেমন অবাক হয়েছে, তেমনি হয়েছে হতবাক—বাবু কি পাগল হলেন নাকি! ফুলের সন্ধান করতে এসে শেষে কিনা ফিল্ম তৈরি করবেন।

বনহুর কেশবের মনোভাব বুঝতে পেরে হেসে বললো—কেশব, সখ হলো ফিল্ম করার এবং আমার ছবিতে নায়িকা হবে ফুল।

বললো বনহুর—আর বিলম্ব নয় এক্ষুণি বেরুবো। প্রথমে একটা গাড়ির একান্ত দরকার।

ফুলমিয়া ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছিলো গাড়ি ডাকতে।

বনহুর বললো—গাড়ি কিনতে হবে বুঝলে?

ফুলমিয়া অবশ্য ততক্ষণে দরজায় দাঁড়িয়ে পড়েছে। ফিরে দাঁড়িয়ে বললো—গাড়ি কিনবেন স্যার?

হাঁ, ছবি করতে হলে কতক্ষণ ভাড়াটে গাড়িতে কাজ চলবে, একটা গাড়ি কিনতেই হবে।

আজ অবশ্য ভাড়াটে গাড়িতেই বেরুতে হলো। বনহুর ছদ্মবেশে সজ্জিত হয়ে কেশব আর ফুলমিয়াসহ সিঁড়ি দিয়ে যখন নামছিলো নীচে তখন ফাংফালিও -এর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।

কেশব আর ফুলমিয়ার সঙ্গে অপরিচিত এক ভদ্রলোককে দেখে অবাক হলেন ফাংফালিও বললেন তিনি —ইনি কে চিনতে পারলাম নাতো?

ফুলমিয়া আর কেশব ভাল ইংলিশ বোঝে না, কাজেই ফাংফালিও এর কথার এক বর্ণও বুঝতে পারলো না তারা। বনহুর তখন নিজেই ইংলিশে পাল্টা জবাব দিলো—ভদ্র মহোদয়, আমি মিঃ আলমের বন্ধুজন। এসেছিলাম তার সঙ্গে দেখা করতে। ফাংফালিও সসম্মানে পথ ছেড়ে দিলেন—ধন্যবাদ।

বনহুর ঐ দিনের মধ্যেই একটা মাষ্টার বুইক গাড়ি কিনে ফেললো। তারপর শুরু হলো তার কাজ।

কেশব আর ফুলমিয়া হলো তার সঙ্গী।

কেশব আর ফুলমিয়াকে সঙ্গে করেই একদিন বনহুর হাজির হলো পরিচালক আলী সাহেবের বাড়িতে। আলী সাহেবের নিকট কেশব আর ফুলমিয়াকে তার পার্টনার বলে পরিচয় দিলো।

এ কথা-সে কথার মধ্যে বললো বনহুর—আলী সাহেব, আমার পাটর্নারদেরও ইচ্ছা আপনি আমাদের ছবি পরিচালনা করবেন।

খুশি হয়ে আসলাম আলী রাজি হয়ে গেলেন। পরদিন চুক্তিবদ্ধ হবেন বলে কথা দিলেন বনহুরের কাছে।

সেদিনের মত বিদায় গ্রহণ করলো বনহুর, কেশব আর ফুলমিয়া।

এখনও বনহুর নিশ্চিন্ত নয় নূরী সম্বন্ধে—সে জানে না নূরীর কোনো সন্ধান। সে যে আসলাম আলী সাহেবের বাড়ি আছে না কোথায় আছে তাই বা কে জানে। তবে বনহুর আন্দাজ করে নিয়েছে নূরী আসলাম আলীর আয়ত্তেই আছে। আলী সাহেবের কথাবার্তায় সে বুঝতে পেরেছিলো, নূরীরই নামকরণ হয়েছে শশী।

বনহুরের সর্বক্ষণের চিন্তা নূরীকে উদ্ধার করা, কোনো সময় সে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারছে না। কেমন করে নূরীর দর্শন পাবে, কবে তাকে নিয়ে বিদায় হবে, ত্যাগ করবে এই বোম্বে শহর, সব সময় এ কথাই ভাবতে লাগলো সে।

আম্বিয়া হোটেল থেকে যে টাকা সে পেয়েছিলো তা দু'দিনেই শেষ হয়ে গেলো। গাড়ি কিনতে এবং ফুলাগু হোটেলের খরচ জোগাতেই প্রচুর টাকা লাগলো বনহুরের। আগামীকাল আলী সাহেবকে ছবির কাজের জন্য চুক্তিবদ্ধ করতে হবে। তখন লাগবে বেশ কয়েক হাজার টাকা। তা ছাড়াও ছবির জন্য নায়িকা—হাঁ, নায়িকাকেও চুক্তিবদ্ধ করতে হবে। টাকা—অনেক টাকার প্রয়োজন।

বনহুর ফুলাগু হোটেলের নিজস্ব কামরায় বসে ভাবছিলো— সম্মুখে এ্যাসট্রে পাশেই সিগারেট কেস আর ম্যাচটা পড়ে আছে। আংগুলের ফাঁকে অর্ধদগ্ধ সিগারেট। টেবিলে খবরের কাগজখানা মেলে মনোযোগ সহকারে দেখছিলো সে, আর মাঝে মাঝে সিগারেটখানা ঠোঁটে চেপে ধরে ধুম্র গ্রহণ করছিলেন।

বনহুরের মুখমন্ডল অত্যন্ত গম্ভীর ভাবাপন্ন। ললাটে চিন্তা রেখা ফুটে উঠেছে। বেশ কিছুক্ষণ খবরের কাগজের পাতায় মনোযোগ দেবার পর উঠে পায়চারি আরম্ভ করলো সে।

এমন সময় কেশব প্রবেশ করলো তার কামরায়। বললো সে—বাবু, সেই ভদ্রলোক এসেছেন।

ভদ্রলোক! বনহুর পায়চারী বন্ধ করে প্রশ্নভরা দৃষ্টি তুলে তাকালো কেশবের মুখে।

হাঁ, সেই যে আমরা আজ দুপুরে যেখানে গিয়েছিলাম পরিচালক আলী সাহেব----

ওঃ তিনি এসে গেছেন? বনহুরের মুখমন্ডল ক্ষণিকের জন্য ভাবগম্ভীর হলো। চট করে নিজেকে সংযত করে নিয়ে বললো—কোথায় তিনি?

কেশব বললো—নীচে অপেক্ষা করছেন।

আচ্ছা নিয়ে এসো। হাঁ শোন, আমাকে এভাবে তিনি দেখেননি, কাজেই আলী সাহেবকে আমার নতুনভাবে পরিচয় দেবে, বলবে আমি খান বাহাদুর শামস ইরানীর ছোট ভাই মাসুম ইরানী---একটু চিন্তা করে বললো বনহুর—আচ্ছা তুমি ওকে নিয়ে এসো, যা বলতে হয় আমিই বলবো।

কেশব চলে গেলো।

বনহুর আসন গ্রহণ করলো, ভুল তারই কারণ সে নিজেই তো আলী সাহেবকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছিলো। হোটেলের ঠিকানাটাও তাকে দিতে

ভুল করেনি বনহুর, কিন্তু এক্ষণে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে সব ভুলে গিয়েছিলো সে। ছিঃ ছিঃ এ কেমন ব্যাপার হলো! দ্রুত ছদ্মবেশ ধারণ সম্ভব নয়। যাক, কোনো রকমে ব্যাপারটা সহজ করে নিতে হবে।

বনহুর সিগারেট ধরালো।

এমন সময় কেশবসহ আসলাম আলী প্রবেশ করলেন কামরায়।

বনহুর যেন আলী সাহেবকে কোনদিন দেখেনি অবশ্য তার পরিচয় জানে, এমনি ভাব মুখে এনে উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললো—বসুন আলী সাহেব! আমি খান বাহাদুর শামস ইরানীর ছোট ভাই মাসুম ইরানী। ভাইজানকে বিশেষ জরুরি কাজে বাইরে যেতে হয়েছে তিনি আপনার সম্বন্ধে আমাকে সব বলে গেছেন।

আলী সাহেব আসন গ্রহণ করলেন, বিশেষ করে মাসুম ইরানীকে দেখে এবং তার ব্যবহারে অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন তিনি। ইতিপূর্বে এমন সুদর্শন ব্যক্তি তাঁর নজরে কমই এসেছে, কিছুক্ষণ তিনি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন, সহসা কোনো কথা তিনি বলতে পারলেন না।

বনহুর হেসে বললো—ভাইজান না থাকলেও আপনি আমাকে কোনোরকম সঙ্কোচ বোধ করবেন না যেন।

আলী সাহেবের সম্বিৎ ফিরে এলো, এতোক্ষণ ভাবছিলেন—এমনি একটি যুবককে তিনি যদি চলচ্চিত্র জগতে নায়ক হিসাবে পেতেন তাহলে সত্যিই সে ছবি বাজারে হিট না করে যেতো না। মাসুম ইরানীর কথায় তার চিন্তাধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, বলেন আলী সাহেব—না না, সঙ্কোচের কি আছে। খান বাহাদুর সাহেব যখন বিশেষ কারণে বাইরে গেছেন তখন পরে না হয় দেখা করবো আর একবার।

আচ্ছা তা মন্দ নয়। তবে এখন আপনি আমাদের অতিথি, আপনাকে তো ছেড়ে দিতে পারি না। কথাটা বলে বনহুর কলিং বেলে চাপ দেয়।

সঙ্গে সঙ্গে ফুলাগুর বয় প্রবেশ করে কুর্নিশ জানায়—স্যার।

বনহুর ফুলাগু হোটেলের বিশিষ্ট খাবারের জন্য অর্ডার দেয়।

আলী সাহেব অবশ্য অমত করেন কিন্তু বনহুর সে কথায় কান দেয়না।

অল্পক্ষণেই স্তূপাকারে খাবারে টেবিল পরিপূর্ণ হলো। নানা রকম আপত্তি সত্ত্বেও আসলাম আলীকে খেতে হলো বেশ কিছুটা। কেশব আর ফুলমিয়াকেও এ টেবিলে যোগ দিতে হলো। এ কথা-সে কথার পর আলী সাহেব বিদায় গ্রহণ করলেন।

বিদায়কালে বনহুর বললো—ভাইজান এলেই তাকে আপনার কথা বলবো এবং তিনি দরকার মনে করলেই যাবেন আপনার ওখানে।

আসলাম আলী খুশিমনে তখন বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

বনহুরের মাথার মধ্যে আবার চিন্তাজাল ছড়িয়ে পড়লো। সে ভাঁজ করা পত্রিকাখানা মেলে নিয়ে বসলো। কতক্ষণ মনোযোগ সহকারে পত্রিকাখানায় নজর বুলিয়ে নিয়ে উঠে পড়লো, হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে নিলো—এখন রাত্রি আটটা পঁচিশ।

বনহুর গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লো, একটা জুয়েলার্সের দোকানের সম্মুখে গাড়ি রেখে ভিতরে প্রবেশ করলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সঙ্গে একটি তরুণী প্রবেশ করলো দোকানটার মধ্যে। তরুণীর হাতে ভ্যানিটী ব্যাগ।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বোম্বাই-এর অধিবাসী তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ তাদের পোশাক-পরিচ্ছদেই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক কন্যার ইচ্ছামত কতকগুলো মূল্যবান অলঙ্কার ক্রয় করলেন।

বনহুর ততক্ষণে একটি নেকলেস হার নিয়ে মাপযোক করছিলো এবং দোকানের বিক্রির আয় ব্যাপারে লক্ষ্য করছিলো। তরুণী এবং প্রৌঢ় ভদ্রলোক প্রায় দশ হাজার টাকা মূল্যের অলঙ্কার ক্রয় করে বিদায় গ্রহণ করলো। সেই মুহূর্তে অন্যান্য গ্রাহকও ঐ রকম মূল্যের অলঙ্কার খরিদ করছিলো।

বনহুর একটা নেকলেস হার পছন্দ করে ফেললো কিন্তু নেকলেসের ভিতরে বসানো একটি পাথর পাল্টে নেওয়ার জন্য সে অর্ডার দিয়ে পরে আসবে বলে গেলো। নেকলেস-খানার মূল্য পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে বিদায় গ্রহণ করলো যাওয়ার সময় বলে গেলো যতক্ষণ সে ফিরে না আসে ততক্ষণ যেন দোকান খোলা রাখে কারণ সে ভোরের প্লেনেই বোম্বে ত্যাগ করবে। অন্যান্য কাজ ইতিমধ্যে সেরে নিয়ে এসে পড়বে, তবে ফিরতে একটু বিলম্ব হতে পারে।

বনহুর গাড়িতে বসে সিগারেট ধরালো। বোম্বে শহরে সবচেয়ে নামকরা জুয়েলার্স না হলেও একেবারে ছোটখাটো দোকান নয়। এ দোকানের বিক্রি দৈনিক প্রায় এক লক্ষের কম নয়। বনহুর আর একবার দোকানের সাইন বোর্ডের লেখাগুলো পড়ে নিলো। ইংলিশে বড় বড় অক্ষরে লেখা—ঈশিকা জুয়েলার্স, অক্ষরগুলো রঙিন টিউব বাল্বে জ্বলছে আর নিভছে। সাইন বোর্ডের চারপাশে নানা ধরনের রঙিন বাল্ব। সুন্দর ঝলমল করছে দোকানখানা। বনহুর গাড়িতে ষ্টার্ট দিলো—এখন দশটা বাজতে মাত্র কয়েক মিনিট বাকি। ফিরে আসবে বনহুর বারোটার পূর্বে নয়—শুধু নেকলেস নিতেই সে আসবে না চাই তার প্রচুর অর্থ। এভাবে অর্থ নেওয়ার মোটেই ইচ্ছা ছিলো না তার, কিন্তু না নিলেই যে নয়।

❑

রাত বারোটা বেজে গেলো, ঈশিকা জুয়েলার্সের মালিক উদ্বিগ্নভাবে প্রতীক্ষা করছেন, ভদ্রলোক এতোক্ষণ আসছেন না কেন! তার দোকানের আশেপাশের দোকানগুলো প্রায় সবগুলোই বন্ধ হয়ে গেছে। সোনার দোকান—বেশি রাত অবধি খোলা রাখা নিরাপদ নয়, এ কারণেই এ দোকানগুলো সকাল সকাল বন্ধ হয়ে যায়। তবে রাত বারোটা পর্যন্ত খোলা থাকে কোনো কোনোটা।

পথ নির্জন না হলেও জনসংখ্যা কমে এসেছে অনেক, যানবাহনও হ্রাস পেয়েছে। বিশেষ করে শীতের রাত—বারোটা বাজলে একেবারে শেষ রাত মনে হয়।

ঈশিকা জুয়েলার্সের লৌহকপাটগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। সম্মুখে সামান্য একটু খোলা, মালিক বেচারী চঞ্চল হয়ে পড়েছেন। ভদ্রলোক এসে নেকলেস ছড়া নিয়ে টাকাগুলো দিয়ে গেলেই দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরে যাবেন।

অন্যান্য কর্মচারী সবাই চলে গেছে, মালিক স্বয়ং রয়েছেন আর আছে তার একজন বিশিষ্ট কর্মচারী।

এমন সময় বনহুরের গাড়ি এসে থামলো জুয়েলার্সের দোকানের সম্মুখে। এখানে বনহুর নিজের গাড়ির নাম্বার প্লেট সরিয়ে ফেলেছে। বনহুর গাড়ি থেকে নামবার পূর্বে পকেটে রিভলভারের অস্তিত্বটা একবার অনুভব করে নিলো। দোকানে প্রবেশ করতেই মালিক শশব্যস্তে বললেন—এসেছেন, এতোক্ষণ ধরে আপনার জন্য অপেক্ষা করছি।

বনহুর হাতের অর্ধদগ্ধ সিগারেটটা নীচে নিক্ষেপ করে জুতো দিয়ে পিষে ফেললো, তারপর এগিয়ে গেলো সম্মুখে—কাজ সেরে ফিরতে বিলম্ব হয়ে গেলো! কথা বলার ফাঁকে একবার চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখে নিলো বনহুর।

দোকানের মালিক তখন নেকলেসখানা বের করে হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখছিলেন। তার কর্মচারী লোকটিও পাশেই দাঁড়িয়েছিলো। দোকানের মধ্যে আর কোনো লোকজন নেই।

বনহুর ক্ষিপ্রহস্তে পকেট থেকে রিভলভারখানা বের করে চেপে ধরলো মালিকের বুকে, তারপর বললো—শীঘ্র ক্যাশের টাকাগুলো দিয়ে দিন। মুহূর্ত বিলম্ব করলে গুলী করবো।

সঙ্গে সঙ্গে দোকানের মালিক এবং তার কর্মচারীর মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠলো। হঠাৎ কিছু বুঝতে পারছেন না, সব যেন কেমন ঘোরালো লাগছে। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছেন শুধু ওরা।

বনহুর বললো—Kচৎকার করলেই আমি হত্যা করবো, কোনোরকম আপত্তি না করে শীঘ্র ক্যাশের সমস্ত টাকা আমাকে দিয়ে দিন।

এতোক্ষণে হুশ হলো যেন, কথা বললেন দোকানের মালিক—আপনি.....আপনি ডাকু?

হাঁ, আমি ডাকুই বটে! বিলম্ব করবেন না, দিন?

ডাকু মালিকের বুকে রিভলভার চেপে ধরেছে, কোনোরকম উচ্চবাক্য বের হলো না তার সাথীর মুখে, সে ভয়-বিহ্বলভাবে তাকাচ্ছে শুধু।

মালিকের মুখ মরার মুখের মত বিবর্ণ হয়ে উঠেছে, কোনো উপায় নেই এর হাত থেকে উদ্ধার পাবার। অগত্যা মালিক তার কর্মচারীকে লৌহসিন্দুক খুলে সমস্ত ক্যাশ টাকা দিয়ে দিতে বললেন।

লোকটা মালিকের কথামত কাজ করলো—সিন্দুক খুলে হাজার হাজার টাকার বাণ্ডিল এনে রাখলো বনহুরের সম্মুখে।

বনহুর ডান হাতে রিভলভার ঠিক রেখে বাম হাতে টাকার বাণ্ডিলগুলো কোট আর প্যান্টের পকেটে ভরে নিলো। অত্যন্ত দ্রুতহস্তে কাজ শেষ করে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে গাড়িতে গিয়ে উঠে বসলো—তারপর আর তাকে কে পায়!

কয়েক মিনিটের মধ্যেই বনহুর গাড়ি নিয়ে ফিরে এলো ফুলাগু হোটেলে। গাড়ি গ্যারেজে উঠিয়ে রেখে নিজের ক্যাবিনে প্রবেশ করলো। কেশব আর ফুলমিয়া চিন্তিত মুখে বসে আছে তার প্রতীক্ষায়।

সিঁড়িতে ভারী জুতোর শব্দ শুনেই ওরা খুশিতে উছলে উঠলো, নিশ্চয়ই তাদের বাবু ফিরে এসেছেন।

বনহুর কামরায় প্রবেশ করে কেশব আর ফুলমিয়াকে জেগে থাকতে দেখে অবাক হয়ে বললো—তোমরা এতো রাত জেগে আছো? ঘুমালেই পারতে।

কেশব বললো—নতুন জায়গা, রাত একটা অবধি বাইরে কাটাবেন,—আর আমরা নিশ্চিন্তে ঘুমাবো?

বলে উঠে ফুলমিয়া—এসব শহরে যা চোর-ডাকুর আড্ডা। কখন কোন্ ডাকুর হাতে পড়ে যাবেন স্যার!

হাসলো বনহুর, বললো—ভয় নেই ফুলমিয়া, ডাকু কি নেবে আমার কাছ থেকে? আমি তো আর টাকা পকেটে নিয়ে ঘুরি না। যাও, তোমরা এবার নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাতে যাও?

কেশব আর ফুলমিয়া চলে গেলো নিজেদের কামরায়, বনহুর দরজা বন্ধ করে দিলো ভিতর থেকে।

পরদিন খান বাহাদুর শামস ইরানীর বেশে সজ্জিত হয়ে বনহুর গাড়ি নিয়ে রওয়ানা দিলো পরিচালক আলী সাহেবের বাড়ির দিকে। যাবার সময় বেশ কিছু টাকা সে সঙ্গে নিলো।

গ্রীন হাউসে পৌঁছতেই আলী সাহেব সাদর সম্ভাষণ জানালেন, আজ আসলাম আলী চুক্তিবদ্ধ হবেন, শুধু তিনিই নন—শশীকেও চুক্তিবদ্ধ করা হবে শামস ইরানীর ছবির জন্য।

খান বাহাদুর শামস ইরানীকে নিয়ে হলঘরে প্রবেশ করলেন আসলাম আলী।

হলঘরে প্রবেশ করতেই বিস্মিত হলো বনহুর—গত রাতের সেই জুয়েলার্স—চোখেমুখে বিষাদের ছাপ, রুক্ষ চুল, উদভ্রান্ত চেহারা।

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করেই বললেন আলী সাহেব—ইনি আমার বড় ভাই বশীর আলী জুয়েলার্স। কাল রাতে এর চরম সর্বনাশ হয়ে গেছে!

বনহুর আসন গ্রহণ করে বললো—সর্বনাশ হয়েছে! কি সর্বনাশ?

হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলেন বশীর আলী সাহেব—গতরাতে আমার প্রায় লক্ষ টাকা ডাকু হরণ করে নিয়ে গেছে। আমার যথাসর্বস্ব গেছে.....আমার যথাসর্বস্ব গেছে......

বনহুর বুঝতে পারলো, এই বশীর আলীই সেই জুয়েলার্স গতরাতে যার যথাসর্বস্ব সে লুট করে নিয়ে এসেছে। বেশ তো, এক ভাই-এর অর্থ আর এক ভাই-এর হাতে চলে আসবে। বনহুর মুখোভাবে বিস্ময় টেনে বললো—পুলিশে খবর দেননি?

হাঁ দিয়েছি, কিন্তু কোনো ফল হবে না, ডাকু সম্পূর্ণ বিদেশী লোক।

কি করে আপনি জানলেন সে বিদেশী? বললো খান বাহাদুর শামস ইরানী-বেশি বনহুর।

বশীর আলী সাহেব গত রাতের সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন, আরও বললেন—ডাকু আজ ভোরের প্লেনেই বোম্বে ত্যাগ করেছে তাতে কোনো ভুল নেই।

এবার আশ্বস্ত হলো বনহুর, বললো—ডাকু তাহলে বোম্বে নেই! যাক্ কতকটা নিশ্চিন্ত হলাম।

বশির আলী বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বললেন—তার মানে! আপনি.....

মানে, আমি খুব ভয় পেয়ে গিয়াছিলাম কিনা। দেখুন, গত পরশুর পত্রিকায় একটি ঘটনা দেখেছি, কোনো এক হোটেলে গভীর রাতে একজন জমকালো পোশাক-পরা ব্যক্তি হানা দিয়ে সমস্ত ক্যাশ টাকা লুটে নিয়ে চলে গেছে।

আলী সাহেব বললেন—ঠিক বলছেন খান বাহাদুর সাহেব, বোম্বে শহরে কোনো এক ভয়ঙ্কর দুর্দান্ত ডাকুর আবির্ভাব ঘটেছে, যার বুদ্ধি-কৌশল আর শক্তি অসীম।

হাঁ, আমারও ঠিক সেই রকম মনে হয়। কথাটা এবার চাপা দেওয়ার চেষ্টা করলো বনহুর—ডাকুটি আর বোম্বে নেই জেনে সত্যি আমি অনেকখানি স্বস্তি লাভ করছি।

এমন সময় পাশের টেবিলে ফোন বেজে উঠে; আসলাম আলী উঠে গিয়ে রিসিভার হাতে উঠিয়ে নেন—হ্যালো স্পিকিং আলী সাহেব। কি বললেন, বোম্বে এরোড্রামে ডাকু ধরা পড়েছে?.....হ্যালো হ্যালো, ডাকু ধরা পড়েছে? আচ্ছা এক্ষুণি ভাইজানকে পাঠাচ্ছি। আচ্ছা, ধন্যবাদ.....রিসিভার রেখে এসে বসলেন আলী সাহেব। বললেন—ভাইজান, ডাকু ধরা পড়েছে।

শুনলাম। সত্যি আমার সৌভাগ্য।

আপনি এক্ষুণি এরোড্রামে চলে যান, সেখানে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে আটক রেখেছে, আপনি সনাক্ত করবেন।

হাঁ, আমি ঠিক তাকে চিনে নেবো, কারণ তাকে আমি ভালভাবে দেখেছি।

বনহুরের মুখে হাসির আভাস ফুটে উঠলো, মনে মনে ভাবলো, না জানি কোন্ বেচারী ডাকু নামে গ্রেপ্তার হয়ে বসে আছে। প্রকাশ্যে বললো সে—বশীর আলী সাহেব, আপনার সৌভাগ্যই বটে। না হলে ডাকু এতো বুদ্ধিমান হয়েও পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায়? যান দেখুন, টাকাগুলো হয়তো এখনও তার হাতের এ্যাটাচীতেই রয়েছে।

আসলাম আলী বশীর সাহেবকে গাড়িতে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এলেন। এবার আলী সাহেবের অফিস-রুমে বসে কাজ শুরু হলো। অফিস-রুমে আলী সাহেবের সহকারিগণ কাগজপত্র নিয়ে কাজ করছিলো। আলী সাহেব খান বাহাদুর শামস ইরানীর ছবি পরিচালনার জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকায় চুক্তিবদ্ধ হলেন। খান বাহাদুর শামস ইরানী-বেশি বনহুর সম্পূর্ণ টাকা একযোগে আসলাম আলীকে প্রদান করলো।

আসলাম আলীর চোখেমুখে ফুটে উঠলো আনন্দোচ্ছ্বাস। কারণ কোনো প্রযোজক ছবি তৈরির পূর্বেই পরিচালকের প্রাপ্য সম্পূর্ণ বুঝিয়ে দেন না। আজ তার ব্যতিক্রম দেখে এবং এতোগুলো অর্থ একযোগে পেয়ে অত্যন্ত খুশি হলেন।

বনহুর এবার তার ছবির জন্য নায়িকা শশীকে চুক্তিবদ্ধা করার জন্য আগ্রহ দেখালো।

আসলাম আলীর হৃদয়ে অপূর্ব অনুভূতি—শশী তাঁরই, কাজেই শশীর প্রাপ্য অর্থও তাঁর। যদিও এখন সে শ্যামার ওখানেই আছে। আলী সাহেব বনহুরকে সঙ্গে করে শ্যামার ওখানে গেলেন।

সুসজ্জিত ড্রইংরুমে আসলাম আলী বনহুরকে বসিয়ে ভিতরে চলে গেলেন।

বিপুল আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো খান বাহাদুর শামস ইরানী-বেশি দস্যু বনহুর। আর একটু পরই সে তার নূরীকে দেখতে পাবে। আনন্দে স্ফীত হয়ে উঠলো তার বুক।

একটু পরে ফিরে এলেন আলী সাহেব, সঙ্গে তাঁর শ্যামা।

বনহুরের মন দমে গেলো, তাকিয়ে আছে সে নিশ্চুপ দৃষ্টি মেলে।

বললেন আলী সাহেব—এ আমার ছবির নায়িকা শ্যামা আর ইনি খান বাহাদুর শামস ইরানী। ইনার সম্বন্ধেই তোমাকে বলেছিলাম শ্যামা।

শ্যামা আদাব জানালো।

বনহুরও আদাব জানালো শ্যামাকে।

বললেন আবার আলী সাহেব—খান বাহাদুর, বড় দুঃখিত, শশীকে কিছুতেই আনতে পারলাম না।

শ্যামা ও তার কথায় যোগ দিয়ে বললো—আমরা অনেক করে বোঝালাম কিন্তু কিছুতেই ওকে......

বনহুরের মুখ মুহূর্তে কালো হয়ে উঠলো, গম্ভীর কণ্ঠে বললো সে—কিন্তু শশীকেই যে আমার ছবির নায়িকা করবো ভেবেই আমি.....

আলী সাহেব শান্তভাবে বললেন—আমি জানি খান বাহাদুর সাহেব, কিন্তু.....

কিন্তু বললে তো চলবে না, যত টাকা সে চায় আমি তাই দিতে রাজি আছি আলী সাহেব।

আলী সাহেব শ্যামার দিকে তাকিয়ে বললেন—শুনলে তো খান বাহাদুর সাহেবের কথা। শ্যামা, তুমিই আমার ভরসা। 'স্বয়ংবরা'তে ওকে ক্যামেরার সম্মুখে আনতে আমি হিমসিম খেয়ে গিয়েছিলাম। এমন কি হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। ওর ব্যাপারে তুমিই আমাকে সহায়তা করেছিলে বলেই আমি কাজ শেষ করতে পেরেছি। এবারও তুমি ছাড়া কোনো উপায় দেখছি না।

বনহুর তার নকল দাড়িতে হাত বুলিয়ে মিনতির সুরে বললো—মিস শ্যামারাণী, আপনি যান আর একবার চেষ্টা করে দেখুন। আমার খুব ইচ্ছা, তাকে আজই আমি আমার ছবির জন্য চুক্তিবদ্ধা করতে চাই।

অগত্যা শ্যামা আর আলী সাহেব পুনরায় ভিতর বাড়িতে প্রবেশ করলো।

বনহুর মনে মনে খোদাকে স্মরণ করতে লাগলো, নূরী যদি না আসে তাহলে তার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

মিনিটের পর মিনিট কেটে চললো, প্রায় ঘন্টা কেটে গেলো—বনহুর ক্রমেই অধৈর্য হয়ে পড়েছে। বার বার ব্যাকুল আঁখি মেলে তাকাচ্ছে ওদিকের দরজার মোটা পর্দাটার দিকে। সত্যি কি সে নূরীকে দেখতে পাবে?

বনহুর উঠে পায়চারি শুরু করে দিলো, মনের অস্থিরতা সে কিছুতেই যেন দমিয়ে রাখতে পারছিলো না। মুখমণ্ডলে চঞ্চলতার ছাপ ফুটে উঠেছে।

সামান্য একটু পর্দাটা নড়ে উঠলেই চমকে উঠছিলো—এই বুঝি এলো নূরী, এই বুঝি এলো—

সত্যি এবার পর্দা নড়ে উঠলো, কক্ষে প্রবেশ করলেন আলী সাহেব, শ্যামা আর তার আকাঙ্ক্ষিতা নূরী।

বনহুর প্রথমে কিছুতেই নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলো না, নূরীকে সে দিব্যচোখে দেখছে—এ যেন বাস্তব নয়। নূরী তো হারিয়ে গেছে সেই সুদূর পর্বতের উপরে। জংলিগণ তাকে হত্যা করেছে। না না, নূরী বেঁচে আছে—তার সম্মুখে দন্ডায়মান। বনহুর অতি কষ্টে নিজেকে সংযত রাখলো যদিও তার বুকের মধ্যে ভীষণ একটা আলোড়ন অনুভব করছিলো। কোনো কথা সে চট করে বলতে পারলো না।

আলী সাহেব পরিচয় দিলেন—এর নাম শশী।

বনহুর তখনও নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে, নূরীকে সে কোনোদিন এমন ড্রেসে দেখেনি। বন-দুহিতা নূরীকে আজ বনহুর দেখলো আধুনিক এক তরুণী বেশে। কুঞ্চিত কেশরাশি মাথার উপর ডালা করে বাঁধা! খোঁপার উপরে উজ্জল মতি-বসানো ক্লিপ আঁটা। কানে, গলায় এবং হাতের কব্জিতে সেট করা মূল্যবান গহনা। ফিকে আকাশী রং-এর শাড়ি, ব্লাউজ এবং পায়ের জুতা জোড়াও। সরু বাঁকানো ঠোঁট দু'খানা লিপষ্টিকে রঞ্জিত। বাম হস্তের কব্জিতে রিষ্টওয়াচ—বনহুর নূরীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত নিপুণ দৃষ্টি মেলে দেখতে লাগলো। অভিনেত্রীর ড্রেসে নূরীকে অপূর্ব মানিয়েছে। কিন্তু পূর্বের সেই চঞ্চলতা কই নূরীর মধ্যে! এ যেন আর এক নূরী। ভয়-বিহ্বল চোখে একবার সে বনহুরের দিকে তাকিয়ে দেখে নিলো।

আলী সাহেব বুঝতে পারলেন—শশীর রূপরাশি খান বাহাদুর শামস ইরানীর চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছে। হেসে বললেন—খান বাহাদুর সাহেব, শশীকে আপনার কেমন লাগছে?

বনহুর ছোট্ট করে গম্ভীর কণ্ঠে বললো—অপূর্ব!

সেইদিনই শশীকে বনহুর চুক্তিবদ্ধা করলো তার ছবির নায়িকা হিসাবে।

আজ এই পর্যন্ত কাজ হলো।

আলী সাহেব বলেছিলেন—খান বাহাদুর সাহেব, আপনি যখন খুশি আসবেন এবং শ্যামা ও শশীর সঙ্গে আলাপ করে যাবেন।

খুশি হলো বনহুর, বললো সে—নিশ্চয়ই আসবো, না এলে যে আমার চলবে না।

শ্যামা হেসে বললো—আপনার ছবির নায়িকা যখন শশী তখন সে এখন আপনারই।

বনহুরও হাসলো—আপনিও বাদ যাবেন না, আমার ছবিতে আপনিও থাকবেন বিশিষ্ট এক চরিত্রে।

ধন্যবাদ খান বাহাদুর সাহেব। বললো শ্যামা।

আলী সাহেব বললেন—নিশ্চয়ই শ্যামাও থাকবে।

বললো বনহুর—আপনাকেও আমি চুক্তিবদ্ধা করবো মিস শ্যামা।

সেদিনের মত বনহুর বিদায় গ্রহণ করলো।

❑

বনহুরকে আজ বেশ স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। হোটেল ফুলাগুর বেলকনিতে বসে তাকিয়ে আছে সে আলো ঝলমল বোম্বে নগরীর অপরূপ সৌন্দর্যের দিকে। কর্ম-কোলাহল-মুখর রাজপথ, পথের দু'ধারে সুউচ্চ দালান-কোঠা। অসংখ্য দালান-কোঠার মধ্যে দিয়ে প্রশস্ত পথ এগিয়ে গেছে সম্মুখের দিকে। পথের উপর দিয়ে অসংখ্য গাড়ি চলেছে সারিবদ্ধভাবে।

বনহুর নূরীকে আজ স্বচক্ষে দেখতে পেয়েছে, বেঁচে আছে নূরী—এ যে তার কাছে কত বড় আনন্দের কথা!

পাশেই বসে আছে দু'খানা আসনে কেশব আর ফুলমিয়া। শ্যামার ওখান থেকে ফিরে এসে সব খোলাসা বলেছে বনহুর কেশব আর ফুলমিয়ার কাছে। কেশবের খুশি আর ধরছে না। তার বোন ফুল জীবিত এ যে সে কল্পনা করতে পারেনি, আজও যেন তার বিশ্বাস হচ্ছে না যতক্ষণ ফুলকে সে নিজ চোখে না দেখেছে ততক্ষণ মনকে বোঝাতে পারছে না কেশব।

আর ফুলমিয়া—সে তো নূরীকে দেখেইনি, কেমন সে তাও জানে না, কাজেই ফুলমিয়া সম্পূর্ণ নীরব রয়েছে।

বনহুর গভীরভাবে কিছু চিন্তা করে বললো—কেশব, নূরীকে উদ্ধার করার আশায় আমাদের আরও কয়েক দিন বোম্বেতে কাটাতে হবে। তুমি এদিকে প্রস্তুত থেকো, বোম্বে থেকে কবে কখন কোন্ প্লেন দিল্লী অভিমুখে রওয়ানা দেয়, সেইভাবে আমাকে কাজ শেষ করতে হবে।

বাবু, আমি কালই এ সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করে আনবো। ফুলমিয়াকে সঙ্গে নিয়েই যাবো।

বেশ, তাই যেও।

আরও কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা চলার পর বনহুর উঠে পড়লো।

কেশব আর ফুলমিয়াও সে রাতের মত চলে গেলো নিজেদের কামরায়।

পরদিন সকালে বাইরে গেলো বনহুর। একটা জুয়েলার্সের দোকান থেকে মূল্যবান দু'ছড়া হার কিনে নিলো। ফিরে এলো বনহুর হোটেলে। সমস্ত দুপুরটা বিছানায় শুয়ে কাটালো সে। বনহুরের দস্যুপ্রাণ আজ একটি নারীর সংস্পর্শের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

সন্ধ্যার পূর্বে বনহুর খান বাহাদুর শামস ইরানীর বেশে সজ্জিত হলো, তারপর গাড়ি নিয়ে সোজা বেরিয়ে পড়লো শ্যামারাণীর বাস ভবনের উদ্দেশ্যে।

গাড়ি শ্যামারাণীর বাড়ির গেটে পৌঁছতেই একটি বয় এসে তাকে ড্রইংরুমে নিয়ে বসালো। তারপর চলে গেলো সে ভিতর বাড়িতে।

একটু পরেই শ্যামা বিচিত্র ড্রেসে সজ্জিত হয়ে ড্রইংরুমে প্রবেশ করলো, সসম্মানে অভ্যর্থনা জানালো সে খান বাহাদুর শামস ইরানীকে।

শামস ইরানী আসন গ্রহণ করে বললো—মিস শ্যামা, আমি আপনাদের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছি।

সেই কারণেই বুঝি আজ পদধূলি দিলেন?

ছিঃ ছিঃ কি যে বলেন। আপনাদের সাক্ষাৎ লাভের আশায় এসেছি মিস শ্যামা।

আমাদের, না শশীর সাক্ষাৎ কামনা করেন?

আপনাদের উভয়কেই আমি.....

ধন্যবাদ। কিন্তু শশী যে কাল থেকে চরমভাবে বেঁকে বসেছে, কিছুতেই ওকে বাগে আনতে পারছি না!

তাহলে তো বড় মুশকিলের কথা মিস শ্যামা। বিমর্ষ কণ্ঠে কথাটা উচ্চারণ করলো খান বাহাদুর শামস ইরানী।

শ্যামা হঠাৎ হেসে উঠলো খিল খিল করে, তারপর হাসি থামিয়ে বলে সে—ঘাবড়ে যাবেন না খান বাহাদুর সাহেব, কাজের বেলায় ঠিকই পাবেন। মনে রাখবেন—শ্যামা সব পারে।

শামস ইরানীর মুখে হাসি ফুটে উঠে, বলে সে—সত্যি আপনাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না মিস শ্যামারাণী।

আবার হেসে উঠে শ্যামা—উপকার না করতেই আপনি দেখছি ধন্যবাদের ডালা উজাড় করে দিলেন। পরে কি দেবেন!

সেজন্য ভাবতে হবে না মিস্ শ্যামারাণী।

ওঃ তাই নাকি?

হাঁ। এই দেখুন মিস শ্যামারাণী, আজ আপনাদের দু'জনার জন্য সামান্য কিছু উপহার এনেছি। বনহুর হারের প্যাকেট দুটো বের করে শ্যামার সম্মুখস্থ টেবিলে রাখে।

ড্রইংরুমের উজ্জ্বল আলোকরশ্মিতে হাত দুটো ঝলমল করে উঠলো। হারের পাথরগুলো থেকে যেন বিদ্যুৎ ছটা ঠিকরে বের হচ্ছে।

শ্যামারাণীর চোখ দুটো জ্বলে উঠলো চক্ চক্ করে, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললো—অপূর্ব!

নিন, আপনাদের জন্য এ দুটো এনেছি।

শ্যামা একটা হাত তুলে নিয়ে গলায় পরে নিলো। অপরটি নিয়ে ছুটলো ভিতর বাড়িতে।

বনহুর কান পেতে রইলো, শুনতে পেলো শ্যামার খুশিতে ডগমগ কণ্ঠস্বর—শশী, দেখো দেখো, খান বাহাদুর সাহেব আমাদের জন্য কি এনেছেন?

নূরীর কণ্ঠ শোনার জন্য উন্মুখ হয়ে রইলো বনহুর কিন্তু কোনো শব্দই শোনা গেলো না বিপরীত পক্ষ থেকে। শ্যামার আনন্দ-ভরা গলার পর পর প্রতিধ্বনি—নে নে দেখি, বড্ড লাজুক মেয়ে তুই। ছবিতে অভিনয় করতে এসে অতো লজ্জা করলে চলে না, বুঝলি?

বনহুর বুঝতে পারলো, নূরী তার হারছড়া উপেক্ষা করছে।

একটু পরে ফিরে এলো শ্যামারাণী, বিমর্ষ তার মুখমন্ডল। হাতে হারছড়া, বললো সে—পারলাম না ওকে কিছুতেই এটা নেওয়াতে—আপনি চলুন, যদি গ্রহণ করাতে পারেন।

এটুকুই চাইছিলো বনহুর, অনুসরণ করলো সে শ্যামাকে। ভিতর কক্ষে প্রবেশ করে দেখলো বনহুর, নূরী একটা খাটের পায়ে মাথা নীচু করে বসে আছে। আজ নূরীর দেহে কোনোরকম সাজ-সজ্জার লেশ নেই। তবে একটা শাড়ি পরিপাটি করে বাঙ্গালি প্যাটার্ণে পরা রয়েছে।

বনহুর কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

শ্যামা বললো—কি হলো, আপনি দেখছি শশীর কাছে একেবারে বোবা বনে যান?

সম্বিৎ ফিরে পায় বনহুর, শ্যামার হাত থেকে হারছড়া নিয়ে এগিয়ে যায় শশীর দিকে—মিস শশীরাণী!

না না, ও হার আমি নেবো না। হঠাৎ বলে উঠে শশী।

তা হয় না, তোকে নিতেই হবে শশী। ভদ্রলোক যদি আজ উপহার দিতে এসে বিমুখ হয়ে ফিরে যান তাহলে আলী সাহেব তোকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না। ভুলে যাসনে শশী, শুধু তিনি তোর অভিনয়ের জন্যই.....

হঠাৎ শশী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে—থাক আর বলতে হবে না। দিন, ও মালা আমি নেবো।

বনহুর অবাক হয়, সর্প যেমন ঔষধের গন্ধে মুহূর্তে দমে যায় তেমনি শ্যামার ইংগিতপূর্ণ কথায় নূরীর ক্রুদ্ধভাব কোথায় যেন উবে যায় একেবারে। নূরী শামস ইরানীর হাত থেকে হারছড়া হাতে তুলে নেয়।

আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠে শামস ইরানীর মুখ।

শ্যামার মুখেও হাসি ফোটে।

শামস ইরানীর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হয় শ্যামার। শ্যামা এবার নূরীর হাত থেকে হারছড়া নিয়ে পরিয়ে দেয় তার গলায়।

শামস ইরানী বলে উঠে—চমৎকার!

হঠাৎ চমকে উঠে নূরী, এ কণ্ঠস্বর যেন হৃদয়ে প্রচন্ড ধাক্কা দেয়। তাঁর বনহুরের কণ্ঠের প্রতিধ্বনি যেন সে শুনতে পায় প্রৌঢ় শামস ইরানীর গলায়।

শ্যামা বলে—খান বাহাদুর সাহেব, একদিন আপনার হোটেলে যাবো। আসলাম আলীর কাছে জানতে পারলাম, আপনার ছোট ভাই নাকি আপনার ওখানে থাকেন? অনেক প্রশংসা করলেন তিনি তার।

হাঁ, আমার ছোট ভাই মাসুম ইরানী আমার কাছেই আছে।

আসলাম আলী বললেন—আপনার ছোট ভাইটি নাকি দেখতে অপূর্ব? হিরোর মত নাকি তার চেহারা?

হাসলো বনহুর—হতে পারে।

আমি গেলে আপনার ভাই যদি অসন্তুষ্ট হন?

আমার ভাই আপনাকে পেলে খুশিই হবে কারণ বোম্বে এসে সে মিশবার জন্য কাউকে তার সাথী হিসেবে বেছে নিতে পারেনি এখনও।

সত্যি?

হাঁ, মিস শ্যামারাণী।

তাহলে কালকেই আসলাম আলীর সঙ্গে হানা দেবো আপনার হোটেল ফুলাগুতে।

নিশ্চয়ই। কিন্তু মিস শশীকে যেন নিয়ে যাবেন না।

কেন? ওকে এতো ভয় কেন আপনার?

কি জানি আমার ছবির নায়িকা শেষে যদি....থাক পরে বলবো।

ওঃ বুঝতে পেরেছি, আপনার ভাইটিকে যদি পছন্দ করে বসে।

মিথ্যা নয়। হাসলো শামস ইরানী।

শ্যামাও হাসলো তার হাসিতে যোগ দিয়ে।

❑

বনহুর একটা পত্রিকা নিয়ে মনোযোগ সহকারে পড়ছিলো, এমন সময় কেশব হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে—বাবু, বাবু, একটি মেয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

পত্রিকা থেকে চোখ তুলে বললো বনহুর—ওঃ মিস্ শ্যামা? আচ্ছা নিয়ে এসো তাকে।

কেশব চলে গেলো।

ফুলমিয়াও অনুসরণ করলো কেশবকে। মেয়ে মানুষের কথা শুনে ফুলমিয়াও একটু হাবা বনে গিয়েছিলো, তবে কি সেই ফুল এসেছে?

কেশবের সঙ্গে যে মেয়েটি সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো উপরে সে যে ফুল নয়—এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হলো ফুলমিয়া একটু পরেই, যখন কেশব এসে জানালো, এ আবার কে এসে জুটলো!

মেয়েটির আঁট-সাট পোশাক এবং তার অত্যাধুনিক সাজসজ্জা ভাল লাগলো না কেশব আর ফুলমিয়ার।

তরুণী অন্য কেউ নয়, চিত্রতারকা শ্যামারাণী।

শ্যামা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে থমকে দাঁড়ালো, একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখে নিলো, তারপর দৃষ্টি সীমাবদ্ধ হলো সম্মুখস্থ যুবকটির উপর।

বনহুর যেন শ্যামাকে এই প্রথম দেখছে, মুখোভাবে এমনি ভাব টেনে বললো—আপনি বুঝি মিস শ্যামারাণী?

হাঁ, কিন্তু খান বাহাদুর সাহেব কই?

একটু হেসে বললো বনহুর—ভাইজান জরুরি একটা কাজে বাইরে গেছেন। তিনি এজন্য অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন। তবে আপনার সম্বন্ধে ভাইজান আমাকে বিশেষভাবে বলে গেছেন। বসুন মিস শ্যামারাণী।

শ্যামার চোখেমুখে আনন্দের দ্যুতি, আসন গ্রহণ করে সে।

বনহুরও পাশের আসনে বসে পড়ে।

শ্যামা নিজকে সচ্ছ স্বাভাবিক করে নেয়, বলে—আমি তো আপনার সঙ্গেই আলাপ করতে এসেছি। উনি জরুরি কাজেই বাইরে গেছেন, তাতে দুঃখিত হবার কি আছে।

বনহুর হাতের মধ্যে হাত কচলায়—আপনি আমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন, এ যে আমার পরম সৌভাগ্য।

কি যে বলেন, আমি আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে কত সে আনন্দিত হলাম। আসলাম আলীর কাছে আপনার গুণাগুণের প্রশংসা শুনে

সত্যি আপনার সঙ্গে পরিচয় করার লোভ সামলাতে পারলাম না। আলী সাহেবের কাছে এই হোটেলের ঠিকানা জেনে নিয়েছি।

আমার প্রশংসা—কি যে বলেন!

দেখুন মিঃ মাসুম, আপনার গলার স্বরের সঙ্গে আপনার ভাইয়ের স্বরের অনেকটা মিল আছে। একই মায়ের সন্তান তো!

বনহুর শুধু হাসলো একটু, কোনো জবাব দিলো না।

বনহুর বললো—বলুন মিস শ্যামারাণী, আপনার জন্য আমি কি করতে পারি?

কিছু না। আপনার মহৎ ব্যবহারে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি।

বার বার ওসব মন ভোলানা কথা না বলে বলুন কি খাবেন—ঠান্ডা কিছু, না গরম?

যা আপনার ভাল লাগে।

বনহুর কলিং বেলে চাপ দিতেই বয় এসে দাঁড়ালো।

যে-কোনো ভাল মিষ্টি নিয়ে এসো আর কফি দু'কাপ।

উঁ হুঁ মিষ্টি নয়—ঝাল।

আচ্ছা, গরম বোম্বে সিংগারা আর দুটো রোষ্ট নিয়ে এসো।

বয় চলে যায়।

শ্যামা অল্পক্ষণে অত্যন্ত সহজ হয়ে এসেছে।

বনহুর জানে, চিত্রতারকারা এমনি হয়। অভিনয়ের মাধ্যমে মানুষের মন জয় করাই এদের কাজ।

অল্পক্ষণ পরেই খাবার এলো।

শ্যামা বললো—এতো?

নিন না, এতো আর কি, এই তো সামান্য!

খেতে খেতে অনেক গল্প হলো। শ্যামা যেন মাসুম ইরানীকে অল্পক্ষণে আপন করে নিলো।

খাওয়া শেষ হলো, শ্যামা বললো—কই খান বাহাদুর সাহেব এখনও তো এলেন না?

হয়তো কাজে জড়িয়ে পড়েছেন। বললো বনহুর।

শ্যামা ইচ্ছা করেই যে বিলম্ব করছে তা বেশ বুঝতে পারলো বনহুর। এ কথা-সে কথার মাধ্যমে সময় বেড়ে চললো।

শ্যামা আর বনহুর যখন নির্জন কক্ষে আলাপ হচ্ছিলো, তখন কেশব আর ফুলমিয়া রাগে ফেটে পড়ছিলো, অবশ্য রাতটা তাদের ঐ অজানা-অচেনা তরুণীটির উপর। জাহাজে বাবু এক তরুণীর পাল্লায় পড়েছিলেন—মিস নীহারের কবলে। কোনো রকমে খেসে এসেছেন বাবু। আবার এক ফ্যাসাদ

এসে জুটলো। তবে কেশবের প্রবল বিশ্বাস আছে, তাদের বাবুকে কেউ ফাঁদে ফেলতে পারবে না।

বললো ফুলমিয়া—তুমি জানো না কেশব দাদা, মেয়েরা সব পারে।

কেশব বললো—বাবু তেমন লোক নয়।

ফুলমিয়া বললো—মেয়েদের পাল্লায় পড়লে সাধু-সন্ন্যাসীও নাকি চোর বনে যায়।

রেখে দে ফুলমিয়া ও সব কথা বাবু আমাদের মোম নয় যে গলে যাবে!

আচ্ছা দেখা যাবে। বললো ফুলমিয়া।

ভিতরে গল্প যত গভীরভাবে জমে উঠতে লাগলো ততই কেশব আর ফুলমিয়ার উৎকণ্ঠা বাড়তে লাগলো। মেয়েটা এলো—তা যায় না কেন? কি এতো কথা আছে যা ফুরাতে চায় না?

শ্যামার কণ্ঠ শোনা যায়—আপনি যদি আমাকে একটু পৌঁছে দিতেন, বড় উপকার হতো।

বনহুর হাতঘড়ির দিকে তাকায়—ন'টা পঁচিশ। শীতের রাত, অল্পক্ষণ পর শহরটা ঝিমিয়ে পড়বে। শ্যামা ফাঁদ পাততে চেষ্টা করছে, মনে মনে হাসলো বনহুর, উঠে দাঁড়িয়ে বললো—চলুন।

অনেক অনেক ধন্যবাদ মিঃ মাসুম। সত্যি আপনি না গেলে আমি ভয় পেতাম, কারণ পর পর দু'টো চাঞ্চল্যকর ডাকাতি শহরের বুকে লোকজনের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে।

চলুন আমি পৌঁছে দিয়ে আসি। বনহুর আলনা থেকে কোটটা গায়ে পরে নিয়ে পা বাড়ালো দরজার দিকে।

কেশবকে লক্ষ্য করে বললো ফুলমিয়া—দেখলে বন্ধু আমার কথা ঠিক কিনা? মেয়ে মানুষের পাল্লায় পড়েছেন, খসতে বিলম্ব হবে।

বনহুর আর শ্যামা সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলো নীচে।

কেশব ফুলমিয়ার কথায় কোনো জবাব দিতে পারলো না। কারণ বাবুকে তো এমন কোনোদিন দেখেনি।

বনহুর আর শ্যামা গাড়ির পাশে এসে দাঁড়ালো।

শ্যামা বললো—ড্রাইভার আসেনি কিনা তাই, নাহলে আপনাকে কষ্ট দিতাম না। আমার গাড়িতেই চলুন, ড্রাইভার আপনাকে পৌঁছে দেবে।

বনহুর কোনো কথা না বলে ড্রাইভ আসনে উঠে বসলো। শ্যামা তার পাশের আসনে বসেছে।

গাড়ি ছুটতে শুরু করলো।

শ্যামা কিছুক্ষণ নীরব রইলো বটে কিন্তু এক সময় হঠাৎ বলে উঠলো—মিঃ মাসুম, অভিনেত্রী বলে আপনি আমাকে ঘৃণা করছেন না তো?

মিস শ্যামা, আমার কাছে সব মানুষের একই রূপ—সে মানুষ। আমি কাউকে ঘৃণা করি না, ঘৃণা করা আমার স্বভাব নয়।

সত্যি মিঃ মাসুম, আপনার সঙ্গে একদিনের পরিচয়ে আমি অভিভূত হয়ে পড়েছি। আপনার কথা কোনো সময় আমি ভুলবো না।

একটা নগণ্য মানুষ ছাড়া আমি তো এমন কিছু নই মিস শ্যামারাণী।

এই তো একটু পূর্বে বললেন মানুষ সে মানুষই, তার আবার গণ্য আর নগণ্য কি আছে! তাছাড়া আপনি যদি নগণ্য হন তাহলে এ পৃথিবীতে সবাই নগণ্য। মিঃ মাসুম, আপনাকে আমার অত্যন্ত ভাল লেগেছে।

নিজকে গৌরবান্বিত মনে করছি মিস শ্যামা।

আসবেন কিন্তু মাঝে মাঝে, বেড়াবো আমরা।

বনহুর গাড়ির সম্মুখে দৃষ্টি রেখে বলে—আসবো।

সত্যি বলছেন তো?

হাঁ, কিন্তু আপনার বাড়িতে নয়।

চমকে উঠলো যেন শ্যামা—কেন?

আমার ভাইজান পছন্দ করেন না আমি কারো বাড়ি যাই।

হেসে বলে শ্যামা—ভয়, পাছে ভাইটিকে হারান, এই তো?

ঠিক তা নয়।

তবে?

তার স্বভাব, তিনি পছন্দ করেন না।

শ্যামার মুখখানা কালো হয়ে গেল যেন।

অন্ধকার হলেও বুঝতে পারলো বনহুর, শ্যামার মুখটা গম্ভীর হয়ে পড়েছে।

হেসে বললো বনহুর—বাড়িতে না এলেও ঠিক আসবো। আমার কামরার ফোন নং ৫৫০০১, যখন ডাকবেন গাড়ি নিয়ে হাজির হবো।

ঠিক বলছেন তো? আনন্দে উপছে পড়ে যেন শ্যামা।

হাঁ।

শ্যামা বলে উঠে এবার—এই তো সামনেই আমার বাসা।

ওঃ আমি ভুল করে যাচ্ছিলাম। বনহুর ব্রেক কষে গাড়ির মুখটা ফিরিয়ে নেয় দ্রুতহস্তে।

শ্যামার বাড়ির গেটে গাড়ি রাখতেই ড্রাইভার এগিয়ে আসে।

শ্যামা গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়ে বলে—অনেক ধন্যবাদ আপনাকে মিঃ মাসুম। ড্রাইভার, যাও উনাকে রেখে এসো।

বনহুর শ্যামার পরিত্যক্ত আসনে বসে, ড্রাইভার উঠে বসে তার স্থানে।

❑

পরদিন।

বনহুর বাইরে বের হবার জন্য তৈরি হচ্ছে, আসলাম আলীর কাছে যাবে বলে। এখন সে খান বাহাদুর শামস ইরানী বেশে সজ্জিত হয়েছে। এমন সময় ফোন বেজে উঠলো, রিসিভার হাতে তুলে নিতেই ভেসে এলো মেয়েলি কণ্ঠ—হ্যালো, মিস শ্যামা বলছি। আপনি কি মাসুম সাহেব বলছেন?

হাঁ, আমি মাসুম বলছি। সেই মুহূর্তে যদিও বনহুরের শরীরে খান বাহাদুর শামস ইরানীর ড্রেস ছিলো, একটুকরা হাসি ফুটে উঠে তার ঠোঁটের কোণে, বলে—হ্যালো মিস শ্যামারাণী, আসুন না, বড় একা লাগছে।

সত্যি বলছেন? খান বাহাদুর সাহেব নেই।

না, বাইরে গেছেন, হয়তো আপনার ওখানে কিংবা পরিচালকের কাছে। আসুন না দয়া করে, প্লিজ......

আচ্ছা আসছি। সত্যি আপনার ডাকে না গিয়ে পারবো না।

অপেক্ষা করবো?

নিশ্চয়ই।

তাহলে রেখে দি?

আচ্ছা ধন্যবাদ।

বনহুর রিসিভার রেখে দিলো, তারপর কেশবকে ডেকে বললো—কেশব, আমি বাইরে যাচ্ছি, কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসবো, একটি যুবতী আসবে, মানে ঐ সেদিন যিনি এসেছিলেন, তাকে বসাবে বুঝলে?

আচ্ছা বাবু, বসাবো। বনহুর চলে যায়।

শ্যামা তখন হোটেল ফুলাগুতে আসার জন্য তৈরি হয়ে নিচ্ছিলো।

শ্যামা যখন সজ্জিত হচ্ছিলো তখন শশী এসে দাঁড়ায় তার পাশে—কোথায় যাচ্ছো শ্যামাদি?

নূরীকে শ্যামা ছোট বোনের মত মনে করতো, সেজন্য নূরী ওকে শ্যামাদি বলে ডাকতো। শ্যামা আয়নায় নিজের যৌবন ঢলঢল দেহটার দিকে নিপুণভাবে লক্ষ্য করে বললো—অজানা বন্ধুর ওখানে।

নূরী বিমর্ষ মনে বললো—শীঘ্র এসো কিন্তু।

শ্যামারাণী যখন বেরুতে যাচ্ছিলো ঠিক ঐ মুহূর্তে কক্ষে প্রবেশ করে খান বাহাদুর শামস ইরানী—হ্যালো মিস শ্যামা, কোথাও যাচ্ছেন বুঝি?

খান বাহাদুর শামস ইরানী সাহেবকে দেখে একটু ভড়কে গেলো যেন শ্যামা, ঢোক গিলে বললো—আপনি এসে গেছেন? আমি একটু বাইরে যাচ্ছি বিশেষ একটা জরুরি কাজ আছে কিনা। আপনি অবশ্য বসুন, শশীর সঙ্গে কথাবার্তা বলুন। আমি ওকে ডেকে দিচ্ছি।

মনে মনে হাসলো শামস ইরানী-বেশি বনহুর, জানে সে—শ্যামা কোথায় চলেছে। মাসুম ইরানীর আকর্ষণে সে ছুটে চলেছে এখন ফুলাগু হোটেলে।

শ্যামা ততক্ষণে শশীকে নিয়ে এলো সঙ্গে করে—এর সঙ্গে গল্প করুন খান বাহাদুর সাহেব।

আচ্ছা ধন্যবাদ।

খান বাহাদুর শামস ইরানী ফিরে তাকায় তার সম্মুখে দন্ডায়মান শশীর দিকে। চোখের চশমাটা ঠিক করে নিয়ে বলে—বসুন মিস শশীরাণী।

শশী সে কথায় কান না দিয়ে বলে—আমার সঙ্গে আপনার কি দরকার বলুন? আমি বেশিক্ষণ বিলম্ব করতে পারবো না।

কি বললেন, বেশিক্ষণ বিলম্ব করতে পারবেন না?

না। গম্ভীর কণ্ঠ শশীর।

বললো খান বাহাদুর শামস ইরানী—কিন্তু আপনি যে এখন আমার। মানে আমার ছবিতে কাজ করার জন্য আপনি চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। আপনার উপর আমার দাবি আছে। শামস ইরানী খপ করে হাত ধরে ফেলে শশীর।

না, আমি আপনার কোনো দাবি মানতে রাজি নই। ছেড়ে দিন, আমার হাত ছেড়ে দিন বলছি।

এবার বললো শামস ইরানী—আপনি আমাকে বিমুখ করবেন না মিস শশীরাণী। আপনি যা চান তাই দেবো, গাড়ি-বাড়ি-ঐশ্বর্য—যা চান।

ছেড়ে দিন, আমি কিছু চাই না, কিছু চাই না আমি। ছেড়ে দিন বলছি।

শামস ইরানী ছেড়ে দিলো শশীর হাত কিন্তু সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে শশীর আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো, বললো—মিস শশী, এ পৃথিবীতে মানুষ কি চায়? কিসের জন্য মানুষ আজ উন্মাদ—অর্থ আর ঐশ্বর্য—আপনি কি এসবের জন্যই অভিনেত্রী বনে যাননি?

না না, আমাকে এরা জোর করে ধরে এনেছে, আমি এসবের কিছু চাইনি, এখনও চাই না।

বনহুর নূরীকে এতো কাছে পেয়েও নিজকে কঠিনভাবে সংযত রেখে ওকে পরীক্ষা করে চললো। এতোদিন নূরী এদের হাতের পুতুল হয়ে আছে। সে কেমন আছে কে জানে। মাঝে মাঝে বনহুরের মনে সন্দেহের দোলা লেগেছে, কিন্তু বেশিক্ষণ সন্দেহ তার মনে স্থায়ী হতে পারেনি। নূরী কোনোদিন অসতী হতে পারে না। তবু বনহুর নিজ মনকে সচ্ছ করে নেবার

জন্যই ওকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চললো। বললো—আশ্চর্য মেয়ে আপনি! লোভ, মোহ আপনার কিছু নেই? এই সৌন্দর্য, এই ভরা যৌবন আপনি ব্যর্থ করে দেবেন?

আমার সব আশা-আকাঙ্ক্ষা, সব সখ মুছে গেছে। আমি আর কিছু চাই না, যা পাবার ছিলো পেয়েছি, এখন আর কোনো লোভ, মোহ নেই আমার।

তবে কি অভিনেত্রী জীবন আপনার মিথ্যা?

হাঁ, অভিনেত্রী আমি নই। আমাকে ওরা জোর করে অভিনেত্রী করেছে। একটু থামলো নূরী, চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রুধারা, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো আবার—খান বাহাদুর সাহেব, আমি বড় অসহায়া, বড় হতভাগী, আমার জীবন কাহিনী অত্যন্ত করুণ, ব্যথা-ভরা।

অসুবিধা মনে না করলে আপনি বলুন, যদি কোনো উপকার করতে পারি। বসুন আপনি।

এতোক্ষণে নূরী যেন নিজের মধ্যে কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে নিতে পারলো, খান বাহাদুরের কথায় অনেকটা আশ্বস্ত হলো সে, বসলো তার পাশের আসনে। তারপর বলে চললো সেই পর্বতের উপরে বনহুরের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ, কি করে আসলাম আলীর ছবিতে এসে পড়লো, তারপর আসলাম আলীর কুৎসিত মনোবাসনা থেকে নিজকে রক্ষা করার জন্য অভিনেত্রী জীবন বেছে নিলো, আরও বললো সে অভিনয় করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তবেই আমি আজও নিজের ইজ্জৎ রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছি.......

বনহুরের মনে উদয় হলো আর একদিন শ্যামার কথা, বলেছিলো শ্যামা....ভদ্রলোক যদি আজ উপহার দিতে এসে বিমুখ হয়ে ফিরে যান তাহলে আলী সাহেব তোকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না। ভুলে যাসনে শশী, শুধু তিনি তোর অভিনয়ের জন্যই.....হঠাৎ শশী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলেছিলো—থাক, আর বলতে হবে না। দিন ও মালা আমি নেবো.....আজ বনহুরের কাছে সেদিনের রহস্যপূর্ণ কথাগুলো সচ্ছ হয়ে গেলো। বুঝতে পারলো, নূরী নিজের ইজ্জৎ রক্ষার জন্যই বেছে নিয়েছে অভিনেত্রী জীবন। নিষ্পাপ ফুলের মত নূরীর অশ্রুসজল মুখখানার দিকে তাকিয়ে কিছুতেই বনহুরের মন স্থির রইলো না, সে নূরীকে গভীরভাবে আলিঙ্গন করে আবেগভরা কণ্ঠে ডাকলো—নূরী!

নূরী হঠাৎ খান বাহাদুরের এই অদ্ভুত আচরণে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিলো; পরক্ষণেই তার অতি পরিচিত কণ্ঠে মধুর সম্ভাষণ ভরা 'নূরী' ডাক কানে প্রবেশ করতেই বিস্ময়ে অভিভূত হলো। অস্ফুট কণ্ঠে বললো—কে, কে আপনি?

বনহুর নিজের মুখের দাড়ি খুলে ফেললো—নূরী!

হুর তুমি—তুমি.....নূরী বনহুরের বুকে মুখ রেখে আকুলভাবে কেঁদে উঠলো—হুর, কোথায় ছিলে তুমি এতোদিন?

নূরীকে গভীরভাবে আলিঙ্গন করে বললো বনহুর—নূরী, তোমাকে হারানোর পর থেকে আমি পাগলের মত কত জায়গায় না তোমার সন্ধান করে ফিরেছি। নূরী, তোমাকে যে ফিরে পাবো সে আশা আমার ছিলো না। নূরী—আমার নূরী!

এমন সময় বাইরে গাড়ির শব্দ হলো, বনহুর নূরীকে মুক্ত করে দিয়ে দ্রুতহস্তে দাড়ি-গোঁফ পরে নিলো।

নূরী আঁচলে চোখ মুছে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, কিন্তু তার চোখেমুখে ফুটে উঠেছে অভূতপূর্ব এক আনন্দ—দ্যুতি। তার চির সাধনার বনহুরকে পেয়েছে—এ যে কত খুশির কথা! নূরী নিষ্পলক নয়নে খান বাহাদুর শামস ইরানী-বেশি বনহুরের দিকে তাকিয়ে রইলো।

শ্যামা প্রবেশ করলো কক্ষমধ্যে। মুখোভাব তার খুব প্রসন্ন নয়, বেশ গম্ভীর মনে হচ্ছিলো তাকে।

শ্যামা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করতেই বললো খান বাহাদুর শামস ইরানী—মিস শ্যামা, আমি কিন্তু আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি। এসে গেলেন, ভালই হলো।

কেন, শশীর সঙ্গে বুঝি আলাপ জমছে না?

উঁহুঁ বড্ড নীরস মেয়ে।

হাঁ, শশীটা অমনি বটে।

আপনার কাজ হলো? প্রশ্ন করলেন শামস ইরানী।

বিষণ্ন কণ্ঠে বললো শ্যামা—না।

বলে উঠলো শামস ইরানী—ওঃ হাঁ, আপনি চলে যাবার পরই আমার ছোট ভাই মাসুম ফোন করেছিলো আপনার কাছে।

মাসুম সাহেব ফোন করেছিলেন? আনন্দভরা গলায় উচ্চারণ করলো শ্যামা কথাটা। তার মুখমন্ডলে ছড়িয়ে পড়লো একটা প্রসন্ন ভাব। বললো সে—কি বললেন তিনি?

বললো শামস ইরানী—মাসুম সন্ধ্যায় এখানে আসবে, আপনি যেন তার জন্য অপেক্ষা করেন।

সত্যি?

হাঁ সত্যি। দেখুন, মাসুম এখানে এসে অবধি কারো সঙ্গে মিশবার সুযোগ পায়নি। সে বলেছিলো, আপনাকে নাকি তার খুব ভাল লেগেছে।

শ্যামার মুখে রক্তাভ আভা ফুটে উঠলো। লজ্জিতভাবে বললো সে—আপনি নাকি তাকে কোথাও আসতে দেন না, মানে কারো বাড়িতে যাওয়া পছন্দ করেন না?

সে কথা অবশ্য সত্যি। তবে আপনার বাড়ি এলে আমার তেমন কোনো আপত্তি নেই।

খান বাহাদুর সাহেব, আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেবো!

এতে আর ধন্যবাদের কি আছে মিস শ্যামারাণী!

আপনি যে আমাকে নিজের মনে করেন এজন্য আমি আনন্দিত। মাসুম সাহেবের বড় ভাই হিসেবে আপনি আমারও সম্মানিত জন।

আচ্ছা চলি আজকের মত মিস শ্যামা? অনেকক্ষণ শশী রাণীকে আটকে রেখেছিলাম, এজন্য আমি.....

না না, শশী এতে কিছু মনে করেনি বরং সে খুশিই হয়েছে। কারণ একা একা তার বড় খারাপ লাগতো।

খান বাহাদুর শামস ইরানী উঠে পড়লো।

❑

সন্ধ্যার পূর্বে বনহুর গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লো, এখন তার দেহে স্বাভাবিক ড্রেস। দামী স্যুট পরে নিয়েছে সে, শ্যামার ওখানেই চলেছে বনহুর।

এদিকে শ্যামাও আজ সেজেছে নিখুঁতভাবে; মাসুম ইরানীকে সাদর সম্ভাষণ জানানোর জন্য উন্মুখ হৃদয় নিয়ে প্রতীক্ষা করছে সে।

নূরী তখন শামস ইরানী-বেশি বনহুরকে তার ছোট ভাই সম্বন্ধে শ্যামার সঙ্গে আলাপ করতে দেখে অবাক হয়েছিলো, কারণ সে জানে, বনহুরের কোনো ভাই নেই। তবু মনে কেমন যেন একটা সন্দেহ জেগেছিলো তার। নূরীও বিপুল আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে, সন্ধ্যায় নতুন আগন্তুকটিকে দেখার জন্য।

শ্যামা বার বার হাতঘড়িটার দিকে তাকাচ্ছে, কই এতোক্ষণও মাসুম ইরানী তো এলো না? শ্যামার মধ্যে চঞ্চলতা যেন ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

নূরী বিস্মিত হচ্ছিলো, না জানি কে সে মাসুম ইরানী? শ্যামার সঙ্গে কি তার সম্বন্ধ? বনহুরের ভাই-ই বা এলো কোথা হতে? নূরী শ্যামার মতই উন্মুখ হয়ে প্রতীক্ষা করছিলো।

এমন সময় একখানা গাড়ি এসে থামলো শ্যামার বাড়ির দরজায়।

শ্যামা ড্রইংরুমে অপেক্ষা করছিলো, মাসুম ইরানী-বেশি বনহুর গাড়ি থেকে অবতরণ করতেই শ্যামা হাস্যোজ্জ্বল মুখে তাকে সাদর সম্ভাষণ জানালো।

আড়াল থেকে নূরী লক্ষ্য করছিলো, গাড়ি থেকে তার হুরকে নামতে দেখে যেমন আনন্দে হৃদয় তার নেচে উঠলো তেমনি বিস্মিত হলো। তবে কি বনহুর মিথ্যা বলেছিলো শ্যামার কাছে? নূরী বুঝতে পারলো, এটা বনহুরের একটা চালাকি।

একটু পরে শ্যামা বনহুরসহ প্রবেশ করলো নূরীর কক্ষে। নূরী তখন আড়াল থেকে নিজের বিছানায় গিয়ে বসেছিলো। পদশব্দে মুখ তুলতেই শ্যামার পিছনে বনহুরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলো, বনহুর চোখ টিপে তাকে ইংগিত করলো।

শ্যামা হাস্যোজ্জ্বল মুখে বললো—শশী, ইনি খান বাহাদুর শামস ইরানীর ছোট ভাই মাসুম ইরানী।

নূরী যেন এই প্রথম দেখছে মাসুম ইরানীকে, এমনিভাবে শ্যামা ও পরে বনহুরের মুখের দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালো, কোনো কথা বললো না। বনহুর নূরীর দিকে তাকিয়ে বললো—ইনিই বুঝি শশী?

হাঁ, বড্ড লাজুক মেয়ে।

বনহুর বললো—দেখতেই পাচ্ছি।

যেমন লাজুক তেমন মিষ্টি মেয়ে শশী, কিন্তু ঝালও কম নয়। একটু রাগলে নাগকন্যার মত হয়ে যায়।

সর্বনাশ, তাহলে তো ভয়ানক কথা। সাবধানে চলতে হবে, কি বলেন?

তাতো নিশ্চয়ই।

বসুন মিঃ মাসুম। শ্যামা আসন গ্রহণ করে বলে আবার—শশী বসো। তিনজন মিলে গল্প করা যাক।

বনহুর বসে পড়ে, বলে সে—হাঁ, আজকের সন্ধ্যাটা বেশ কাটবে বলে মনে হচ্ছে।

শ্যামা বয়কে চা-নাস্তার জন্য বলে দেয়।

বয় চলে যায়।

শ্যামা বনহুরের পাশের আসনটায় উঠে এসে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে।

নূরী নতচোখে একবার দেখে নেয়।

শ্যামা বনহুরকে লক্ষ্য করে বলে—মিঃ মাসুম, আপনি চুপচাপ বসে বসে কি করে দিন কাটান?

কেন? বললো বনহুর।

মানে বড় ভাই-এর উপর নির্ভর করেই কি চিরদিন কাটবে আপনার?

আমি ঠিক আপনার কথা বুঝতে পারছি না? বললো বনহুর।

শ্যামা একটু কৌশলে ফাঁদ পাতার চেষ্টা করলো। বললো—খান বাহাদুর সাহেব বললেন, আপনি নাকি এখন সম্পূর্ণ বসে বসেই কাটাচ্ছেন?

হাঁ, আপাততঃ কোনো কিছু করছি না। তা ভাইজান বুঝি কিছু বলেছেন আপনার কাছে?

ঠিক স্পষ্ট করে বলেননি, তবে তার কথাবার্তায় বুঝতে পারলাম, আপনি এখন সম্পূর্ণ বড় ভাই-এর উপর নির্ভর করছেন।

হাঁ, চাকরী-বাকরী যখন করছি না তখন একরকম তাই। কিন্তু হঠাৎ এ কথাটা বলার পিছনে কি আপনি কিছু বলতে চান?

চাই বইকি!

বলুন?

অলক্ষ্যে একবার নূরীর দিকে তাকিয়ে দেখে নিলো বনহুর।

বললো শ্যামা—আসলাম আলী সাহেব বলেছিলেন যে, মাসুম ইরানী যখন বসেই আছেন, আর তার ভাইজান যখন ছবি করবেন মনস্থ করেছেন তখন, মানে আপনি আপনার ভাই-এর ছবিতে হিরোর রোলটা না হয় করলেন। অবশ্য এতে যদি আপনার মত থাকে......

একটু হাসলো বনহুর, বড় সুন্দর দেখালো ওকে।

শ্যামা অভিভূতের মত বলেই চললো—আপনার মত হিরো পেলে আলী সাহেবের ছবি অদ্ভুত রকম হিট করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

থামলো শ্যামা।

বনহুর আর নূরীর মধ্যে আর একবার দৃষ্টি বিনিময় হলো।

বনহুর বললো—কিন্তু অভিনয় করতে পারবো কিনা, এতেও তো সন্দেহ আছে?

শ্যামা হেসে উঠলো খিল খিল করে—আলী সাহেবের কাছে শশীর মত মেয়ে যদি বাগে আসতে পারে—আপনি তো পুরুষ মানুষ। সত্যি আপনি রাজি আছেন আলী সাহেবের প্রস্তাবে?

খুব খুব রাজি, ভাই-এর ছবিতে হিরোর রোল করবো এতে আবার আপত্তি!

শ্যামা বনহুরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো—আপনাকে ধন্যবাদ।

বনহুরও অগত্যা হাত বাড়িয়ে দিলো শ্যামার দিকে, শ্যামা ওর করমর্দন করলো। শ্যামার মনে একটা আনন্দ দোলা দিয়ে গেলো। বললো শ্যামা—চলুন না আজ 'স্বয়ংবরা' দেখে আসি?

বনহুর তাকালো আবার নূরীর দিকে—মিস শশী যদি যান তাহলে তিনজন মিলে না হয় যাওয়া যেতো।

শ্যামা বললো—শশী বড্ড বেরসিক, ও ছবি দেখতে যাবে না! চলুন আমরা দু'জনাই যাই।

কিন্তু উনাকে রেখে......বললো বনহুর।

নূরী বলে উঠলো—আমি যাব না শ্যামাদি, তুমি যাও।

দেখলেন তো? চলুন মিঃ মাসুম.....বনহুরের হাত ধরে টেনে উঠিয়ে নিলো শ্যামা।

বনহুরের কাছে এতোটা বড় খারাপ লাগছিলো—বিশেষ করে নূরীর সামনে, কিন্তু না গিয়ে পারলো না, নূরীকে উদ্ধার করতে হলে শ্যামাকে সন্তুষ্ট রেখে কার্যোদ্ধার করতে হবে।

নূরীকে ছেড়ে যেতে যদিও বনহুরের বাধছিলো তবুও যেতে হলো, শ্যামার পাশে ড্রাইভ আসনে উঠে বসে গাড়িতে ষ্টার্ট দিলো। হঠাৎ বনহুরের দৃষ্টি চলে গেলো বেলকুনিতে, দেখলো নূরীর দু'টি দীপ্ত আঁখি লক্ষ্য করছে তাকে।

দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো গাড়িখানা, নূরীও ফিরে গেলো কক্ষমধ্যে। শ্যামার সঙ্গে বনহুর চলে গেলো, এতে দুঃখ নেই কিন্তু মন যে তার বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কেমন যেন একটা অসহ্য যন্ত্রণা তার বুকের মধ্যে আলোড়ন তুলছে।

এখানে নূরী যখন বনহুরের সাক্ষাৎলাভ করেও তাকে নিবিড় করে পাচ্ছে না, তখন দিল্লীর বুকে মনিরা স্বামীর জন্য চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়েছে। সেই যে সাপুড়ে সর্দারের সঙ্গে চলে গেলো আর সে ফিরে এলো না।

কান্দাই থেকে মরিয়ম বেগম বার বার চিঠি লিখছেন, মনিরা যেন এখন দেশে ফিরে আসে, বিশেষ করে তার শরীর দিন দিন ভেঙ্গে পড়েছে। তাছাড়া নূরও অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে পড়েছে মায়ের জন্য। মনিরা তার মামীমার চিঠি পেয়ে অস্থির হয়ে পড়লো, নূরের কথা সব সময় মনে হতে লাগলো তার।

এদিকে হাশেম চৌধুরী দিল্লী থেকে বদলীর সময় হয়ে এসেছে। মনিরাকে নিয়ে মাসুমা চিন্তায় পড়লো, কারণ, মনিরা এমনভাবে বেঁকে বসলো তাকে কান্দাই রেখে না এলেই নয়। মাসুমা বান্ধবীকে অনেক করে বুঝাতে লাগলো, নিশ্চয়ই তোর স্বামী ফিরে আসবে, ওর জন্য কিছু ভাবিসনে বোন।

মাসুমার সান্ত্বনায় মনিরার অশ্রু কিছুতেই বাধ মানছিলো না—হায়, কতদিন আর তার প্রতীক্ষায় বুক বেঁধে এই সুদূর দিল্লী নগরীতে পড়ে থাকবে। কোথায় গেছে সে, কেমন আছে, তাই বা কে জানে। মনিরা

স্বামীর জন্য নতুন করে ভাবতে পারে না আর, কারণ আজ প্রথম নয়—তাকে ছেড়ে কতদিন সে উধাও হয়েছে এমনিভাবে। কত যে চোখের পানি ফেলেছে মনিরা স্বামীর জন্য, কত যে ব্যথা অন্তরে চেপে তুষের আগুনে দগ্ধীভূত হয়েছে তার অন্ত নেই। তবু কিছুতেই স্বামীকে সে ধরে রাখতে পারেনি কোনোদিন।

অশ্রু মনিরার সাথী।

স্বামীকে ভালবেসে মনিরা পেয়েছে শুধু ব্যথা আর দুঃখ তবুও মনিরা স্বামী-চিন্তা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না। স্বামীই যে তার জীবনের আশা-ভরসা, স্বপ্ন-সাধ—সবকিছু।

মনিরা এবার দেশে ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, হাশেম চৌধুরী বা মাসুমার কোনো কথাই তাকে আর স্থির রাখতে পারলো না।

কান্দাই শহরে মনিরাকে রেখে আসার জন্য হাশেম চৌধুরী মনস্থির করে ফেললেন। ছুটির জন্য ব্যবস্থা করলেন তিনি।

স্বামীর চিন্তায় মনিরা যখন অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছে, তখন বনহুর নূরীকে উদ্ধার ব্যাপার নিয়ে নানাভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে চলেছে। কৌশলে হাত করেছে পরিচালক আলী সাহবেকে, শ্যামাকেও হাতের মুঠায় এনে নিতে তার বিলম্ব হয়নি। নূরীর সঙ্গেও সাক্ষাৎলাভ ঘটেছে, এখন তাকে বোম্বে থেকে সরাতে পারলেই নিশ্চিন্ত হবে বনহুর।

আজকাল প্রায়ই আসে বনহুর শ্যামার ওখানে, পরিচালক আলী সাহেবের উপর ভার দিয়েছে ছবির কাহিনী বেছে নেওয়ার জন্য। আসলাম আলী তাই আজকাল কাহিনী খুঁজে বেড়াচ্ছেন, মনের মত কাহিনী না পেলে ছবি করতে রাজি নন তিনি।

কাহিনী ব্যাপার নিয়ে আসলাম আলী যখন ব্যস্ত তখন বনহুর মাসুম ইরানী-বেশে ঘনিষ্ঠভাবে শ্যামা আর নূরীর সঙ্গে ভাব জমিয়ে বসেছে। আজকাল তাদের দু'জনাকেই সঙ্গে করে এখানে-সেখানে যাওয়া-আসা শুরু করেছে সে। তবে শ্যামার দিকেই প্রকাশ্য ভাবটা যেন বেশি দেখায় সেদিকে ছিলো বনহুরের বিশেষ লক্ষ্য। অবশ্য নূরী এর কারণ বুঝতো, সে এতে কোনো রকম অসন্তুষ্ট হতো না।

একদিন সুযোগ এলো, কেশব জানালো—দিল্লীগামী প্লেনের টিকেট সে ক্রয় করে ফেলেছে: । বনহুর, নূরী কেশব আর ফুলমিয়ার। চারখানা টিকেট বুক করে কেশবের আনন্দ আর ধরে না, এবার ফুলকে নিয়ে সরে পড়বে তারা।

সেদিন বললো বনহুর—কেশব, আজ রাতের প্লেনে আমরা রওয়ানা হবো, মনে আছে?

আছে মানে, খুব মনে আছে।

ফুলমিয়া ওপাশে দাঁড়িয়েছিলো, সরে এলো বনহুরের সামনে—স্যার, সব গোছানো হয়ে গেছে।

সব মানে?

মানে আমার জিনিস সব বেঁধে ঠিক করে নিয়েছি।

ওসব তো নেওয়া চলবে না ফুলমিয়া। জিনিসপত্রের মায়া ত্যাগ করে যেতে হবে আমাদের।

অবাক কণ্ঠে বললো ফুলমিয়া—এতো টাকার মূল্যবান জিনিসপত্র ছেড়ে যাবেন স্যার?

না গিয়ে তো কোনো উপায় নেই। হাঁ শোন, গাড়িখানাও ছেড়ে যেতে হবে, কারণ আমরা যে বোম্বে শহর ত্যাগ করে চলে যাচ্ছি বা চলে যাবার মতলব আঁটছি, এটা যেন কেউ বুঝতে না পারে। এমনকি ফুলাগু হোটেলের মালিকও যেন টের না পায়।

কেশব বলে উঠলো—বাবু, অতো টাকার গাড়িখানা......

হাসলো বনহুর—শুধু গাড়ির মায়াই ত্যাগ করতে হবে না কেশব, সব কিছু ত্যাগ করে আমরা নূরীকে উদ্ধার করবো।

বাবু সেই ভাল।

শোন কেশব, রাত এগারোটায় তোমরা দু'জন ভাল পোশাক-পরিচ্ছদ পরে এরোড্রামে অপেক্ষা করবে। আমি নূরীকে ঠিক সময় অনুযায়ী নিয়ে হাজির হবো, বুঝলে? হোটেলের মালিককে বলে যাবে আমাদের এক জায়গায় দাওয়াত আছে, ফিরতে রাত হবে। চাবিটা ফুলাগুর মালিককে দিয়ে যাবে।

আচ্ছা!

ঠিকভাবে কাজ করবে, কোনোরকম কেউ যেন টের না পায় যে আমরা আজ বোম্বে ত্যাগ করছি।

আপনার কথামতই কাজ করবো বাবু।

❑

আজ খান বাহাদুর শামস ইরানীর ছবির মহরৎ অনুষ্ঠান বোম্বে ষ্টুডিওতে অনুষ্ঠিত হবে। পরিচালক আসলাম ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছেন। ছবির একখানা গান আজ রেকর্ড করা হবে সুগায়িকা দেবীকা রাণীর কণ্ঠে। ছবির

নাম রাখা হয়েছে 'আলেয়ার আলো।' এ নামটা ইরানী নিজেই পছন্দ করে দিয়েছে।

রাত্রি আট ঘটিকায় মহরৎ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। ছবিতে যে সব আর্টিষ্ট অভিনয় করবেন প্রায় সবাই এসেছেন অনুষ্ঠানে। ছবির উদ্বোধন করবে স্বয়ং খান বাহাদুর শামস ইরানী।

ছবির নায়িকার চরিত্রে থাকবে শশী। শ্যামাও থাকবে এ ছবিতে; কাজেই এরা উভয়েই এসেছে। মহরৎ অনুষ্ঠান শেষ হলো, দেবীকা রাণীর কণ্ঠে গানও রেকর্ড করা হলো একখানা।

শ্যামা অনেক করে বলা সত্ত্বেও আসেনি মাসুম ইরানী। শ্যামা তাই বার বার অনুযোগ করছিলো শাসম ইরানীর কাছে—কেন এলেন না মাসুম সাহেব? আপনার ছবি—তিনি না আসার কারণ কি? এলেই তিনি ভাল করতেন, সবার সঙ্গে পরিচিত হতেন এবং তাকে আপনার ছবির হিরো করার চেষ্টা নিতে পারতেন।

খান বাহাদুর শামস ইরানী-বেশি বনহুর মাসুম ইরানীর জন্য শ্যামাকে ব্যস্ত হতে দেখে মনে মনে হাসলো।

উৎসব শেষ হবার অল্পক্ষণ বাকি আছে, এমন সময় হঠাৎ শশী অজ্ঞান হয়ে পড়লো। একি অঘটন, সমস্ত লোকজন উৎকণ্ঠা হয়ে পড়লেন।

উৎসবের কাজ এখনও বাকি আছে। মহরতের মিষ্টি বিতরণ এখনও হয়নি। পরিচালক এমন একটা দুর্ঘটনার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। শশীকে নিয়ে সবাই যখন ব্যস্ত তখন খান বাহাদুর শামস ইরানী ডাক্তার আনতে ছুটলো। তাঁর নিজের ছবির নায়িকা, কাজেই তার ব্যস্ত হবার কথাই।

একটু পরেই ডাক্তার নিয়ে ফিরে এলো শামস ইরানী।

ডাক্তার শশীকে পরীক্ষা করে বলেন, অত্যন্ত চিন্তায় হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েছে, এখন সম্পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন।

কিন্তু এখনও যে ফাংশন শেষ হয়নি।

খান বাহাদুর শামস ইরানী স্বয়ং শশীকে তাদের বাসায় পৌঁছে দেবে রাজি হলো। সঙ্গে যাবে শ্যামা।

শশীর সংজ্ঞাহীন দেহটা কয়েকজন মিলে গাড়িতে উঠিয়ে দিলো। শ্যামা শশীর পাশে বসলো।

শামস ইরানী স্বয়ং বসলো ড্রাইভিং আসনে।

গাড়ি বোম্বে ষ্টুডিও ত্যাগ করলো।

রাত এখন দশটা দশ মিনিট বেজেছে। হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে স্পীড়ে গাড়ি ছাড়লো শাসম ইরানী।

এ পথ-সে পথ করে গাড়ি চলেছে।

শশীর মাথাটা শ্যামার কোলো ছিলো, এবার নড়ে উঠলো সে। বললো শশী—পানি, একটু পানি দাও।

শ্যামা বলে উঠে—শশী একটু অপেক্ষা করো, এই তো এসে গেলাম বলে।

শ্যামা যখন ঝুঁকে কথাটা জিজ্ঞাসা করছিলো, ঐসময় গাড়িটাও এক ঝাঁকি দিয়ে থেমে পড়ে।

চমকে উঠে শ্যামা—কি হলো খান বাহাদুর সাহেব?

ঐ মুহূর্তে শামস ইরানী পকেট থেকে একখানা রুমাল বের করে অকস্মাৎ চেপে ধরলো শ্যামার নাকের উপর।

কিছু স্মরণ করার পূর্বেই শ্যামা ঢলে পড়ে গাড়ির পিছন আসনে।

শামস ইরানী বেশি বনহুর এবার হেসে উঠে হাঃ হাঃ করে। তারপর হাসি থামিয়ে বলে—নূরী, তুমি ঠিক আমার কথামতই কাজ করেছো।

সত্যি আমি বড্ড ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। ভাগ্যিস, ডাক্তার আমার অজ্ঞান সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেননি।

বললো বনহুর—ডাক্তার অন্য কেউ নয়, কেশব।

কেশব দা?

হাঁ, তাকেই আমি পূর্ব হতে ডাক্তার সাজিয়ে তৈরি রেখেছিলাম।

কোথায় তবে কেশব দা?

সে এখন বোম্বে এরোড্রামে চলে গেছে, আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে কেশব আর ফুলমিয়া।

ফুলমিয়া! ফুলমিয়া কে?

সেও কেশবের মত একজন। বনহুর আর মুহূর্ত বিলম্ব না করে গাড়ি নিয়ে শ্যামার বাড়ি অভিমুখে রওয়ানা দিলো।

শ্যামার বাড়ির দরজায় গাড়ি পৌঁছতেই শ্যামার চাকর ছুটে এলো।

শামস ইরানীকে দেখে সালাম জানালো সে।

শামস ইরানী ব্যস্তকণ্ঠে বললো—শীঘ্র আমাকে সাহায্য করো, মিস শ্যামারাণী হঠাৎ ষ্টুডিওতে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলো।

চাকরতো অবাক হয়ে গেলো।

শামস ইরানী-বেশি বনহুর সংজ্ঞাহীন দেহটা হাতের উপর তুলে নিলো, তারপর তাকে অন্দর বাড়িতে নিয়ে সচ্ছন্দে শয্যায় শুইয়ে দিলো। চাকরকে লক্ষ্য করে বললো—ওর দিকে খেয়াল রেখো।

স্যার আপনি?

আমি শশীকে ষ্টুডিওতে পৌঁছে দিয়ে ডাক্তার নিয়ে ফিরে আসবো এক্ষুণি.....আসুন মিস শশী রাণী।

বনহুর নূরীর হাত ধরে দ্রুত বেরিয়ে যায়।

গাড়ির দরজা খুলে ধরে বলে বনহুর—নূরী উঠে পড়ো।

নূরী ড্রাইভ আসনের পাশের সিটে উঠে বসে বলে—কোথায় যাবে হুর?

এরোড্রামে। ড্রাইভ আসনে উঠে বসতে বসতে বললো বনহুর।

হুর, ভাবতে পারিনি তোমায় ফিরে পাবো। মনে হচ্ছে, আমি স্বপ্ন দেখছি!

বনহুর ক্ষণিকের জন্য ভুলে যায় সব কথা—এমন কি প্লেনের সময় আর বেশি নেই, একথাও বিস্মৃত হয় সে। নূরীকে গভীরভাবে কাছে টেনে নেয়, চুম্বনের পর চুম্বন দিয়ে আবেগভরা গলায় ডাকে—নূরী! সত্যি কি তোমায় পেয়েছি নূরী?

হুর, খেয়াল করো, খেয়াল করো হুর। হঠাৎ কেউ এসে পড়লে পালানো হয়তো সম্ভব হবে না। বনহুরের বলিষ্ঠ বাহুবন্ধন থেকে নিজকে মুক্ত করে নিতে চেষ্টা করলো নূরী।

কতদিন পর আজ নূরীকে ফিরে পেয়েছে একান্ত নির্জনে, বনহুর কিছুতেই নিজকে সংযত রাখতে সক্ষম হচ্ছিলো না। নূরীর কথা যে মিথ্যা নয় বেশ অনুমান করছিলো সে, কারণ এই মুহূর্তে যদি কেউ এসে পড়ে তাহলে হয়তো পালানো আর হয়ে উঠবে না।

বনহুরের সম্বিৎ ফিরে এলো নূরীর কথায়, এবার সে নূরীকে মুক্ত করে দিয়ে সোজা হয়ে বসলো, গাড়িতে ষ্টার্ট দিলো বনহুর।

নূরীর বুকটা আনন্দে আপ্লুত হয়ে উঠেছে। বনহুরের স্পর্শে তার মৃতদেহে যেন জীবন ফিরে এলো। নূরী মাথাটা রাখলো বনহুরের কাঁধে।

গাড়ি তখন উল্কা বেগে ছুটে চলেছে।

নূরী যেন স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করে ফিরছে, মনে তার অফুরন্ত আনন্দ। বনহুরকে পাওয়া তার যেন আকাশের চাঁদ পাওয়ার সমতুল্য।

এরোড্রামে পৌঁছতেই কেশব আর ফুলমিয়া এসে দাঁড়ালো, প্লেন ছাড়বার আর কয়েক মিনিট বাকি, বনহুর নূরসহ কেশব আর ফুলমিয়াকে নিয়ে প্লেনে উঠে বসলো।

ফুলমিয়ার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো নূরীর।

নূরীকে ফুলমিয়া প্রথম দেখলো, অবাক হলো সে নূরীর অপরূপ সৌন্দর্য দেখে। এমন মেয়ে সে জীবনে কমই দেখেছে, নিষ্পলক নয়নে দেখতে লাগলো সে তাকে।

কেশবের আনন্দ আর ধরে না, কি করে তার বোন ফুলকে অন্তরের প্রীতি জানাবে ভেবে পায় না। কেশব বললো—ফুল, ভাল আছ তো?

আছি। তুমি কেমন ছিলে কেশব দা?

দেখতেই পাচ্ছো বোন।

এমনিভাবে কথাবার্তা হয় ওদের মধ্যে।

এখনও বনহুরের দেহে শামস ইরানীর ড্রেস—মাথায় আধা পাকা চুল, দাড়িতেও পাক ধরেছে, চোখে চশমা,মাথায় টুপি। নূরীর পাশের আসনে বসলো বনহুর।

প্লেন এরোড্রামের প্লাটফরমে চক্রাকারে ঘুরপাক খেয়ে ধীরে ধীরে আকাশ-পথে উঠে পড়লো।

বোম্বে শহরের বুকে পড়ে রইলো খান বাহাদুর শামস ইরানীর মূল্যবান জিনিসপত্র আর নতুন চকচকে গাড়িখানা। নীরব প্রহরীর মতই এরোড্রামের অদূরে গাড়িখানা দাঁড়িয়ে রইলো যেন উদাস জননী-পুত্রকে বিদায় দিয়ে ভুলে গেছে ফিরে যাওয়ার কথা।

❑

দিল্লী পৌঁছে বনহুর নূরী, কেশব ও ফুলমিয়াসহ একটি হোটেলে উঠে। বনহুর এখানে পৌঁছেই খান বাহাদুর শামস ইরানীর ড্রেস পরিত্যাগ করলো। যদিও বিশ্রামের অবসর তার ছিলো না তবু কতদিন পর নূরীকে সে নিবিড় করে পেয়েছে, একটি দিনের বিশ্রাম আসায় তার মন উন্মুখ হয়ে উঠলো।

হোটেলের জনহীন কামরায় নূরীকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে ফেললো। ওর কোমল দেহটাকে বলিষ্ঠ বাহুতে নিষ্পেষিত করে ফেলতে চাইলো বনহুর।

নূরী নিজেকে মুক্ত করে নেবার বৃথা চেষ্টা করে বললো—হুর, ছেড়ে দাও কেউ এসে পড়বে।

বনহুর নূরীর মুখের কাছে মুখ নিয়ে বললো—দরজা বন্ধ করে দিয়েছি। কেউ আসতে পারবেনা!

বড্ড দুষ্ট তুমি!

তার চেয়েও বেশি।

না, তুমি আমায় ছেড়ে দাও হুর।

আমার হাত থেকে তুমি মুক্তি পাবে না আজ।

হুর,তুমি আমায় ক্ষমা করো। যা হাবার হয়েছিলো, কিন্তু আর নয়। তোমার-আমার মধ্যে এখনও মস্তবড় প্রাচীর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। হুর তোমার-আমার এখনও বিয়ে হয়নি—একথা ভুলে যেওনা।

বনহুর ক্ষণিকের জন্য স্থির নয়নে তাকায় নূরীর দিকে।

নূরী বলে—আমার কথা ভেবে দেখো হুর?

বনহুরের বাহুবন্ধন সামান্য শিথিল হয় বটে কিন্তু একেবারে ওকে মুক্ত করে দেয় না সে, বলে—নূরী লৌকিকতাপূর্ণ বিবাহ উৎসব আমাদের হয়নি, কিন্তু মনপ্রাণ দিয়ে তুমি কি আমাকে একদিন স্বামী বলে গ্রহণ করোনি?

করেছিলাম কিন্তু---

বনহুর নূরীর মুখে দক্ষিণ হস্তখানা চাপা দেয়—আর কিন্তু নয় নূরী। তুমি আমাকে বিমুখ করো না লক্ষ্মীটি।

নূরী পারলো না নিজকে কঠিন করতে, বনহুরের বুকে মুখ গুঁজে বললো—আমি যে তোমারই হুর।

হাঁ নূরী, তুমি আমার। শুধু আমারই----

কতক্ষণ যে নূরী বনহুরের বাহুতে আবদ্ধ ছিলো খেয়াল নেই নূরীর। হুঁশ হলো এবার, বললো—কেশব দা আর ফুলমিয়া কি ভাববে বলো তো?

দস্যু বনহুর কোনেদিন কারো ভাবাভাবি নিয়ে চিন্তা করে না—একথা তুমি আজ শুনছো? শোন নূরী, এবার তোমাকে কাজের কথা বলি।

বলো?

এবার তোমাকে সেই ড্রেস গ্রহণ করতে হবে, যে ড্রেসে তুমি একদিন সাপুড়ে সর্দারের কন্যা সেজে ছিলে।

তুমি যা চাও আমি তাই করবো হুর।

করবে? করবে নূরী। ব্যাকুল কণ্ঠ বনহুরের।

নূরী অস্ফুট কণ্ঠে বললো—হাঁ করবো।

নূরী, মনিরা আর তোমাকে নিয়ে কান্দাই ফিরে যেতে চাই।

বেশতো, এ আনন্দের কথা!

কিন্তু মনিরা আর তোমার মধ্যে আজও আসল পরিচয় ঘটেনি---

নূরী কোনো জবাব দেয় না।

বলে চলে বনহুর—নূরী, যদিও কান্দাই-এ আমার আস্তানায় একবার মনিরার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ ঘটেছিলো সে ক্ষণিকের জন্য—মনিরা তোমাকে মোটেই চিনতে পারবে না। কাজেই তুমি তার কাছে নিজকে সাপুড়ে সর্দারের কন্যা বলে পরিচয় দেবে---

বেশ, তাই হবে।

এতে তুমি দুঃখ পাবে না তো?

দুঃখ আমার নেই। হুর, তুমি যাতে সুখী হও এটাই আমার কামনা।

নূরী, জানো তোমার মনি এখন মনিরার কাছেই আছে। কান্দাই ফিরে গেলেই তাকে কাছে পাবে।

সত্যি তাকে পাবো? আমার মনিকে পাবো?

হাঁ পাবে।

নূরী কিছুক্ষণ মৌন থেকে বললো—হুর, মনিরার কাছে আমাকে সাপুড়ের মেয়ে বলেই পরিচয় দাও। আমি যেন মনিকেই পাই।

আচ্ছা, তোমার আশাই পূর্ণ হবে নূরী। একটু থেমে বললো বনহুর—মনিরা এখন দিল্লী লালবাগের পুলিশ সুপার মিঃ হাশেম চৌধুরীর বাড়িতে তার বান্ধবীর নিকট অবস্থান করছে।

হাঁ, আমার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটেছিলো।

সে কথা আমি জানি; এটাও জানি, তোমার নাচ দেখে মনিরা আত্মহারা হয়ে নিজ গলার মালা তোমায় উপহার দিয়েছিলো।

এবং সেই মালা উপলক্ষ করেই তুমি খুঁজে পেয়েছিলে বোন মনিরাকে।

সব মনে আছে নূরী।

হুর, আমার আর এক মুহূর্ত এইসব দেশে কাটাতে ইচ্ছা হচ্ছে না। ফিরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে আমার মনির কাছে---

আমার মনও চঞ্চল হয়ে উঠেছে নূরী, কতদিন আস্তানা ত্যাগ করে এসেছি। না জানি আস্তানার সবাই কেমন আছে। আমার অনুচরগণ কে কেমন আছে তাও জানি না। জানিনা আমার তাজের অবস্থা এখন কি হয়েছে। আমার জন্য কেঁদে কেঁদে তাজ হয়তো শুকিয়ে গেছে, কতদিন তাজকে দেখি না, বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে বনহুরের গলা।

নূরী বনহুরের মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দেয়। তার চোখ দুটোও তখন অশ্রু ছলছল করছিলো।

❑

অনেক দিন পর স্বামীকে ফিরে পেয়ে মনিরার আনন্দ আর ধরে না। হাশেম চৌধুরী এবং মনিরার বান্ধবী মাসুমাও খুশিতে আত্মহারা হলো। কতদিনের আরাধনার পর ফিরে এসেছে তাদের প্রতীক্ষিত জন।

কিন্তু মনিরার প্রথম আনন্দোচ্ছ্বাস কাটতেই স্বামীর সঙ্গে পূর্বের সেই সাপুড়ে কন্যাটিকে দেখে গম্ভীর হয়ে পড়লো। তাকিয়ে দেখলো নূরীর দেহে সাপুড়ে কন্যার ড্রেস—ঘাগড়া, ব্লাউজ, ওড়না। মাথায় চুলগুলো বিনুনী করে কাঁধের দু'পাশে ঝোলানো। চোখে কাজল, ললাটে সোনা পোকার পাখার টিপ। অদ্ভুত সুন্দর লাগছে ওকে। কিছুক্ষণ নূরীর দিকে তাকিয়ে বললো মনিরা—ওকে সঙ্গে এনেছো কেন?

বনহুর স্বাভাবিক গলায় বললো—মনিরা, সে অনেক কথা, সব তোমাকে পরে বলবো। তবে কিছুটা শুনে রাখো, যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা রওয়ানা দিয়েছিলাম তা সফল হয়েছে এবং এই সফলতা অর্জন করতে গিয়ে

আমাদের অনেক বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিলো—শেষ পর্যন্ত আমাদের পথ প্রদর্শক সাপুড়ে বাবাজীকে হারাতে হয়েছে। জংলীরা তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। মনিরা, তাই নিহত সাপুড়ে সর্দারের অসহায়া কন্যা ফুলকে আমি সঙ্গে আনতে বাধ্য হয়েছি।

মনিরা বলে উঠলো—ওকে কি করবে তুমি?

আমার নয়, তোমার অনেক কাজে আসবে—সঙ্গে নিয়ে চলো ওকে। তাছাড়া ও যাবেই বা কোথায়, ওর তো কেউ নেই আর।

বনহুরের কথায় মনিরা সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হতে পারলো না, তীক্ষ্ণ নজরে দেখতে লাগলো, মুখেচোখে ফুটে উঠেছে গাম্ভীর্যের ছাপ। কোনো কথা বললো না সে।

মাসুমা হেসে বললো—মনিরা, তোর ভালই হলো, একদিন না বলেছিলি মেয়েটিকে আমার খুব পছন্দ, ইচ্ছে হয় ধরে রাখি আর যখন খুশি নাচ দেখি। কেমন, এখন তোর ইচ্ছে পূর্ণ হলো তো? যখন খুশি নাচও দেখতে পাবি।

হাশেম সাহেব বললেন—মন্দ কি, এমন একটি মেয়ে সব সময় পাশে থাকলে অনেক কাজ হবে। যা দিন-সময় পড়েছে, কাজের লোক পাওয়াই মুস্কিল।

হাঁ, ঠিক বলেছো।! মনিরা, তোর বাচ্চা নাকি ভারি দুষ্ট! ওকে সামলাতে এমনি একটি মেয়ের দরকার। ভালই হলো, নিয়ে যা সঙ্গে করে, মেয়েটাকে দেখে বড় মায়া লাগছে কিন্তু।

বনহুর তখন সকলের অজ্ঞাতে একবার নূরীর মুখে তাকিয়ে দেখে নিলো। না, নূরীর মুখে কোনোরকম বিষণ্ন ভাব ফুটে ওঠেনি। অবশ্য বনহুর পূর্বেই নূরীকে এমনি একটা অবস্থার জন্য প্রস্তুত করেই নিয়ে এসেছিলো। বলেছিলো বনহুর—নূরী, মনিরা আজও তোমার আসল পরিচয় জানে না। কাজেই তোমাকে অনেক ঝুঁকি সামলাতে হবে। যদি মনিকে চাও তবে মেনে নিতে হবে এই সমস্যাময় জীবন। পারবে তুমি নিজের আত্মপরিচয় গোপন করে থাকতে?

বলেছিলো নূরী—তোমার জন্য আমি সব পারবো। আর পারবো আমার মনির জন্য।

নূরীর মনে এখন মনি র চিন্তা, কাজেই মনিরা ও অন্যান্য সকলের কথা কানে না নিয়ে এক কথায় রাজি হলো—সে সব কাজ করতে পারবে।

কান্দাই ফিরে যাওয়ার দিন ধার্য হয়ে গেল।

মনিরা এক সময় স্বামীকে নিভৃতে পেয়ে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো—তুমি এতোবড় নির্মম প্রাণহীন। কি করে ভুলে ছিলে এতোদিন?

শয্যায় অর্ধশায়িত অবস্থায় বসেছিলো বনহুর, মনিরার হাতখানা তার হাতের মুঠায়, একটু হেসে বললো—এটাতো নতুন কিছু নয় মনিরা। তুমি জানো, আমি সাধারণ মানুষের নিয়মের বাইরে। কিন্তু এটুকু মনে রেখো, কোনো সময় ভুলিনি তোমায়।

আমি জানি, তুমি এ কথাই বলবে। সব সময় যদি আমার কথা তোমার স্মরণ হবে তাহলে এতোদিন কিছুতেই দূরে থাকতে পারতে না।

তুমি বুঝবে না মনিরা, আমাকে কিভাবে প্রতি মুহূর্ত সংগ্রাম চালাতে হয়েছে। জীবন নিয়ে ফিরে এসেছি—এ আমার সৌভাগ্য। নাহলে আর কোনোদিন হয়তো তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটার সম্ভাবনা ছিলো না।

মনিরা স্বামীর বুকে মুখ গুঁজে বলে— না না, ও সব কথা বলো না। আমার বুক কেঁপে উঠে। ওগো, তুমি যে আমার জীবনের একমাত্র সম্পদ।

মনিরা! অবেগভরা কণ্ঠস্বর বনহুরের।

মনিরা অশ্রু ছলছল আঁখি দুটি তুলে ধরে বনহুরের মুখে।

বনহুর ধৈর্যহারা হয়ে পড়ে, মনিরাকে নিবিড়ভাবে বুকে টেনে নিয়ে অশ্রুসিক্ত গণ্ডে এঁকে দেয় চুম্বনরেখা। তার চোখেও পানি। মনিরার অশ্রুর সঙ্গে বনহুরের চোখের পানি এক হয়ে যায়। এতোদিন পর স্বামী-স্ত্রীর মধুর মিলন অপূর্ব এক মোহময় পরিবেশের সৃষ্টি করে।

স্বামীর বুকে মাথা রেখে মনিরা শুনে যায় বনহুরের সব কথা। সেই অজানা জঙ্গলে জংলীরাণীর কথা, সেই রত্ন-গুহার কথা। তারপর জংলীরাণীর পুনঃ আক্রমণ। কিভাবে মৃত্যু ঘটেছিলো, কথাটা বলতে গলা ধরে আসে বনহুরের। তারপর কাঠের ভেলায় দিনের পর দিন রাতের পর রাত কাটানো। পরে জাহাজ 'পর্যটন' তাদের কিভাবে উদ্ধার করলো। জাহাজ 'পর্যটনে' এসে নতুন জীবন লাভ করলো বনহুর আর তার সঙ্গী কেশব। নীহারের কথাও বলতে ভুললো না সে। মেয়েটি সরল-সহজ উদারমনা, সে যে কখন তাকে গভীরভাবে ভালবেসে ফেলেছিলো বুঝতে না পারলেও অল্প দিন পরেই অনুমান করে নিয়েছিলো। ওকে খুশি করবার জন্য যতটুকু পারে ভালবাসা দিতেও সে কসুর করেনি—একথাও খোলাসা বললো বনহুর মনিরার কাছে।

মনিরার মুখ থমথমে হলো সে কথায়।

বনহুর মনিরার চিবুকে মৃদু চাপা দিয়ে বললো—সব তো উজাড় করে দেইনি! তোমার জন্য প্রচুর আছে।

এমনি নানা মান-অভিমানের মধ্যে দিয়ে কেটে গেলো কয়েকটি দিন।

আগামী কাল তাদের কান্দাই রওয়ানা দেবার তারিখ।

বনহুর সেদিন মনিরাসহ বাইরে থেকে ফিরছিলো, গাড়িখানা রেখে যেমন তারা হলঘরে প্রবেশ করতে যাবে, অমনি শুনতে পেলো বনহুর একটা পরিচিত গলার স্বর। থমকে দাঁড়িয়ে মনিরার হাতখানা মুঠায় চেপে ধরলো, ঠোঁটের উপর আংগুল চাপা দিয়ে তাকে চুপ থাকতে বললো।

হলঘরের মধ্য হতে শোনা গেলো পরিচালক আসলাম আলীর উৎকণ্ঠা—ভরা গম্ভীর কণ্ঠস্বর—হাঁ স্যার, তার নাম খান বাহাদুর শামস ইরানী।

ফটো আছে?

হাঁ আছে, মহরতের সময় উঠানো হয়েছিলো।

দেখি!

এই দেখুন স্যার।

কিছুক্ষণ কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না, মনে হলো কক্ষ মধ্যে ফটো দেখা নিয়ে ব্যস্ত আছেন হাশেম চৌধুরী। একটু পর পর শোনা গেলো হাশেম চৌধুরীর গলা—বয়স্ক লোক।

হাঁ স্যার, বয়স পঞ্চাশের উপর হবে।

ভদ্রলোকের ছবির নাম কি বললেন?

'আলেয়ার আলো'।

হাসির শব্দ হলো হাশেম সাহেবের কণ্ঠে—আলেয়ার আলোই বটে।

মনিরা ফিস ফিস করে বললো—কোনো কেস ব্যাপারে লোক এসেছে, চলো আমরা ওদিকের পথ দিয়ে ভিতরে যাই।

তুমি যাও, কেসটা বড় রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে---

তা ভিতরে গিয়ে বসে বসেই শোন গে।

সর্বনাশ, তাহলে তোমার স্বামীকে আবার হারাতে হবে।

কি বলছো তুমি?

হাঁ, বোম্বে থেকে পালিয়ে এসেছি দিল্লী, আর ঐ খান বাহাদুর শামস ইরানীও অন্য কেহ নয়—আমি।

তুমি?

হাঁ।

তুমি 'আলেয়ার আলো' ছবি---

এখন মনোযোগ সহকারে শোন পরে সব বলবো, বুঝলে? এখন চুপ করে শোন---বনহুর আর মনিরার কথাবার্তা অত্যন্ত নিম্নস্বরে হচ্ছিলো, কাজেই কক্ষমধ্যে কেউ শুনতে পায়নি।

কান পাতলো বনহুর, শোনা যাচ্ছে আলী সাহেব বলছেন—খান বাহাদুর শামস ইরানীকে দেখে আমি এতোটুকু অবিশ্বাস করতে পারিনি। অতি মহৎ ব্যক্তি বলেই মনে করেছিলাম, কারণ তাঁর ব্যবহার অত্যন্ত প্রীতিজনক

ছিলো। ছবি ব্যাপারে তার বিপুল আগ্রহ দেখে আমি অগ্রসর হই, তিনিও টাকা পয়সার ব্যাপারে কোনোরকম কার্পণ্য করেননি। এমনকি ছবি তৈরি করবার পূর্বেই তিনি আমাকে আমার পারিশ্রমিকের সম্পূর্ণ টাকা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। আমি জানতাম না তার মনে এ রকম একটা উদ্দেশ্য ছিলো। এমন কি ফুলাগু হোটেলেও তাঁর সব জিনিসপত্র তেমনি সাজানো পড়ে আছে।

হাশেম চৌধুরীর গলা—এমনও তো হতে পারে, ধরুন খান বাহাদুর শামস ইরানী তার ছবির নায়িকা শশীকে নিয়ে বোম্বেরই কোনো হোটেলে গিয়ে ফুর্তি চালাচ্ছেন?

আমরাও প্রথমে ঐ রকম সন্দেহ করেছিলাম এবং বোম্বে পুলিশ অফিসে সেইভাবেই ডায়রী দিয়েছিলাম। কিন্তু পুলিশ মহল বোম্বে শহর তচনচ্ করেও খান বাহাদুর শামস ইরানী বা শশীরাণীর কোনো হদিস পাননি। শেষে বোম্বে পুলিশ এরোড্রাম থেকে একখানা গাড়ি উদ্ধার করে এবং প্লেনের রিপোর্ট অনুযায়ী বোঝা যায়, সেই গাড়িখানাই ছিলো শামস ইরানীর।

পুলিশ আমাকে জানায়, শশীকে নিয়ে শামস ইরানী দিল্লীর পথে গা ভাসিয়েছে। যখন আমি এ সংবাদ পাই তখন দুটো দিন কেটে গেছে। যদিও প্রচুর বিলম্ব ঘটে গেছে,তবু আমি নিরাশ না হয়ে দিল্লী এসেছি। স্যার, কেসটা পুলিশে দেওয়ার পূর্বে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চাই।

হাঁ, ঠিক বলেছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, সেই খান বাহাদুর শামস ইরানী শশীকে নিয়ে এতোদিন নিশ্চিন্ত মনে দিল্লী বসে নাই। সে দিল্লী ত্যাগ করে ভেগেছে। তবু আমরা আপনার কেসটা গ্রহণ করবো এবং খানা তল্লাসী চালাবো।

স্যার, আমি আপনাদের সাহায্য কামনা করি।

বনহুর এরপর আর দাঁড়ালো না, মনিরাসহ ওদিকের দরজা দিয়ে চলে গেলো ভিতরে।

মনিরাকে সব বললো বনহুর—ঐ আসলাম আলীই হলেন আমার ছবির পরিচালক আর খান বাহাদুর শামস ইরানী অন্য কেউ নয়, আমি এবং শশী হলো সাপুড়ে কন্যা ফুল।

❑

হাশেম চৌধুরী আসলাম আলীর কেসটা গ্রহণ করলেন এবং হুশিয়ারীর সঙ্গে দিল্লী শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে অনুসন্ধান চালালেন। খান বাহাদুর শামস

ইরানীর ফটো দিল্লীর সংবাদ পত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় বড় অক্ষরে ছাপা হলো। শহরময় ছড়িয়ে পড়লো সি, আই, ডি, পুলিশ।

সেদিন বনহুরের বিদায় অভিনন্দনের পালা।

পুলিশ সুপার হাশেম চৌধুরী পত্রিকাখানা হাতে বনহুরের পাশে এসে দাঁড়ালেন।

বনহুর, মনিরা, নূরী, কেশব আর ফুলমিয়া দিল্লী শহর ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিয়েছে, হাশেম চৌধুরী পত্রিকাখানা মেলে ধরলেন বনহুরের সামনে—এই ছবিটা দেখুন, হঠাৎ যদি আপনাদের দৃষ্টিপথে পড়ে যায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের সহায়তায় তাকে গ্রেপ্তার করে ফেলবেন। আসলাম আলী দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন।

বনহুর পত্রিকাখানা হাতে নিয়ে দেখলো, এটা খান বাহাদুর শামস ইরানী-বেশে তারই ফটো, মনে মনে হাসলো বনহুর, বললো—নিশ্চয়ই আপনার কথা স্মরণ থাকবে মিঃ হাশেম।

ওদিকে প্লেন ছাড়ার সময় হয়ে এসেছে। যাত্রিগণ সবাই প্লেনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বনহুর মনিরা, নূরী আর কেশব, ফুলমিয়াকে নিয়ে প্লেনের দিকে এগুলো। বিদায়কালে মনিরা তো মাসুমার গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদেই ফেললো।

নূরীর কিন্তু জড়োসড়ো সঙ্কোচিত ভাব, মনিরার আদেশের প্রতীক্ষায় সদা যেন তটস্থ রয়েছে সে। কিসে মনিরা খুশি হবে, এই যেন তার মনের ইচ্ছা। অবশ্য বনহুর তাকে এইভাবে আত্মপরিচয় গোপন রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলো, কারণ মনিরা যেন জানতে না পারে তার সঙ্গে ওর কোনো সম্বন্ধ আছে। মানে বনহুর আর নূরী যেন সম্পূর্ণ আলাদা জন।

হাশেম চৌধুরী আর মাসুমার কাছে বিদায় নিয়ে কান্দাই এর পথে রওয়ানা দিলো বনহুর তার দুই সঙ্গিনী আর বন্ধুদ্বয় নিয়ে। বিদায়কালে মনিরা মাসুমার গলা জড়িয়ে ধরে অশ্রু বিসর্জন করলো।

সম্পূর্ণ দিনটা কাটলো তাদের প্লেনে, সন্ধ্যায় কান্দাই এরোড্রামে পৌছে গেলো তারা। মনিরার আনন্দ যেন ধরছে না, খুশিতে আপ্লুত সে। কতদিন পর ফিরে এলো স্বদেশে। সবচেয়ে মনিরার বড় আনন্দ—স্বামীকে সে সঙ্গে পেয়েছে। এ যেন তার জীবনে এক পরম সৌভাগ্যের কথা।

হঠাৎ স্বামীকে সঙ্গে করে মামীমা আর নূরকে অবাক করে দেবে মনিরা। বহুদিন পর পুত্রকে পেয়ে মামীমার আনন্দ আর ধরবে না। নূরও খুশি হবে তার বাপকে পেয়ে।

কিন্তু সব আশা মনিরার বিফল হলো ট্যাক্সিতে মনিরা আর নূরীকে তুলে দিয়ে বললো বনহুর—তোমরা বাড়িতে যাও মনিরা।

অবাক কণ্ঠে বলে উঠে মনিরা—আর তুমি?
আমি আমার আস্তানায় যাবো।
তা হবে না, তোমাকে আমি ছেড়ে দেবো না। মনিরা স্বামীর টাইটা এঁটে ধরে ফেলে।
হেসে বলে বনহুর—জানো না মনিরা, আমার যাওয়া এখন কিছুতেই সম্ভব নয়।
কেন? বললো মনিরা।
আজ নয় পরে বলবো! বললো বনহুর।
মনিরা আর নূরীর সঙ্গে ফুলমিয়াকেও দিয়ে দিলো, ড্রাইভারকে বলে দিলো চৌধুরী বাড়ির ঠিকানা।
মনিরা গম্ভীর হয়ে পড়লো, সে জানে—স্বামীকে সে আজ কিছুতেই বাধ্যে আনতে সক্ষম হবে না, কাজেই বনহুরের টাই ছেড়ে দিয়ে বললো—ঠিক কবে আসবে বলো?
নূরীও প্রশ্ন-ভরা উন্মুখ হৃদয় নিয়েই তাকিয়েছিলো বনহুরের মুখের দিকে। বনহুর তাকালো নূরীর দিকে, দু'জনার দৃষ্টি বিনিময় হলো, বললো বনহুর—যেদিন স্মরণ করবে সেদিনই হাজির হবো।
বনহুর গাড়ি ছাড়বার জন্য ড্রাইভারকে আদেশ দিলো।
গাড়িতে ষ্টার্ট দিলো ড্রাইভার।
মনিরার হাতের মুঠা থেকে খসে এলো বনহুরের হাতখানা। অশ্রুসিক্ত নয়নে তাকিয়ে রইলো মনিরা।
তখন নূরীর চোখ দুটোও শুষ্ক ছিলো না, নিজকে সংযত করে নিয়ে মুখ ফিরিয়ে বসে রইলো সে।
ড্রাইভারের পাশের আসনে বসেছিল ফুলমিয়া।
মনিরা রুমালে চোখ মুছলো। কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে বললো মনিরা—ফুল, তোর কেউ নেই।
না আপামনি, আমার কেউ নেই।
চিরদিন থাকবি আমার কাছে?
যদি রাখেন থাকবো না কেন?
তোর ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই?
থাকলে আর আসি আপনাদের সঙ্গে! এখন আপনারাই আমার সব।
ফুল?
বলুন আপামনি?
না থাক, পরে বলবো।

বাসায় পৌঁছে মনিরা মামীমাকে সব খুলে বললো। ফুল আর ফুলমিয়ার সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিলো মরিয়ম বেগমের। প্রথম নজরেই ফুলকে বড় ভাল লাগলো মরিয়ম বেগমের।

মরিয়ম বেগম নূরীর মাথায় হাত বুলায়ে স্নেহভরা কণ্ঠে বললেন—আহা বেচারী কি নাম মা তোমার?

নূরীর কাছেও বড় ভাল লাগলো মরিয়ম বেগমকে। ছোট বেলায় সে মাকে হারিয়েছে, মায়ের স্নেহ সে পায়নি কোনোদিন। নূরী মরিয়ম বেগমের মধ্যে তার বহুদিন পূর্বে হারানো মাকে যেন খুঁজে পেলো। হঠাৎ আপন মনেই কদমবুসি করলো নূরী তাঁর।

ফুলমিয়াও মরিয়ম বেগমকে কদমবুসি করলো।

মরিয়ম বেগম ফুলমিয়াকে বৃদ্ধা সরকার সাহেবের হাতে তুলে দিলেন, কারণ এমনি একটি লোকের তাদের প্রয়োজন ছিলো। সরকার সাহেবের দক্ষিণ হস্ত আকারে সর্বক্ষণের জন্য থাকবে সে তাঁর পাশে।

ফুলমিয়াকে পেয়ে সরকার সাহেব খুশি হলেন।

চৌধুরী বাড়িতে আশ্রয় পেলো ফুলমিয়া। নতুন জায়গায় নতুন পরিবেশ হলেও ভালই লাগলো ওর চৌধুরী বাড়িটা। ফুলমিয়ার বড় আশা—বাবুকে সে একদিন না একদিন পাবেই।

অনেকদিন পর নূর মাকে পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার বুকে।

মনিরা পুত্র নূরকে কোলে তুলে নিয়ে চুমোয় চুমোয় গণ্ড রাঙা করে দিলো।

মনিরা যখন নূরকে নিয়ে আনন্দে আত্মহারা তখন নূরী অদূরে দাঁড়িয়ে পুলকিত নয়নে দেখছিলো, ইচ্ছে হচ্ছিলো ওর, ছুটে গিয়ে নূরকে বুকে চেপে ধরে কিন্তু পারছিলো না। নূরী অতি কষ্টে নিজকে সংযত রেখে তাকিয়ে ছিলো। বুকটা যেন হাহাকার করে উঠছিলো তার। সেদিনের মনি আজ বড় হয়েছে কি সুন্দর কথা বলতে শিখেছে? ঐ তো চিবুকের পাশে তিলটা যদিও একটু উপরে উঠে গেছে কিন্তু তেমনি আছে। নূরীর বুক ভরে উঠে যেন।

নূরী যদিও তার বাপিকে এখন প্রায় ভুলে এসেছে তবু মাঝে মাঝে দাদীমার কাছে শোনে তার বাপির কথা, তাই মাকে প্রশ্ন করে বসলো নূর—আম্মি, বাপি কোথায়? আমার বাপি এলো না?

মনিরা বললো—তোমার বাপি আসবে বাবা। তুমি কিছু ভেবো না আসবে।

কবে আসবে?

যেদিন তুমি ডাকবে।

আমি যখন ডাকবো তখনই আসবে বাপি?

হাঁ বাবা।
এক্ষুণি যদি ডাকি?
আজ নয়, পরে ডেকো।
এগিয়ে আসে নূরী—এসো, আমার কোলে এসো নূর।
মনিরা বলে—যাও, ওর কাছে যাও বাবা।
ও কে আম্মি? মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলে নূর।
মনিরা হেসে বলে—ওর নাম ফুল।
ফুল?
হাঁ, আমার নাম ফুল! এসো---কথাটা বলে হাত পাতে নূরী।
মনিরা বলে—যাও বাবা, ওর কোলে যাও, অনেক ফুল ও তোমায় দেবে।
হাসে মনিরা, নূরও হাসে আর হাসে নূরী।
এমনি করে নূরীর সঙ্গে সম্বন্ধ গড়ে উঠে নূরের।

এদিকে যখন চৌধুরী বাড়িতে আনন্দস্রোত বয়ে চলেছে তখন কান্দাই জঙ্গলে দস্যু বনহুরের আস্তানায় সর্দার ফিরে আসায় মহা উৎসব শুরু হয়েছে।

রহমান আয়োজন করেছে এ উৎসবের।

বনহুরের দেহে এখন সম্পূর্ণ জমকালো ড্রেস। মাথায় পাগড়ী কোমরে বেল্টে গুলী-ভরা পিস্তল। সুউচ্চ আসনে বসেছে বনহুর, তার পাশেই দন্ডায়মান রহমান—তার দেহেও দস্যুড্রেস। অন্যান্য অনুচর সবাই দন্ডায়মান চারপাশে। রাত এখন কম নয়। কেশব ঘুমিয়ে পড়েছিলো, হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায় তার। কখন যে কেশব কক্ষ ত্যাগ করে দরবার কক্ষের অদূরে এসে দাঁড়িয়েছিলো অবাক হয়ে দেখছিলো সব।

একজন অনুচর কেশবকে দেখে ফেলে, তখনই ধরে আনে ওকে দরবারকক্ষের মধ্যে।

অনুচরটি কেশবকে দেখেনি বা চিনতো না, কেশবকে ধরে ভিতরে নিয়ে আসে—সর্দার, এই লোকটা দরবারকক্ষের বাইরে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি মারছিলো।

বনহুর তাকালো সম্মুখে, কেশবকে দেখে ব্যাপারটা উপলব্ধি করে নিলো, বুঝতে পারলো—কেশব তাদের কার্যকলাপে অবাক হয়েছে। যদিও নূরীর কাছে কেশব বনহুর সম্বন্ধে পূর্ব হতেই অবগত হয়েছিলো তবুও চাক্ষুস এসব দর্শনে আশ্চর্য না হয়ে সে পারে না।

বনহুরের দিকে তাকায় কেশব, দু'চোখে তার অসহায় দৃষ্টি। না জানি এই মুহূর্তে বাবু তার উপর কেমন ব্যবহার করবে কে জানে। এ ড্রেসে সে

বাবুকে কোনোদিন দেখেনি। অদ্ভুত লাগছে বাবুকে,তাই বিস্ময়-ভরা অবাক চোখে তাকিয়ে আছে কেশব তার বাবুর দিকে।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বললো—ছেড়ে দাও ওকে! ও আমাদেরই একজন।

অনুচরটি মুক্ত করে দিলো কেশবকে।

কেশব এবার বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালো, মনোভাব—দেখলে তো ধরে এনে কি ফল হলো।

বনহুর বললো—কেশব এখন যাও।

অনুচরটি বনহুরকে কুর্ণিশ জানিয়ে কেশবকে লক্ষ্য করে বললো—এসো।

কেশব একবার বনহুরের দিকে তাকিয়ে অনুচরটির সঙ্গে দরবারকক্ষ ত্যাগ করলো।

উঠে দাঁড়ালো বনহুর, তারপর অনুচরগণকে লক্ষ্য করে স্থির কণ্ঠে বললো—বহুদিন আমি আস্তানা ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলাম। আমার অনুপস্থিতিতেও তোমরা যে অতি সুন্দর এবং সুষ্ঠুভাবে আস্তানার কাজ সমাধা করেছো এজন্য আমি অত্যন্ত আনন্দ বোধ করছি। রহমান এবং কায়েস, তোমরা আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ করো।

রহমান আর কায়েস নত মস্তকে বনহুরকে অভিনন্দন জানালো।

দরবারকক্ষে যখন আনন্দস্রোত বয়ে চলেছে, সেই মুহূর্তে দরবার কক্ষের বাইরে শোনা গেলো দ্রুত অশ্ব-পদশব্দ। পরক্ষণেই দরবারকক্ষে প্রবেশ করলো বনহুরের বিশ্বস্ত অনুচর কাওসার। দরবারকক্ষে প্রবেশ করেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো সে দরবারকক্ষের মেঝেতে।

দরবারকক্ষের সবাই বিস্ময়ে চমকে উঠলো, সবাই দেখলো—কাওসারের পিঠে সুতীক্ষ্ণধার একখানা ছোরা গাঁথা আছে। অন্যান্য অনুচরের মধ্যে কেউ এগিয়ে আসবার পূর্বেই বনহুর নেমে এসে কাওসারের পিঠ থেকে ছোরাখানা তুলে নিলো।

রহমান এবং কায়েসও দ্রুত এসে হাঁটু গেড়ে বসলো কাওসারের পাশে। সকলের মুখেই আতঙ্ক আর উদ্বিগ্নতার ছাপ ফুটে উঠলো।

অন্যান্য অনুচরের মুখ ভয়ঙ্কর আর কঠিন হয়ে উঠেছে। সবাই যেন সাংঘাতিক কোনো এক অবস্থার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিলো।

বনহুর ছোরাখানা কাওসারের পিঠে থেকে তুলে নিয়ে বললো—কাওসার, কে তোমার এ অবস্থা করেছে?

কাওসার বহুদিন পর সর্দারকে দেখতে পেলো, মৃত্যু-যন্ত্রণা ভুলে গেলো সে, মুহূর্তের জন্য চোখ দুটো চক্‌চক্ করে উঠলো, অতি কষ্টে বললো—সর্দার---

বলো কাওসার, তোমার এ অবস্থা কেন?

---সর্দার---মঙ্গল ডাকু---আমাকে ধরে----নিয়ে গিয়েছিলো ঝাঁম---শ--হ--র-- আমি---পালি--য়ে---আর বলতে পারলো না, কাওসারের মাথাটা কাৎ হয়ে গড়িয়ে পড়লো বনহুরের হাতের উপর।

বনহুর কাওসারের মাথাটা নামিয়ে রাখলো ভূতলে। চোখ দুটি তার জ্বলে উঠলো আগুনের গোলার মত। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললো—রহমান, কে এই মঙ্গলা ডাকু?

সর্দার এখনও আপনাকে একটা কথা বলা হয়নি। কিছুদিন হলো কান্দাই-এর বাইরে ঝাঁম অঞ্চলে একজন ডাকুর আবির্ভাব ঘটেছে। অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সাংঘাতিক নরহন্তা এই ডাকু। শুধু ঝাঁম শহরে বা ঐ অঞ্চলে নয়, কান্দাই-এর বুকেও অনেক কুৎসিত কাজ সে সম্পন্ন করে চলেছে। নরহত্যা তার নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রহমান বলে চলেছে, স্তব্ধ নিশ্বাসে শুনছে বনহুর, দক্ষিণ হস্তখানা ধীরে ধীরে মুষ্ঠিবদ্ধ হয়ে আসছে তার।

সর্দার, শয়তান মঙ্গল ডাকুর কার্যকলাপে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলাম আমরা। এজন্য তার সঙ্গে আমাদের কয়েকবার লড়াই হয়েছে, কয়েকজন অনুচর জীবনও দিয়েছে। কিন্তু আমরা তাকে আজও গ্রেপ্তার করতে পারিনি বা তার আড্ডার সন্ধান পাইনি। সর্দার, ঝাঁম শহর থেকে কান্দাই পুলিশ বাহিনী হন্তদন্ত হয়ে পড়েছে কিন্তু কিছুই করতে পারেনি কেউ----

কাওসারের ঘটনা কি তাই বলো রহমান? বললো বনহুর।

রহমান কাওসারের মৃতদেহটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে মনের উচ্ছ্বসিত বেদনাকে চেপে নিয়ে বললো—কাওসারসহ আমরা কয়েকজন মিলে একদিন মঙ্গল ডাকুকে আক্রমণ করেছিলাম। ওদের দলের সঙ্গে আমাদের লড়াই হয়, এ লড়াই-এ উভয় পক্ষেরই লোকজন নিহত হয় আর আহত হয়। বন্দীও হয় আমাদের দু'জন—একজন কাওসার অন্যজন মাহবুব।

এ তুমি কি বলছো রহমান।

হাঁ সর্দার।

মঙ্গল ডাকুর হস্তে আমাদের লোক বন্দী হলো আর তোমরা নিশ্চিন্তে বসে আছো বা ছিলে?

সর্দার, নিশ্চিন্ত আমরা ছিলাম না, অহরহঃ আমাদের লোক এই মঙ্গল ডাকুকে সন্ধান করে ফিরছে।

এতেই তুমি নিশ্চিন্ত আছো রহমান?

না সর্দার, আমি নিজেও প্রতিদিন এই নরহত্যাকারী দস্যু এবং তার আড্ডার অনুসন্ধান করে ফিরছি।

আশ্চর্য! এমন একটা নিদারুণ সংবাদকে তোমরা গোপন রেখে আমাকে নিয়ে তোমরা আনন্দে মেতে উঠেছিলে?

সর্দার, আপনার আবির্ভাবে আমরা ভুলে গিয়েছিলাম সব কিছু। এমন কি আনন্দের আতিশয্যে ভুলে গিয়েছিলাম নিজেদের অস্তিত্ব।

রহমান, আর মুহূর্ত বিলম্ব করা উচিত নয়। কাওসারের মৃত্যুর প্রতিশোধ আমি তিল তিল করে নেবো। এক্ষুণি তাজকে প্রস্তুত করো এবং তুমিও আমার সঙ্গে চলো।

সর্দার।

হাঁ, এক্ষুণি আমি রওয়ানা দেবো।

কিন্তু মঙ্গল ডাকুকে এখন কোথায় পাবেন সর্দার? সে অত্যন্ত ধূর্ত আর শয়তান।

রহমান, আমার চেয়ে ধূর্ত আর শয়তান সে বেশি নয়। ঝাঁম শহরে না গেলে তার সন্ধান পাওয়া যাবে না। যাও, তাজ এবং দুলকীকে প্রস্তুত করে নিয়ে এসো। আর কাওসারের মৃতদেহের সৎকাজের ব্যবস্থা করতে বলো।

বনহুর দরবারকক্ষ ত্যাগ করে বেরিয়ে আসে।

বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করে পিস্তল এবং গুলীর ব্যাগটা তুলে নিলো হাতে। কোমরের বেল্টের সঙ্গে সেগুলোকে সংবদ্ধ করে বেরিয়ে এলো। রহমান, কায়েস এবং আরও কয়েকজন অনুচর আস্তানার বাইরে তাজ আর দুলকীকে নিয়ে অপেক্ষা করছিলো।

বনহুর তাজের পিঠে চেপে বসতেই রহমান উঠে বসলো দুলকীর পিঠে।

উল্কাবেগে ছুটতে শুরু করলো তাজ। পশু হলেও তার মনোভাবে প্রকাশ পেলো অফুরন্ত আনন্দ—কতদিন পর আজ সে প্রভুকে নিজের পিঠে পেয়েছে।

তাজের পিছনেই ছুটছে দুলকী।

বন-জঙ্গল ভেদ করে বেগে চলেছে, ঝাঁম অভিমুখে চলেছে বনহুর আর রহমান। উভয়ের শরীরেই জমকালো ড্রেস।

কান্দাই জঙ্গল ত্যাগ করে তীরবেগে অগ্রসর হচ্ছে। রাত এখন গভীর। নির্জন পথ ধরে ছুটে চলেছে, পথে কোনো জন-মানবের চিহ্ন নেই।

কান্দাই জঙ্গল অতিক্রম করে তারা বহুদূর এসে গেছে। সারথী, তারপর বাসুদেবপুর, তারপর ঝাঁম শহর। নির্জন প্রান্তর অতিক্রম করে তারা এগুচ্ছে। এখন ওরা সারথী জঙ্গলের পাশ কেটে চলছিলো।

হঠাৎ রহমান উচ্চকণ্ঠে বলে উঠে—সর্দার, ঐ দেখুন।

বনহুর তাজের গতি কমিয়ে দিলো।

রহমানও দুলকি নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো স্থির হয়ে।

বনহুর আর রহমান সম্মুখে তাকিয়ে দেখলো, দূরে—বহু দূরে জঙ্গলের মধ্যে অনেকগুলো আলো দেখা যাচ্ছে। আলোগুলো যে জ্বলন্ত মশাল, স্পষ্ট বুঝতে পারলো তারা।

রহমান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে বললো—সর্দার, নিশ্চয়ই মঙ্গল ডাকুর দল, কোথাও হানা দিয়ে লুটতরাজ করে ফিরে যাচ্ছে।

হুঁ, সেরকমই হবে। রহমান, আমি এই মঙ্গল ডাকুকে অনুসরণ করবো।

সর্দার, ওদের দলে বহু লোক আছে।

রহমান, তাজ আর দুলকীর গতি লঘু করে নিয়ে সন্তর্পণে এগুতে হবে।

হাঁ সর্দার।

এবার বনহুর আর রহমান অশ্ব ধীরভাবে চালনা করে মশালের আলো অভিমুখে চলতে লাগলো।

রহমান বললো—সর্দার, মঙ্গল ডাকু আজকাল প্রতি রাতেই এভাবে লুটতরাজ করে চলেছে।

তোমরা বাধা দিয়ে কৃতকার্য হওনি!

হাঁ সর্দার, অত্যন্ত দুর্ধর্ষ এই ডাকু।

সেই কারণেই আজ আমারও আগমন! আর শোন রহমান মঙ্গল ডাকু আজ লুটতরাজে বের হয়নি, তারা জ্বলন্ত মশাল নিয়ে বন-জঙ্গলে কিছু অন্বেষণ করে ফিরছে।

সর্দার, এ অনুমান আপনার কি করে হলো?

দেখছো না মশালের আলোগুলো কেমন বিক্ষিপ্ত এবং ছড়ানো, মনে হচ্ছে মশালের আলোতে তারা কোনো বস্তুর সন্ধান করে ফিরছে।

ঠিক বলেছেন সর্দার।

মঙ্গল ডাকুও তার দলবল যে কাওসারকেই অনুসন্ধান করছে সে বিষয়ে কোন ভুল নেই। ঐ দেখো, এখন ওরা অনেক নিকটে এসে গেছে।

সর্দার, আমাদের অশ্ব নিয়ে এভাবে অগ্রসর হওয়া উচিত হবে না।

হাঁ, ঠিক বলেছো রহমান, ওরা যেভাবে সন্ধান চালিয়ে এগুচ্ছে তাতে আমরা অল্পক্ষণেই ওদের নজরে পড়ে যাবো। এক কাজ করো, তাজ আর দুলকীকে নিয়ে ঐ যে উঁচু টিলাটা দেখা যাচ্ছে ওখানে তুমি চলে যাও।

আর আপনি?

আমার জন্য ভেবো না রহমান, আমি কোনো গাছে আত্মগোপন করে দেখতে চাই—এই মঙ্গল ডাকু কে এবং কি করম। তুমি মোটেই বিলম্ব করো না যাও।

রহমান তাজ আর দুলকীকে নিয়ে চলে গেলো।

বনহুর পাশের একটা গাছের উপর মাঝডালে বসে রইলো, তীক্ষ্ণ নজরে তাকিয়ে দেখতে লাগলো—মশালগুলো দ্রুত এদিকেই এগিয়ে আসছে।

অল্পক্ষণেই বনহুরের নজরে পড়লো, কেমন যেন অদ্ভুত ড্রেস পরিহিত ভয়ঙ্কর চেহারার লোক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মশাল হস্তে বন-জঙ্গল অতিক্রম করে এগুচ্ছে।

মশালের আলোতে সব স্পষ্ট দেখতে পেলো বনহুর, দলের অগ্রভাগে দু'জন বলিষ্ঠকায় লোক, তাদের হস্তেও মশাল এবং বল্লম। লোকগুলো দেখতে ঠিক সাক্ষাৎ যমের মত ভয়ঙ্কর।

বনহুর বুঝতে পারলো, এরা কিছু অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে। মশাল উঁচু করে দেখছে এদিক সেদিক এবং নিজেদের মধ্যে কিছু বলাবলি করছে। বনহুরের কানে গেলো একটা কর্কশ কঠিন কণ্ঠস্বর—বেটা মরলে লাশটা তো পড়ে থাকবে?

হাঁ ঠিক বলেছো জয়সিং মরলে লাশটা পাওয়া যেতো।

ঘোড়াটাই বা গেলো কোথায়? লাশটা না হয় বাঘভল্লুক খেয়ে ফেলেছে।

তাইতো, ঘোড়াও যে দেখছিনা কোথাও! বললো জয়সিং।

বনহুর ভালভাবে কান পেতে শুনলো—বিপরীত জনের নাম রঘুনাথ। এ দু'জনার মধ্যেই একজনকে বনহুর মঙ্গল ডাকু মনে করেছিলো কিন্তু এখন বুঝতে পারলো মঙ্গল ডাকু স্বয়ং এদের মধ্যে নেই। এরা সবাই মঙ্গল ডাকুর অনুচর। বনহুর তার বিশ্বস্ত অনুচর কাওসারের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য উন্মাদ হয়ে উঠলো। দলকে কাবু করতে পারলেই দলপতিকে পাকড়াও সম্ভব হবে। মঙ্গল ডাকুর অনুচরগণ কাওসারের মৃতদেহ খুঁজতে খুঁজতে এগিয়ে চলেছে। বনহুরের পিস্তল গর্জে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ করে উঠলো সম্মুখে এগিয়ে চলা মশালধারীদের একজন, তৎক্ষণাৎ মুখ থুবড়ে লুটিয়ে পড়লো ভূতলে।

এক অদ্ভুত কান্ড ঘটলো মুহূর্তে। সমস্ত মশাল পট পট করে ঝোপ আর আগাছার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিলো, তারপর যে যেদিকে পারলো ছুটে পালাতে লাগলো।

বনহুর বুঝতে পারলো ওরা আচমকা গুলীর আওয়াজে অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেছে। বিশেষ করে গভীর রাতে গহন জঙ্গলে পিস্তলের শব্দ এলো কোথা হতে। পলাতক কাওসারের নিকটে তো কোনো পিস্তল বা রিভলভার ছিলো না।

বনহুর আরও দুজনকে ভূতলশায়ী করে ফেললো। তারপর দ্রুত বৃক্ষ থেকে নেমে এলো নীচে। একজন উঠিপড়ি করে পালাতে যাচ্ছিলো, বনহুর পিস্তল উদ্যত করে ধরলো—খবরদার পালাতে চেষ্টা করলেই মরবে।

বনহুরের কঠিন কণ্ঠস্বরে এবং তার জমকালো ড্রেস দেখে ভড়কে গিয়েছিলো ডাকুটা, হাত তুলে দাঁড়ালো।

বনহুর পকেট থেকে একটা বাঁশী বের করে ফুঁ দিলো সঙ্গে সঙ্গে রহমান তাজ এবং দুলকীকে নিয়ে হাজির হলো সেখানে।

বনহুর আদেশ দিলো—একে বেঁধে নিয়ে চলো রহমান।

রহমান তৎক্ষণাৎ বন থেকে কতকগুলো লতাপাতার দ্বারা মজবুত দড়ি তৈরি করে ফেললো, তাই দিয়ে বেঁধে ফেললো ডাকুটাকে।

লোকটা যে অত্যন্ত শক্তিশালী বলিষ্ঠ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যেমন ভয়ঙ্কর চেহারা তেমনি বিরাট দেহ। বনহুর নিজের অশ্বের পিছনে উঠিয়ে নিলো ওকে পিছমোড়া করে বেঁধে।

বনহুর ও রহমান মঙ্গল ডাকুর একজনকে বন্দী করে নিয়ে ফিরে এলো আস্তানায়।

আস্তানায় ফিরে আদেশ দিলো বনহুর—ওকে দরবারকক্ষে নিয়ে এসো।

বনহুর তার আসনে এসে বসলো।

কয়েকজন অনুচর সুতীক্ষ্ণধার বর্শা আর রাইফেল নিয়ে দন্ডায়মান বনহুরের সম্মুখে। রহমান আর কায়েসও দাঁড়ালো বনহুরের আসনের পাশে।

হাত পা শৃঙ্খল অবস্থায় মঙ্গল ডাকুর অনুচরটিকে নিয়ে আসা হলো দরবারকক্ষে।

বনহুর গর্জন করে উঠলো—তোদের দলপতির নাম কি বল্?

মঙ্গল ডাকু।

হাঁ, জীবন নিয়ে যদি ফিরে যেতে চাস তবে আমার প্রশ্নের জবাব দে।

লোকটা হাঁপাচ্ছে। সে তাকালো বনহুরের দিকে।

বনহুর বললো—আমাদের দলের দু'জন লোককে তোদের দলপতি ধরে নিয়ে গিয়েছিলো—তারা এখন কোথায়?

বনহুরের কঠিন কণ্ঠস্বরে লোকটার বিরাট দেহটা যেন কেঁপে উঠলো, গোলাকার অগ্নি চক্ষু দুটো কেমন যেন অসহায় মনে হলো, বললো সে—আমাকে যদি প্রাণে না মারেন তবে আমি সত্যি কথা বলবো।

হাঁ, তাই বলো! মনে রেখো, এক বিন্দু যদি মিথ্যা হয় তাহলে তোমার জিহ্বা লৌহ-সাঁড়াসী দিয়ে টেনে ছিঁড়ে ফেলবো।

লোকটা ডাকু হলেও নিজের প্রাণের মায়ায় সে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছে—কাঁপছে লোকটা।

বনহুর পুনরায় গর্জে উঠলো—বলো দস্যু বনহুরের অনুচর দুটিকে তোমরা কি করেছো?

বলছি বলছি আমি---একটু থেমে বললো লোকটা—হুজুর সত্যি কথা বললে আমাকে হত্যা করবে না তো?

না, তোমাকে মুক্তি দেবো।

হুজুর, আপনার অনুচর দু'জনকে আমরা হত্যা করেছি। কারণ তারা কিছুতেই আপনার নাম আর আস্তানার সন্ধান আমাদের বলেনি। একজনের চক্ষু দুটি উপড়ে ফেলা হয়েছিলো। কান কেটে দেওয়া হয়েছিলো। আমরা ভেবেছিলাম সঙ্গীর কঠিন মৃত্যু যন্ত্রণা দেখে ভয় পেয়ে সব বলবে কিন্তু তবু তারা নির্বাক ছিলো।

তারপর?

তারপর একজন মারা পড়লো, দ্বিতীয় জন তবু এতোটুকু বিচলিত হলো না। তাকেও আমরা মৃত্যুদন্ড দেবো স্থির হলো। ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুদন্ড দেওয়া হবে তাকে। সমস্ত দেহে আগুন ধরিয়ে জীবন্ত পুড়ে মারা হবে। সব প্রস্তুত অশ্বপিঠে তাকে আমারা গহন জঙ্গল মধ্যে নিয়ে চললাম কারণ গভীর রাতে গহন জঙ্গলে তাকে পুড়ে মারা হবে। আমরা বেশ কয়েকজন মিলে চললাম, আমাদের সর্দারও ছিলো। হুজুর, একটি মিথ্যাও বলবো না সব বলবো।

বল্ সব খুলে বল্? বললো বনহুর, তার চোখ দুটি দিয়ে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছে।

লোকটা জীবন রক্ষার জন্য অত্যন্ত আগ্রহশীল, সে বলে চললো সব কথা তবুও যদি জীবনটা ফিরে পায়—হঠাৎ সে আমাদের চোখে ধূলো দিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে ছুটে পালাতে গেলো, ঐমুহূর্তে সর্দার মঙ্গল ডাকু তার সুতীক্ষ্ণধার ছোরাখানা দ্রুত-হস্তে নিক্ষেপ করলো তাকে লক্ষ্য করে। কিন্তু তাকে আমরা রুখতে পারলাম না,ছোরাবিদ্ধ অবস্থায় অশ্বপৃষ্ঠে গহন জঙ্গলে কোথায় যে চলে গেলো আর তাকে খুঁজে পেলাম না।

হুঁ সে ফিরে এসেছিলো আমার আস্তানায় এবং তার মৃত্যু হয়েছে। এবার বল্ তোমাদের সর্দারের আস্তানার পথের সন্ধান।

আমাকে মুক্তি দেবেন তো?

দেবো তার সঙ্গে পুরস্কারও পাবি।

সত্যি?

হাঁ, জীবনে আর তোকে কোনো চিন্তা করতে হবে না।

লোকটার চোখমুখ খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠলো সে বলতে শুরু করলো—সারথী বনের দক্ষিণে ঝাঁম জঙ্গল। এই জঙ্গলে একটা শিব মন্দির আছে, ঐ মন্দিরের মধ্যে আছে একটি সুড়ঙ্গপথ। সেই সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ করলে আমাদের মঙ্গল ডাকুর আড্ডা। জঙ্গলেই পাবেন---

থাক, আর বলতে হবে না। বনহুর এবার এমনভাবে কথাটা উচ্চারণ করলো চমকে উঠলো লোকটা ভীত নজরে তাকালো সে বনহুরের জমকালো পোশাক পরা দেহটার দিকে। একি বনহুরের হস্তে ছোরা কেন শিউরে উঠলো লোকটা।

রহমান, কায়েস এরা জানে, তাদের সর্দার কোনোদিন বিশ্বাসঘাতককে প্রশ্রয় দেয় না। লোকটার পরিণতি সম্বন্ধে পূর্বেই তারা বুঝতে পেরেছিলো, স্তব্ধ নিশ্বাসে দরবারকক্ষস্থ বনহুরের অনুচরগণ কোনো একটা ভয়ঙ্কর কিছুর জন্য প্রতীক্ষা করছিলো।

যদিও লোকটা তার দলের কেউ নয় বা তার এতে কিছু যায় আসে না তবু সে বিশ্বাসঘাতক—বনহুর বিশ্বাসঘাতককে ক্ষমা করে না। সে নিজের দলেরই হোক কিংবা অপর কোনো দলের লোক হোক। মৃত্যুভয়ে লোকটা ভীত না হয়ে মৃত্যুকে যদি বরণ করে নিতো তবুও যদি সে নিজ সর্দার বা

তাদের আস্তানার সন্ধান না জানাতো তাতে হয়তো লোকটাকে বন্দী করে রাখতো বনহুর কিন্তু নির্মমভাবে হত্যা করতো না বরং মনে মনে সে তার বিশ্বাসের তারিফ করতো।

বনহুর সুতীক্ষ্ণধার ছোরা হস্তে মঙ্গল ডাকুর অনুচরটির দিকে এগিয়ে আসে, তারপর বিনাদ্বিধায় ছোরাখানা সমূলে প্রবেশ করিয়ে দেয় লোকটার তলপেটে।

মুহূর্ত মধ্যে একটা করুণ আর্তচীৎকার ভেসে উঠে দরবার কক্ষে, পরক্ষণেই লোকটা মুখ থুবড়ে পড়ে যায় ভূতলে, রক্তে রাঙা হয়ে উঠে দরবারকক্ষের মেঝে।

বনহুর দাঁতে দাঁত পিষে বলে—বিশ্বাসঘাতক, মৃত্যু ভয়ে নিজের সর্দারকে যমের কবলে তুলে দিতে কসুর করলো না। তারপর হেসে উঠলো অদ্ভুতভাবে—হাঃহাঃ হাঃ মঙ্গল ডাকু। মঙ্গল ডাকুকে আমি দেখে নেবো এবার।

❑

ফুলের ব্যবহারে মনিরা খুব খুশি। শুধু মনিরাই নয় চৌধুরী বাড়ির সবাই মুগ্ধ হয়ে গেছে। মরিয়ম বেগম, এমন কি বাড়ির চাকর-বাকর সবাই এই চঞ্চলা মেয়েটিকে ভালবেসে ফেললো। নূর প্রথম প্রথম ওকে এড়িয়ে চলতো। হঠাৎ ফুল যদি ওকে ধরে ফেলতো তখন কেঁদে কেটে আকুল হতো। কিছুতেই ফুলকে সে দেখতে পারতো না।

একদিন বাগানে খেলা করছিলো নূর, ফুল চট্ করে ধরে কোলে তুলে নেয়, আদর করে চুমু দেয় নূরের ছোট্ট গালে।

আচমকা ফুলের এ আচরণে নূর হকচকিয়ে যায়, চিৎকার করে কেঁদে উঠে আম্মি আম্মি ---

মনিরা পুত্রের চিৎকার শুনে বেরিয়ে আসে—কি হলো, কি হলো নূর, নূর---

মাকে দেখতে পেয়ে ছুটে পালিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে নূর মায়ের কোলে।

মনিরা নূরকে বুকে তুলে নিয়ে বলে উঠে—কি হয়েছে বাপ? অদূরে ফুলের দিকে তাকায় মনিরা।

ফুল হেসে বলে— আপামনি আমি বাবুকে একটু কোলে করেছিলাম তাই-------

হাসে মনিরা—দুষ্ট ছেলে ও একটু কোলে করেছে তাই অমন করে চিৎকার করতে হয় বুঝি?

নূর কোনো কথা বলে না, তাকায় ফুলের দিকে।

ফুল হাসে।

এমনি করে বেশ কয়েকটা দিন কেটে যায়, ফুলের সঙ্গে নূরের ভাব সম্পূর্ণ জমে না উঠলেও অনেকটা ঘনিষ্ঠ হয়ে এসেছে। ফুল যতদূর সম্ভব নূরকে নিজের কাছে পাওয়ার জন্য সদা ব্যাকুল।

আজকাল ফুলমিয়াও এ বাড়িরই একজন হয়ে গেছে। সব সময় সে সরকার সাহেবের সঙ্গে নানা কাজে ব্যস্ত থাকে। মরিয়ম বেগম অনেক সন্তুষ্ট ফুলমিয়ার উপর।

মনিরা কিন্তু স্বামীর জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। প্রত্যেকটা দিন যেন তার কাছে এক একটা যুগ বলে মনে হচ্ছে। রোজই সে ব্যাকুল হৃদয় নিয়ে প্রতীক্ষা করে চলেছে, কিন্তু আজও তার সাক্ষাৎ নেই।

এ বাড়ির আর একজনও ঠিক মনিরার মতই বনহুরের জন্য উন্মুখ, সে হলো ফুল। সেদিনের পর থেকে রোজই সে রাতের অন্ধকারে মুক্ত জানালায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকে। কান পেতে শুনতে চেষ্টা করে নিশীথের অন্ধকারে কোন অশ্ব-পদশব্দের। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধরে আসে, অবশ হয় সমস্ত দেহটা। চোখ দু'টি বুজে আসে আপনা আপনি। ক্লান্ত দেহখানা নিয়ে এক সময় ঢলে পড়ে ফুল বিছানায়, একগুচ্ছ হাস্নাহেনার মত নেতিয়ে পড়ে সে।

চৌধুরী বাড়ির নীচের এক কামরায় থাকে ফুল। পাশের কামরায় থাকে অন্যান্য মহিলা ঝি এবং দাসীগণ। সমস্ত দিন পরিশ্রম করে রাতে নিজ কামরায় এসে বসতো। নির্জন কক্ষে বসে ভাবতো তার হুরের কথা।

নূরী যখন ভাবছে তার হুরকে নিয়ে, উপরের একটি কক্ষে তখন মনিরাও ভাবছে তার স্বামীর কথা। কতদিন চলে গেলো তবু আসছে না কেন সে। উভয়ের চিন্তার কারণ একই জন।

অন্যান্য দিনের মত আজও বনহুরের কথা ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে নূরী। হঠাৎ একটা চাপা কণ্ঠস্বর—নূরী---নূরী---

আচমকা ঘুম ভেঙে যায় নূরীর, স্পষ্ট শুনতে পায় তার প্রতীক্ষিত জনের কণ্ঠস্বর দড়বড় শয্যা ত্যাগ করে ছুটে যায় মুক্ত জানালার পাশে।

জানালা দিয়ে সন্তর্পণে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে বনহুর, ডাকে সে—নূরী!

নূরী আনন্দে আত্মহারা হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বনহুরের বুকে —হুর, তুমি এসেছো?

বনহুর গভীর আবেগে নূরীকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে বলে—কেমন আছো নূরী?

ভাল আছি কিন্তু তোমাকে না পেয়ে আমি জীবমৃত হয়ে আছি হুর। কেন তুমি এতোদিন এলে না?

অনেক কাজ ছিলো নূরী।

নূরী বনহুরের বুকে মুখ গুঁজে বলে—হুর!

বনহুর নূরীর চিবুকটা তুলে ধরে মুখের কাছে, তারপর আরও ঝুঁকে পড়ে বনহুরের মুখখানা নূরীর ওষ্ঠদ্বয়ের উপরে।

চোখ দুটো মুদে আসে নূরীর গভীর আবেশে।

বনহুর নূরীর ললাট থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে ডাকে—নূরী!

বলো?

কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো তোমার এখানে?

না, বেশ আছি। মনিরা আপা, আম্মা আর নূরকে নিয়ে বেশ আছি। যাও হুর, মনিরা আপা তোমার জন্য ব্যাকুল হৃদয় নিয়ে প্রতীক্ষা করছে। যাও, যাও তুমি---

যাবো, কিন্তু---

না না, কোনো কিন্তু নয়, তুমি যাও। আমার চেয়ে সে তোমার জন্য বেশি উদগ্রীব রয়েছে।

নূরী!

হাঁ, যাও হুর।

নূরী অদ্ভুত মেয়ে তুমি।

নিজকে বনহুরের বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করে নেয় নূরী। বনহুরের জামার বোতামগুলো ঠিকভাবে লাগিয়ে দিয়ে আঙ্গুল দিয়ে চুলগুলো গুছিয়ে দেয়—যাও এবার।

বনহুর যে পথে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করেছিলো ঐ পথে বেরিয়ে যায়। সমস্ত চৌধুরী বাড়িটা যেন নিঝুম পুরীর মত ঝিমিয়ে পড়েছে। মনিরার কক্ষের পিছনে এসে দাঁড়ায় বনহুর, তারপর পাইপ বেয়ে উঠে যায় উপরে।

মনিরা এখনও ঘুমাতে পারেনি—সে ভাবছিলো কত কথা। জীবনের কত স্মৃতি ভেসে উঠছিলো তার মনে। পাশেই ঘুমিয়ে রয়েছে নূর।

বনহুর দরজায় মৃদু টোকা দেয় পর পর তিনবার।

মনিরা জানে এ সংকেত তার স্বামীর। মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠে তার চোখ দুটো।

দরজা খুলে দিয়েই অস্ফুটধ্বনি করে উঠে মনিরা—উঃ কি মানুষ তুমি।

কেন? ভিতরে প্রবেশ করে বলে বনহুর।

সেই যে চলে গেলে তারপর আর সাক্ষাৎ নেই। নূর তোমার জন্য পাগল।

আর তুমি? বনহুর মনিরাকে টেনে নেয় কাছে।

স্বামীর বুকে মাথা রেখে বলে—না কেঁদে তোমাকে কোনো দিন পেয়েছি বলো? চোখের পানিতেই যে তুমি খুশি।

মনিরা!

জানো নূর সব সময় তোমার কথা বলে।

মাফ করো মনিরা, আমি নূরের কাছ থেকে সরে থাকতে চাই। আর সেই কারণেই সেইদিন আমি আসতে চাইনি তোমার সঙ্গে।

কি নিষ্ঠুর পিতা তুমি! নিজ সন্তানের কাছে আত্মগোপন করে থাকতে চাও।

মনিরা লক্ষ্মীটি জানোনা কেন আমি আত্মগোপন করে নিজ সন্তানের কাছে লুকিয়ে থাকতে চাই? কেন আমি নূরের কাছে পরিচয় দিতে চাই না?

জানি, তাই বলে তুমি----

আমি দস্যু, আমি ডাকু নরহন্তাকারী—আমার সন্তান যেন এ কথা কোনোদিন জানতে না পারে। মনিরার হাত মুঠায় চেপে ধরে বনহুর—বলো মনিরা নূরের কাছে কোনোদিন তুমি আমার পরিচয় দেবে না, বলো? বলো মনিরা? যেদিন জানবো নূর জানতে পেরেছে তার পিতা দস্যু নর হন্তাকারী সেইদিন চিরকালের জন্য তুমিও আমাকে হারাবে----

স্বামীর মুখে হাতচাপা দেয় মনিরা, ব্যাকুল কণ্ঠে বলে—না না, শপথ করে বলছি, কোনোদিন আমি তোমার পরিচয় তাকে জানাবো না। তবু আমি হারাতে পারবো না তোমাকে।

মনিরা! বনহুর আবেগ-ভরা চাপা কণ্ঠে ডাকে, তারপর ঘনিষ্ঠভাবে টেনে নেয় বলিষ্ঠ বাহু দু'টির মধ্যে।

মনিরা বলে—ছিঃ নূর হঠাৎ যদি জেগে উঠে?

বনহুর সুইচটা টিপে ঘর অন্ধকার করে ফেলে, শোনা যায় তার চাপা শান্ত কণ্ঠস্বর—জেগে উঠার পূর্বেই আমি পালিয়ে যাবো মনিরা!

মনিরার কণ্ঠস্বর—এখনও তুমি ঠিক আগের মতই দুষ্ট রয়েছো।

ঘুমন্ত নূরের শিয়রে এসে দাঁড়ায় বনহুর, অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ সে সন্তানের মুখের দিকে, তারপর ছোট্ট একটা চুম্বনরেখা এঁকে দেয় ওর লালটে।

মনিরার কক্ষ থেকে বনহুর যখন বেরিয়ে আসে তখন সমস্ত চৌধুরী বাড়ি সুপ্তির কোলে ঢলে পড়েছে।

অল্পক্ষণ পর শোনা যায় অশ্বপদ শব্দ।

তাজের পদশব্দ বুঝতে পায় নূরী, মনিরাও বুঝতে পারে এ তার স্বামীর অশ্বের খুঁরের আওয়াজ। মনিরা পুত্রকে বুকে আঁকড়ে ধরে—বাপ নূর, আমার নূর---

হঠাৎ মায়ের ডাকে ঘুম ভেঙ্গে যায় নূরের, চোখ রগড়ে তাকায়।

মনিরার, গন্ড বেয়ে তখন গড়িয়ে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু! কতদিন পর পুত্রের পাশে এসেছিলো পিতা, কিন্তু কি নির্মম অভিশাপ। চিরদিনের জন্য তার কণ্ঠ রোধ হয়ে গেছে, আর কোনোদিন সে তাকে বলতে পারবে না তার পিতা কে। নূর আজ পিতার সন্তান হয়েও পিতাহারা।

মা, তুমি কাঁদছো? কচি হাত দু'খানা দিয়ে মায়ের মুখখানা উঁচু করে ধরে বলে নূর।

মনিরা সন্তানকে আরও নিবিড়ভাবে বুকে টেনে নিয়ে চুলে হাত বুলিয়ে বলে—একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছিলাম বাপ, তাই---

আম্মি—কি দুঃস্বপ্ন দেখেছিলে? বাপির তো কোনো অমঙ্গল হয়নি?

না বাবা, তোমার বাপি ভালই আছে।

কবে আসবে আমার বাপি বলো না আম্মি?

মনিরা পুত্রের কথার কোনো জাবাব দিতে পারে না। তার অশ্রু কিছুতেই বাধা মানছিলো না, বিন্দু বিন্দু গড়িয়ে পড়ছিলো নূরের চোখে মুখে।

নূর তার ছোট্ট হাত দু'খানা দিয়ে মায়ের চোখের পানি মুছে দিয়ে বললো আবার—আম্মি, বাপির কথা বললেই তুমি কাঁদো! কেন কাঁদো আম্মি?

না না, কিছু না বাপ। তুমি ঘুমাও—মনিরা নূরকে শুইয়ে দিয়ে চুলে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকে।

এখানে মনিরা যখন সন্তানকে সান্ত্বনা দিতে ব্যস্ত তখন বনহুরের অশ্ব ছুটে চলেছে কান্দাই জঙ্গলের দিকে। নিস্তব্ধ প্রান্তরে তাজের খুঁরের প্রতিধ্বনি এক অদ্ভুত শব্দের সৃষ্টি করে চলেছে।

প্রশস্ত পথ।

দুই ধারে সারিবদ্ধ পাইন আর শালগাছ। আর ছড়িয়ে আছে তামাক ও চা বাগান। কোনো জনমানবের সাড়াশব্দ নেই, কাঁকড় বিছানো পথে অশ্বের খুঁরের আঘাতে রক্তাভ ধূলি কণাগুলো যেন মেঘে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

ভোর হবার পূর্বেই বনহুর আস্তানায় পৌঁছে গেলো।

রহমান, কায়েস ও বনহুরের অন্যান্য অনুচরগণ চঞ্চলভাবে তখন অপেক্ষা করছিলো তাদের সর্দারের জন্য। সকলের চোখেমুখেই উদ্বিগ্নতার ছাপ ফুটে উঠেছে।

বনহুর অশ্ব থেকে অবতরণ করতেই দু'জন বলিষ্ঠ অনুচর অশ্ব বগ্‌লা চেপে ধরলো, তারপর নিয়ে গেলো অশ্বশালার দিকে।

বনহুর অনুচরগণের মুখোভাব লক্ষ্য করে বুঝতে পারলো নিশ্চয়ই কোনো কিছু ঘটেছে। সকলের মুখেই কেমন যেন একটা উৎকণ্ঠার ছাপ স্পষ্ট পরিলক্ষিত হচ্ছে।

বনহুর এগুতেই রহমান ব্যাগ্রভাবে সরে এলো—সর্দার একটা সংবাদ আছে।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বললো—বুঝতে পেরেছি। তোমরা দরবারকক্ষে যাও আমি এক্ষুণি প্রস্তুত হয়ে আসছি।

রহমান অনুচরগণকে নিয়ে চলে গেলো দরবারকক্ষের দিকে।

বনহুর চললো তার বিশ্রামকক্ষে।

কক্ষে প্রবেশ করে মাথার পাগড়ীটা ছুঁড়ে দিলো শয্যার উপরে। রিভলভারসহ বেল্টটা খুলে রাখলো টেবিলে। তারপর প্রবেশ করলো স্নানকক্ষে।

পূর্ব আকাশে তখন ভোরের সূর্য উঁকি ঝুঁকি মারছে। কান্দাই জঙ্গলের শাখায় শাখায় জেগে উঠেছে পাখীর কলরব। মহুয়া ফুলের সুরভী নিয়ে মাতাল হাওয়া ছুটোছুটি করছে বনের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে।

বনহুরের স্নানাগার ছিলো অদ্ভুত ধরনের। চারিপাশে সুউচ্চ প্রাচীর -ঘেরা প্রশস্ত জায়গায়। উপরে কোন ছাদ বা চালা ছিলো না। ভিতরটা ছিলো উঁচুনীচু ঠিক পাহাড়ের চূড়ার মত অসমতল, মাঝখানে বয়ে চলেছে ঝরণাধারা ঠিক পাহাড়িয়া ঝরণার মত। কাক চক্ষুর ন্যায় সচ্ছ জল, বনহুর এই ঝরণায় ইচ্ছামত স্নান করতো। পাথর কেটে এই ঝরণা ধারা সৃষ্টি করা হয়েছে।

বনহুর স্নানাগার থেকে যখন বেরিয়ে এলো তখন তাকে ধীর-স্থির বলেই মনে হচ্ছিলো। তারপর যখন দরবারকক্ষে এসে আসনে বসলো তখন তার মুখমন্ডল কঠিন, চোখ দুটো যেন অগ্নিশিখার মত জ্বলছে।

বনহুর আসন গ্রহণ করতেই রহমান বললো—সর্দার, একটা সংবাদ আছে।

জানি তোমরা কি বলতে চাও? মঙ্গল ডাকু তার অনুচরদের হত্যার খবর জানতে পেরেছে।

হাঁ সর্দার----

এই সংবাদে সে ভীষণভাবে ক্ষেপে গেছে!

হাঁ, আমাদের আস্তানার সন্ধানে তার সমস্ত অনুচরকে উত্তেজিত করে তুলেছে---

বনহুর অট্টহাসিতে ভেঙ্গে পড়ে যেন—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ---- সে হাসির শব্দে দরবারকক্ষ যেন থর থর করে কেঁপে উঠে। অনুচরগণের হৃৎপিন্ড যেন শিউরে উঠে অজ্ঞাত এক আশঙ্কায়।

বনহুর হাসি থামিয়ে দাঁতে দাঁত পিষে বলে—আমার আস্তানার সন্ধান লাভের পূর্বেই মঙ্গল ডাকুর আস্তানা আমি নিশ্চিহ্ন করে ফেলবো! রহমান, অনুচরগণকে অস্ত্রশস্ত্রে প্রস্তুত হয়ে নিতে আদেশ দাও। আজ রাতেই আমি ঝাঁম জঙ্গল আক্রমণ করবো।

পরবর্তী বই

ঝাঁম জঙ্গলে দস্যু বনহুর

ঐই সিরিজের পরবর্তী বই